জাগরী

সতীনাথ ভাদুড়ী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

তৃতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪
চতুর্থ „ — জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫
পঞ্চম „ —বৈশাখ, ১৩৫৭
ষষ্ঠ „ —বৈশাখ, ১৩৫৮
সপ্তম „ —পৌষ, ১৩৫৯
অষ্টম „ —বৈশাখ, ১৩৬২
নবম „ —শ্রাবণ, ১৩৬৪
দশম „ —আশ্বিন, ১৩৬৮
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.

উৎসর্গ

যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর
কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ,
জাতীয় ইতিহাসে কোনোদিনই লিখিত
হইবে না, তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে—

সূচী

ফাঁসি সেল—বিলু	—	—	১
আপার ডিভিসন ওয়ার্ড—বাবা	—	—	৭৫
আওরৎ কিতা—মা	—	—	১৩৩
জেল গেট—নীলু	—	—	১৮৭

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

ঢোঁড়াই চরিত মানস

১ম চরণ ; ২য় চরণ

চিত্রগুপ্তের ফাইল

গণনায়ক

জাগরী (কিশোর সং)

সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী

অপরিচিতা

অচিন রাগিণী

চকাচকী

সংকট

পত্রলেখার বাবা

ফাঁসি সেল

দুই নম্বর ওয়ার্ডের অশথ গাছটির উপরের শাখাটিতে গোধূলির ম্লান আলো চিকচিক করিতেছে। অনেকগুলি পাখি একবার এ ডালে একবার ও ডালে যাইতেছে। এক দণ্ডও বিশ্রাম নাই! কিছুক্ষণের মধ্যেই তো চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে। তাহার পর সারা রাত নিঝ্‌ঝুমের পালা ;—তাই বোধ হয় শেষ মুহূর্তের এই চঞ্চলতা, এত ডানা ঝটপটানি, এত আনন্দ উৎসব—যতটুকু আনন্দ সময়ের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া যায়। সত্যই কি পাখিগুলি এই জন্য সন্ধ্যার সময় এত চঞ্চল হয়? এই সেলে আসিবার আগে, দু নম্বর ওয়ার্ডে যখন ছিলাম, প্রত্যহ সন্ধ্যায় লক-আপের পূর্বে আমরাও সকলে বাহিরের খোলা হাওয়া খানিকটা খাইয়া লইতাম। সত্যই কি দরকারের জন্য ? না। হয়তো ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি। কোন দরকার নাই বাহিরে আসিবার। তথাপি বাহিরে একবার আসা চাই-ই। বেশীর ভাগ রাজবন্দীরই তো এই মনোবৃত্তি দেখিতাম। ওয়ার্ডাররা বিরক্ত হইত, নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করিত—ভাবটা এই যে স্বরাজীরা তাহাদের ইচ্ছা করিয়া জ্বালাতন করে। কিন্তু কেহই ওয়ার্ডারদের বিরক্ত করার জন্য এ-কাজ করিত না। যতটুকু উপভোগ করিয়া লওয়া যায় তাহা কেহ ছাড়িবে কেন?

ওগুলি বোধ হয় কাক—এতদূর হইতে ঠিক চেনা যায় না...পাখিরা কিন্তু রাত্রেও ডানা ঝট্‌পট্ করে—

সেই একবার বকড়ীকোলে মিটিং করিয়া ফিরিবার সময় কামাখ্যাথানের

বিরাট বটগাছটির নীচে আমাদের সারারাত থাকিতে হইয়াছিল। এখানকার মাটিতে শুইয়া থাকিলে নাকি কুষ্ঠ রোগ সারিয়া যায়। দূর দূরান্তর হইতে কতলোক এই উদ্দেশ্যে এখানে আসে। অনেকগুলি কুষ্ঠরোগী আশপাশের গাছগুলির নীচে শুইয়া রহিয়াছে। ছিলাম আমি আর নীলু; আর সঙ্গে ছিল বোধহয় সহদেও। সারারাত পাখির ডানা নাড়ার সে কী শব্দ! গাছতলায় তিনজন পাশাপাশি শুইয়া আছি। এই গাছতলায় আস্তানা লওয়ার জন্য নীলুকে যেন একটু বিরক্ত মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এগুলো ডানা ঝট্‌পট্‌ করছে কেন বলতে পারিস?" নীলু বলিল, "পিঁপড়ে টিপড়ে কামড়ায় বোধহয়!" উহার ভাবিতে সময়ও লাগে না। সব বিষয়েই উহার স্থির মত আছে। সে মতের সহজে নড়চড়ও হয় না। চিরকাল নীলুটা ঐ রকম।...

সন্ধ্যার লালিমা ধূসর হইয়া আসিতেছে। অশথ গাছের ডগাটিতে সিঁদুরে আকাশের আভা লাগিয়াছে। গাছের পাতাগুলি আর ঠিক সবুজ বলিয়া ধরা যাইতেছে না। যাক, গাছের পাতার সবুজটা গেল—ঐ একটু সবুজই তো এখান হইতে দেখা যাইত। এ ছাড়া দেখা যায় এক ফালি নীল আকাশ—লোহার গরাদের মধ্য দিয়া—লোহার তারের টোস্টারের মধ্যে এক স্লাইস পাউরুটির মতো, সেলের বাসিন্দার কাছে সেই রকমই বাস্তব,—সি ক্লাস বন্দীর ডায়েটের চাইতে তৃপ্তিকর। আর দেখা যায় জেল 'গুমটি'র[১] উপরতলা—তাহার দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা—'পূর্ণিয়া সেণ্টাল জেল, বিহার।' আকাশের ঐ ফালিটুকু আমার একান্ত আপন—ও যে আমার নিজস্ব জিনিস। যতক্ষণ দেখা যায় ঐ স্বচ্ছ নীল রঙ দেখিয়া লইয়াছি। এমন করিয়া, আমার মতো করিয়া, আকাশের ঠিক ঐ অংশটুকুকে কি আর কেহ পাইয়াছে? আমার নীল আকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলাইতেছে। সিঁদুরে রঙ বেগুনী হইয়া উঠিল,—দেখিতে দেখিতে ধূসর হইয়া উঠিতেছে—আবার এখনই জমাট অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। এমন বৈচিত্র্যময় রসের উৎসকে জেলর সাহেব একজন সর্বহারা বন্দীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিতে কেন যে দিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।

১। Central Tower, জেলের ভিতরের কর্মকেন্দ্র।

বোধ হয় তাঁহারা জানেন না—জানিতে পারিলে হয়তো কাল হইতেই রাজমিস্ত্রী 'কম্যাণ্ডের'[১] কয়েদীদিগকে, আমার সম্মুখের প্রাচীর আরও উঁচু করিবার কাজ দেওয়া হইবে—হুকুম হইবে "ঔর উচা, ঔর ভী উচা, জরুরৎ পড়ে তো, আসমান্ তক্ ভিড়া দো"[২]। ঐ গাছের সবুজটুকু, ও আকাশের টুকরোটি ছাড়া, এখান হইতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা কেবল লোহা, ইট আর সিমেণ্ট—সিমেণ্ট, ইট আর লোহা। উহা চক্ষুকে প্রলুব্ধ করে না—দৃষ্টিকে প্রতিহত করে মাত্র, তাহাকে ঠিকরাইয়া ফিরাইয়া দেয়। ঐ সবুজ আর নীল ছাড়া, আর যে কোন রঙই দেখি, সবই রুক্ষ ও কঠোর মনে হয়—চক্ষুকে পীড়া দেয়। সেলের চুনকাম করা সাদা দেওয়াল তাহাও বড় প্রাণহীন, বড়ই পাণ্ডুর। তাহার উপর কতদিন চুনকাম করা হয় নাই কে জানে! দেওয়াল ভরিয়া নানারকম দাগ—থুতুর দাগই বেশী—কেমন যেন পাঁশুটে রঙ—বোধহয় আমার পূর্বের কোন বাসিন্দাকে সিপাহীজীরা 'খয়নি' খাওয়াইয়াছিল। সে কবে সব ছাড়িয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে,—কেবল রাখিয়া গিয়াছে দেওয়ালে সিপাহীজীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ছাপ।......

কথা বলিবার লোক নাই। সেইজন্য সেলের বাহিরের জেল-জগতের সহিত সম্বন্ধ কান দিয়া। কথা বলিতে পারি একমাত্র ওয়ার্ডারের সঙ্গে—তাহাও ভাল লাগে না। চারিদিকে দেওয়াল। যে দিকে তাকাও দৃষ্টি দেওয়ালে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু সর্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকি, যদি বাহির হইতে কিছু শোনা যায়। ষোল পা লম্বা, দশ পা চওড়া ঘর। সম্মুখের দিকে মোটা লোহার গরাদের দরজা। দক্ষিণ দেওয়ালে ছাতের কাছাকাছি একটি ছোট গবাক্ষ। তাহারই নীচে, মেঝের সঙ্গে, একহাত চওড়া ও দেড় হাত লম্বা দুইখানি মোটা লোহার পাত দেওয়ালে বসানো। ইহাতে কতকগুলি ছিদ্র আছে। ইহার প্রয়োজন কী তাহা জানি না—বোধহয় বাতাস আসিবার জন্য! কিংবা বোধহয় এই ছিদ্রপথে বাহিরের ওয়ার্ডার শুনিতে পায় কয়েদী কী বলিতেছে। সম্মুখের গরাদের দরজার নিকট তো একজন ওয়ার্ডার

১। জেলের কয়েদীদের কাজের বিভাগ।

২। "আরও উঁচু, আরও একটু উঁচু; দরকার পড়িলে আকাশ পর্যন্ত ঠেকাইয়া দাও"

থাকেই—সে তো কয়েদী কী করিতেছে না করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাবেই দেখিতে পায়। তবুও কেন এই ব্যবস্থা বলিতে পারি না। ঘরের আসবাবের মধ্যে দুইটি আলকাতরা মাখানো মাটির মালসা (স্থানীয় জেলের ভাষায় 'টোকরী') এককোণে রাখা রহিয়াছে। ঐ কোণটিতে মেঝে চুনকাম করা—বৃত্তের চতুর্থাংশের আকারে। সেলের বাহিরে গবাক্ষের দিকের দেওয়ালের পাশ দিয়া গিয়াছে একটি চওড়া পাকা রাস্তা। রাস্তাটি বৃত্তাকারে জেলের সব ওয়ার্ডগুলিকে ঘিরিয়া আছে। এই রাস্তার অপর পারে জেল হাসপাতালের প্রাচীর। এই রাস্তাটি দিয়া কত লোক যাতায়াত করে—কত কয়েদী, ওয়ার্ডার, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, ঠিকাদার, অফিসার, মিস্ত্রী—আরও কত লোক। দিনের বেলা বেশ জনবহুল মফস্বল শহরের রাস্তার মতো মনে হয়। আর এই বিরাট পূর্ণিয়া সেণ্ট্রাল জেল শহর হইতে কম কিসে? সাধারণ সময় থাকে প্রায় পঁচিশ শত কয়েদী। আর এখন ১৯৪৩ সালের মে মাসে আছে সাড়ে চার হাজার। আরও বাড়ে না কেন তাহাই আশ্চর্য। বাহিরে না খাইতে পাইয়া পথে ঘাটে মরিয়া পড়িয়া থাকিবে—তথাপি আমাদের দেশের লোক এমন কিছু করিবে না, যাহাতে তাহাদের জেলে আসিতে হয়। একবার 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলিলে, বা ময়রার দোকান হইতে একমুঠো খাবার তুলিয়া লইলে যদি ছয় মাসের মতো অন্নজল ও মাথা গুঁজিবার স্থানের বন্দোবস্ত হইয়া যায়—তবে না খাইয়া মরিবার প্রয়োজন কী······সাড়ে চার হাজার······কোন শহরে পাঁচ হাজার লোকের বসতি হইলেই, তাহা মিউনিসিপ্যালিটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। জেলও যেন একটি ছোটখাট শহর। এই শহরের নাম 'লৌহগারদ' হইলে বেশ হয়, ধ্বনির ঝঙ্কারে ঠিক লেনিনগ্রাদের মতো শুনিতে লাগে।··· লোহার পাতের ছিদ্রপথে কান দিয়া বসিয়া থাকি। মানুষের গলার স্বর, এত মিষ্ট লাগে! জেলের পলিটিক্স, জেলের বাহিরের পলিটিক্স, সব এখানে বসিয়া থাকিলে জানিতে পারা যায়,—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত জেলার বাবুর বনিবনা হইতেছে না, হেড জমাদারকে জেলার বাবু 'আপ' বলেন, না 'তুম' বলেন, জাপানীদের রণকৌশলের কথা, জেলে কয়েদীর সংখ্যাধিক্যের জন্য কত কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (জেলের ভাষায় 'ছাটাইয়া'), বর্মার

জেলস্টাফ দল পাকাইয়া বিহারী জেল-কর্মচারীদিগকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিতেছে—এই সব কথা—আরও কত কথা কানে ভাসিয়া আসে। রাজবন্দীদের উপর সেদিনকার লাঠি চার্জ হওয়ার পর, কয়বার হাসপাতালে স্ট্রেচার আসিল গেল, তাহার হিসাব করা গিয়াছিল এইখানে বসিয়াই। ঝন-ঝন লোহার শব্দ শুনিলেই বুঝিতে পারি যে, যে কয়েদীটি যাইতেছে তাহার 'বার ফেটার্সে'র (স্থানীয় ভাষায় 'ডাণ্ডাবেড়ী') সাজা হইয়াছে, বোধহয় সে কোন জেল-কর্মচারীর হুকুম অমান্য করিয়াছিল। ...

কী মশা! সন্ধ্যা হইলে আর কি রক্ষা আছে? সেদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কোন জিনিসপত্রের দরকার আছে কি না অর্থাৎ যাহা চাও সম্ভব হইলে দিব। ছোট বেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে ফাঁসির আসামীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে; আর অধিকাংশ লোকই ভাল খাবার-টাবার খাইতে চায়। নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও কি আমার নিকট হইতে এরূপ প্রার্থনা আশা করিয়াছিলেন নাকি? আমার খুব লোভ হইয়াছিল একটি মশারির কথা বলিতে—যে কয়দিন আরামে ঘুমাইয়া লওয়া যায়; কিন্তু বলিবার সময় বলিতে পারিলাম না। কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল! বলিলাম, "ধন্যবাদ, আমি বেশ আরামেই আছি। কোন জিনিসে দরকার নাই—"। ওয়ার্ডারটা পরে আমাকে বলিয়াছিল—উড়িষ্যার কোন্ করদরাজ্যের দুজন 'স্বরাজী' বাবুর এই জেলে ফাঁসি হইয়াছিল—একজন ছিল আপনার এই এক নম্বর সেলে, আর একজন দুই নম্বরে—তাহারা সাহেব মারিয়াছিল—'একদম জান্‌সে—পাঁচ সালকি বাৎ'[১]—তাহারা নাকি ফাঁসির আগের দিন অনেকগুলি করিয়া মুর্গীর আণ্ডা ভাজিয়া খাইয়াছিল। তাহার পর রাত্রে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' আরও কী কী 'নারা'[২] লাগাইতে থাকে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা 'নারা' লাগায়। সে রাত্রে কোন কয়েদী ঘুমাইতে পারে নাই। আপনিও যে জিনিস খাইতে ইচ্ছা করেন চাহিলেন না কেন?

ওয়ার্ডারের কথা অবিশ্বাস করি নাই। কিন্তু তাহার উপদেশ মনে ধরে নাই। এই ওয়ার্ডাররা অশিক্ষিত; সুবিধা পাইলেই চুরি করে;

১। একেবারে প্রাণে—পাঁচবছর আগের কথা। ২। জয়ধ্বনি।

কয়েদীদের উপর প্রভুত্ব ফলায়। দুর্বলচিত্ত কয়েদীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। কিন্তু রাশভারী কয়েদীদের সমীহ করিয়া চলে। ইহারা সরল প্রকৃতির লোক—কথার মারপ্যাঁচ বোঝে না—সৌজন্যের ধার ধারে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সকলেই শিষ্টাচারের খাতিরে আমার সম্মুখে ফাঁসি বা তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করেন না। কিন্তু ওয়ার্ডাররা প্রত্যেকেই দুই একটি কথা বলিবার পরই ফাঁসির কথার উল্লেখ করে। প্রথম কয়েক দিন কথাটি শুনিলেই কেমন বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত—একটু যেন নিজেকে দুর্বল দুর্বল মনে হইত—কেমন যেন আনমনা হইয়া যাইতাম—ফাঁসির সমস্ত দৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। হয়তো আমার ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া যাইবে —এই বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে হইত। দিন কয়েকের মধ্যে ঐ সকল কথা সহিয়া গেল। আর এখন ও কথায় কিছু মনে হয় না। সেলের ঠিক পশ্চিমেই ফাঁসির মঞ্চ। ওয়ার্ডাররাই আসিয়া খবর দেয়—আজ ফাঁসিকাষ্ঠে কালো রঙ দিয়াছে—আজ দড়ির সহিত আমার ওজনের একটি বালির বস্তা বাঁধিয়া দড়িটি ঠিক মজবুত কিনা তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে; —আরও কত এই রকম খবর।

আশ্চর্য আমার মনের গতি! কালো রঙ-এর কথা শুনিয়াই ভাবি ব্ল্যাক-জাপান না আলকাতরা? ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করি, আলকাতরা না কি? দড়িটা কিসের? শনের না কি? নিজের মনের উপর নিজেরই বিদ্রূপ করিতে ইচ্ছা হয়। এখনও কি দড়িটি কিসের তৈরী সেই কথাটি জানাই আমার বেশী দরকার! চিরকাল আমার মনের এই অদ্ভুত গতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রয়োজনীয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয়েই আমার আকর্ষণ বেশী। পরীক্ষার পূর্বে সকলেই প্রশ্নগুলি তৈয়ারী করিতেছে—আর আমার তাহা তৈয়ারী না থাকিলেও হয়তো তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন তুচ্ছ কথার উপর আমার মনোযোগ ন্যস্ত। জ্যামিতির প্রয়োজনীয় থিয়োরেম অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় এক্সট্রার উপর আমার অযথা মনোযোগ;—ফুটনোট ভূমিকা প্রভৃতি হয়তো পরীক্ষার আগের দিনও দেখিতেছি। বৎসরের প্রথম হইতেই মনে হইয়াছে—দরকারী জিনিসগুলি তো পরে পড়িতেই হইবে—এখন খুঁটিনাটিগুলি পড়া যাক। হয়তো শেষ পর্যন্ত আসলটিই পড়া হয় নাই।

মনে পড়িতেছে কাশী বিদ্যাপীঠে পড়িবার সময়ের একটী রাত্রের কথা। রাত জাগিয়া পড়িতেছি আমি আর শকলদেও। এক টিপ নস্য লইয়া রাত দুপুরে সে "আজ" -এর সম্পাদকীয় পড়িয়া আমাকে শুনাইতে লাগিল।...কাশী বিদ্যাপীঠে পড়িবার সময় সেবার যখন পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে— সন্দেহক্রমে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের চার্জে—তখন স্বতঃই ফাঁসির কথা মনে হইত। পরে পুলিশ প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেয়। সত্যই আমি উহাতে লিপ্ত ছিলাম না। কিন্তু ফাঁসি যাওয়ার ভয় আমার বিলক্ষণ ছিল। বোধহয় এখন সত্যসত্যই ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভয় কমিয়া গিয়াছে। দূর হইতেই ভয়টা বেশী থাকে। যাহারা জেলে আসে নাই তাহারা জেলে আসাটাকেই কী কঠিন ব্যাপার মনে করে, কিন্তু আসিয়া পড়িলে তখন ভয় ভাঙ্গিয়া যায়।

উঃ! মশার কামড়ে সত্যই বড় কষ্ট হয়। কেন জানি না আমাদের গান্ধী আশ্রমের মশাগুলি ইহাদের অপেক্ষা জোরে ডাকে, আকারেও বড়, কিন্তু মনে হয় কামড়াইলে জ্বালা কম করে। নীলু থাকিলে ঠিক আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, "এরা আশ্রমের মশা কিনা—অহিংস উপায়ে রক্ত খেতে শিখেছে।" মা হাসি চাপিয়া মুখে বিরক্তির ভাব আনিয়া বলিতেন, "আচ্ছা হয়েছে, আপনি এখন আসুন তো।" মায়ের এই সময়ের মুখখানি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। চোখের কোণে দুইটি করিয়া বলি রেখা পড়িয়াছে।...মা'র মনে সব সময় একটা ভয় ভয় ভাব দেখিতে পাই—এই বুঝি নীলু বাবাকে ঠেস দিয়া কিছু বলিল! অথচ কিছু বলিলে সে কথাটা যাহাতে বাবার কানে না ওঠে তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা দেখিয়াছি। নীলু চিরকাল স্পষ্টবক্তা। তাহার জন্য কতবার গোলমালে পড়িয়াছে। কিন্তু অপর লোকে তাহার কথায় কিছু মনে করিতে পারে বা তাহার কাজে ক্ষুব্ধ হইতে পারে এ জিনিসটাকে চিরকাল তাচ্ছিল্য করিয়া গিয়াছে। সূক্ষ্ম জিনিস তাহার মনে সাড়া দেয় না। নীলুর মন ও দৃষ্টিভঙ্গী স্থূল। কলম তুলিকা তাহার জন্য নয়—সে বোঝে কায়িক পরিশ্রমের কথা, হাতুড়ি কাস্তে সাবলের কথা, আর তার হাতে শোভা পায় ইস্পাতের ক্ষুরধার অসি—পরশুরামের কুঠারের মতো, নিষ্করুণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। একবার নীলু বলিয়াছিল যে তাহার কবিতা ভাল লাগে না। আমি বলিয়াছিলাম যে, এমন কবিতা লিখিয়া দিব যাহা তাহার নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।

লিখিয়া দিয়াছিলাম বনিক শ্রমিক প্রভৃতি দেওয়া একটি লাঠি মারা গোছের সনেট। নীলুর খুব ভাল লাগিয়াছিল। কবিতাটি মনে নাই—এক লাইনও না। নীলু সেটিকে বাঁধাইয়া আশ্রমের ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল—মা'র ঘরে।···

মনে হইতেছে মা দাওয়ায় বসিয়া আছেন। মাথা নাড়িতে নাড়িতে নীলুর দিকে তাকাইয়া, দন্তমূলে জিহ্বা ঠেকাইয়া একটি শব্দ করিলেন—'চিক্'। তারপর ছড়া কটিলেন "স্বভাব না যায় ম'লে"। নীলু আমার দিকে চোখ দিয়া ইসারা করিল—ভাবটা এই যে "দাদা, এইবার!" দুজনে যাহা ভাবিয়াছিলাম—ঠিক যাহা ভাবিয়াছিলাম—মা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন—"অঙ্গার শতধৌতেন মলিনশ্চ নঃ মুঞ্চতে"। আমরা দুইজনেই হাসিয়া উঠিয়াছি—মা ঠিক 'মলিনশ্চ' বলিয়াছেন। এইবার আমাদের হাসি শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ভুল হইয়াছে। বলিলেন, "ছাই কি মনে থাকে?" নীলু বলিল, "তবে বলার দরকার কী?"······মা'র কথার এই ভুলগুলি আমাদের মুখস্থ। অবশ্য নীলুই দেখাইয়া দিয়াছে।—তাহা না হইলে আমি হয়তো খেয়ালও করিতাম না। মা বলেন, "দয়া দাক্ষিণাত্য।" আমি একদিন মাকে বলিয়াও দিয়াছিলাম—'দয়াদাক্ষিণ্য' বলিতে। মা'র দেখিয়াছি কথা বলিবার সময় এটি মনেই থাকে না। বলিয়া দিতে গেলে অপ্রস্তুত হইয়া যান বলিয়া আমি আর ভুল দেখাইয়াও দিই না। নীলু কিন্তু এ দিকটা ঠিক বোঝে না। অপরের যে কোন দুর্বলতা, চালচলনে বিদ্রূপের খোরাক ওর সহজেই নজরে পড়ে; কিন্তু উহার কথার ফলে অপরের মনে কিরূপ আঘাত লাগিতে পারে, এ দিকটা সে ভাবিয়াও দেখে না।······বাবার নিকট হইতে আমরা একটু দূরে দূরেই চিরকাল থাকি। প্রয়োজনের কথা ছাড়া অন্য কোন কথাও বড় একটা হয় না। সেইজন্য বাবার এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলের খাইবার পর, আমি আর নীলু মা'র সঙ্গে খাইতে বসি। একটু দুধ না হইলে মা'র খাওয়া হয় না। এটিই বোধ হয় মা'র একমাত্র বিলাসিতা। আশ্রমে অনেক লোকজন তো থাকে। আর সময়ে অসময়ে নূতন অতিথি আসা, ইহাও প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই জন্য দুধ অনেক সময়েই কমিয়া যাইত। অল্প দুধ আছে, মা হয়তো আমাকে আর নীলুকে দিলেন। আমি আর একটা বাটিতে, আমাদের বাটি হইতে অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া মা'র জন্য রাখিলাম।

নীলু দেখিয়াছি, এইরূপ সময় নিশ্চয়ই বলিবে, "মা'র দুধ না হলে খাওয়াই হয় না।" কথাটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু মা'র মুখটি একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল,—যেন কোন গোপন দুর্বলতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নীলুর এত জিনিস চোখে পড়ে, কিন্তু এটি পড়ে না!…

মা'র অসুখ করিলে, অসুখ একটু বেশী হইয়াছে বলিলেই যেন একটু খুশী হন। সেইজন্য জানিয়া শুনিয়াও হয়তো মা'র কপালে হাত দিয়া বলিলাম —"গা'টা পুড়ে যাচ্ছে—বেশ জর হয়েছে"। নীলু সেখানে উপস্থিত থাকিলে —হাঃ হাঃ করিয়া ঘর কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিবে……

……সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আমার কোন জিনিসের দরকার নাই বলিবার পর সেদিন মনে বেশ তৃপ্তি হইয়াছিল—খালি তৃপ্তি না গর্বই। "সাহাব" তো একা আসেন না, সঙ্গে জেলর, ডাক্তার, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেলর, জমাদার, কয়েকজন দেহরক্ষী, ওয়ার্ডার ও মেট সকলেই ছিল। হ্যাঁ, আর যে শিখ কয়েদীটি সাহেবের খাঁকী রঙ-এর বিরাট রাজছত্রটি ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায় তাহার কথা তো উল্লেখ করিতে ভুলিয়াই গিয়াছি; সত্যই দোর্দণ্ড-প্রতাপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেল-সাম্রাজ্যের একছত্রাধিপতি……সেদিন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার পর কাহারও মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। কেমন যেন সব গুলাইয়া গেল—অথচ ইচ্ছা হইতেছিল আমার কথার ফল উহাদের উপর কেমন হয় তাহা জানার। নিজেকে বেশ নাটকের নায়কের মতো মনে হইতেছিল।……সেই সন্তোষদার মুখে ছোটবেলায় স্বদেশী যুগের গল্প শুনিয়া কতবার চোখে জল আসিয়া গিয়াছে—অমর মৃতের সেই স্মৃতি আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। "এখন আর বিরক্ত করিও না—শান্তিতে মরিতে দাও।" বন্দুকের গুলিতে আহত মরণাপন্ন শহীদদের সেই কথার সহিত আমার কথাটির তুলনা করিয়াছিলাম। ঐ গল্প শুনিয়া আমার চোখে জল আসিত—আর আমার কথাটি কি শ্রোতাদের মনে কোনই সাড়া দেয় নাই! হয়তো দেয় নাই। ইহারা নিত্যই এই জিনিস দেখিতেছে। ইহারা বয়স্থ, সংসারে অভিজ্ঞ—বালকের ন্যায় ভাবপ্রবণ নহে। লোকে প্রশংসা করুক, আমার গল্প করুক, তাহাই যেন আমি চাই—ইহা আমার মনের দুর্বলতা। এক এক সময় নিজের উপর সন্দেহ হয়, হয়তো বা দেশের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা

আমার নামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বেশী সজাগ। সত্যই কি তাই? একদিনের জন্যও জীবনের স্থূল উপভোগের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিই নাই। দেশের জন্য যাহা ভাল মনে করিয়াছি তাহা করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই। নিজের ব্যক্তিগত সুখ বা ভবিষ্যতের কথা ভাবি নাই। তাহার পরিবর্তে যদি চাই যে দেশের লোক আমার সম্বন্ধে দুই একটি প্রশংসাসূচক কথা বলুক, তাহা হইলে কি আমার আকাঙ্ক্ষা অন্যায্য? জেল-ডাক্তার নিশ্চয়ই নিজের বাড়িতে আমার কথা বলিয়াছেন। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেলর তখনই হয়তো আপার ডিভিসন রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে গিয়া এই কথা গল্প করিয়া আসিয়াছে। বাবাও তো সেই ওয়ার্ডে থাকেন। তাঁহার কানেও নিশ্চয়ই কথাটি উঠিবে। বাবা নির্বিকার লোক, বাহির হইতে দেখিয়া মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই। একান্তে বসিয়া চরকা কাটিতেছেন। চোখের কোণের দু-ফোঁটা জলে সূতা ঝাপসা হইয়া গেল। না, বাবার নিকট হইতে অতটা ব্যাকুলতা আশা করি না। হয়তো একটু উন্মনা হইবেন, চরকায় তন্ময়তা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য কমিতে পারে—সূতা দুই একবার বেশী ছিঁড়িতে পারে মাত্র।...নিজের মনে সন্দেহ হইতেছে, আশঙ্কা হইতেছে যে, যেরূপ আশা করিয়াছিলাম জেলস্টাফের মনে সেরূপ ভাবের উদ্রেক করিতে পারি নাই। জোর গলায় বলিতে পারি নাই—চোখ নামাইয়া লইয়াছি। হয়তো উহারা ভাবিল আমার মন সরল নয়। আমার হাবভাব যেন সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিমান দেখানোর মতো লাগিল। উহারা দিনরাত চোর, ডাকাত, খুনে লইয়া কাজ করে। ইহার ফলে উহাদের মনের ভাবপ্রবণতা ও অনেকগুলি কোমলবৃত্তি শুকাইয়া আসিতেছে। রাজবন্দীদিগকে ইহারা অন্যান্য চোর ডাকাত অপেক্ষা পৃথক বলিয়া ভাবে না। ব্যবহারে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা কেবল গোলমালের ভয়ে, না হয় স্বার্থের খাতিরে। যে ডাক্তার ডিভিশন থ্রির রাজবন্দীদিগকে রোগ হইলে গালাগালি করে, 'আমাশা হইয়াছে, ঔষধ দাও' বলিলেই বলে "But don't expect Dabi" অর্থাৎ দই খাইবার প্রত্যাশায় যদি চেষ্টা করিয়া অসুখটি করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিরাশ হইবেন, সেই ডাক্তারই উচ্চশ্রেণীর রাজবন্দীদিগের কাছে কী মাটির মানুষ। এই তো দুই বৎসর পূর্বে 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের' সময় এই জেলস্টাফকে কংগ্রেসের নেতাদের আশেপাশে ঘুরিতে

ও কাজে অকাজে খোসামোদ করিতে দেখিয়াছি। তখনও যে তাহারা ভাবিত যে কংগ্রেস আবার বিহারে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারে। আর আজ!···

এই জেল-কর্মচারীদিগকে কি সেদিন আমার কথা আর ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত করিতে পারিয়াছি? ইহা অপেক্ষা যদি নাটকীয় ভঙ্গীতে জোর গলায় বলিতে পারিতাম—"জুতো মেরে গরু দান। তোমাদের কাছ থেকে আমি করুণা চাই না" কিংবা ঐ ধরনের অন্য কিছু তাহা হইলে ইহারা বেশী প্রভাবিত হইত। একটু থিয়েটারী ভাব দেখাইত বটে কিন্তু যাহা চাই তাহা হইত। মনে পড়িতেছে—তুই নম্বর ওয়ার্ডে অক্টোবর মাসে লাঠি-চার্জের পর মাথাফাটা অবস্থায় শুকদেওএর বক্তৃতা—শুইয়া শুইয়া—একটানা স্বরে—থিয়েটারের মরার সিনের মতো—"তুম লোগোকে শরম নহী আতা"[১] বলিয়া আরম্ভ। এখনও স্পষ্ট কানে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি স্কুলে একবার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় মেঘনাদবধ আবৃত্তি করিয়াছিলাম। কালীবাবু অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার শিখাইতেছিলেন—"এই পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে বলবে—তারপর একেবারে শুয়ে পড়ে টেনে টেনে আস্তে আস্তে চোখ বুঁজে বলবে, "কেবা এ কলঙ্ক তোর ভুঞ্জিবে জগতে কলঙ্কি।"···শুকদেওএর বক্তৃতা পারিপার্শিক অবস্থার সহিত একেবারে খাপ খায় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, ইহার বিসদৃশতা অল্প লোকের চোখেই ধরা পড়িয়াছিল।···

"বাবু বিজে ভৈল বা?" (বাবু খাওয়া হইয়াছে?)

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিলাম ওয়ার্ডার সাহেব সম্মুখে। কথার স্বরে একটু যেন সহানুভূতির আমেজ। অনেকক্ষণ হইল বাহিরে আলো দিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। আলোটি সেলের ভিতর দিলে ইহাদের কি ক্ষতি হইত বুঝিতে পারি না। কেরোসিন তেল লাগাইয়া আত্মহত্যা করা খুব আরামের জিনিস নয়। তথাপি ইহারা সাহস পায় না। হবেও বা। উহাদের প্রত্যেক নিয়মই অনেক অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কেবল এইরূপ একটি আপাততুচ্ছ নিয়মের জন্যই গত বৎসরের জেল মিউটিনী সফল হইতে পারে নাই। গেটওয়ার্ডারকে মারিয়া কয়েদীর দল চাবির গোছা

১। 'তোমাদের লজ্জা হয় না'।

হাতে পাইয়াছিল। কিন্তু বিরাট রিংএ ছিল প্রায় দুই শতাধিক চাবি এবং তাহার ভিতর অধিকাংশই ছিল অপ্রয়োজনীয়। জেলের নিয়ম, এইরূপ বহুসংখ্যক বাজে চাবি রিংএ রাখিতে হইবে। জেলবিদ্রোহীগণ এই চাবির গোছা হাতে পাইয়াও কোন্ চাবি তালায় লাগিবে তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিতে করিতে পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে "পাগলী" (alarm) বাজিল—বন্দুক, সিপাহী, ফৌজ পৌছিয়া গেল।...... তাহার পর...

সিপাহীজীর প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কটা বেজেছে?"

সিপাহীজী বলিল, "দফা বদলীর টৈন হইয়াছে"—অর্থাৎ ইহাদের স্থানে রাত্রে ডিউটি দিবার ওয়ার্ডারের দল আসিয়া গিয়াছে। গুমটিতে (সেণ্ট্রাল টাওয়ার) এখন কোন ওয়ার্ডে কত কয়েদী বন্ধ হইল, আজ নূতন কয়েদীর "আমদানী" কত, কত "খরচা" অর্থাৎ ছাড়া পাইয়াছে, তাহার পর একুনে মিলিল কিনা তাহার হিসাব হইতেছে। সিপাহীজী তখনও দেখি তাহার প্রশ্নটি ভুলে নাই। আবার জিজ্ঞাসা করে, "ভোজন নহী কিয়েঁ?"

দেখিলাম সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, আমি ভাত খাই নাই। বলিলাম—"না, খিদে পায় নি।"

সে বলিল, "দহি হায়; থোড়া ভোজন কর লিয়া যায়"। সপ্তাহে একদিন করিয়া নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দীরা দই খাইতে পায়—পিতলের থালার উপর পাতলা মহুয়া দই—উহাতে আবার একটা পোড়াপোড়া গন্ধ;—কংগ্রেস মিনিস্ট্রীর প্রবর্তিত নিয়ম—তৃতীয় শ্রেণীর রাজবন্দীদের নিত্য উপহাসের জিনিস। লক্ষ্য কংগ্রেসের বড়কর্তাদের প্রতি—কেন তাঁহারা সকল রাজ-বন্দীদিগের একটি মাত্র শ্রেণী করেন নাই? উচ্চশ্রেণীর নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দী রাখিবার অর্থ কী? উচ্চ শ্রেণীর দশ আনা "খোরাকি" ও নিম্নশ্রেণীর সাড়ে তিন আনা—ইহার মাঝামাঝি একটি শ্রেণী কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য করিলে কী হইত? নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দীদিগকে নিজের পয়সা খরচ করিবার অধিকার দিলে কী হইত? বাহির হইতে তাহাদের জন্য খাবার বা অন্য কোন জিনিস আসিলে, তাহা লইতে দিলে, বড়কর্তাদিগের কোন্ পাকা

ধানে মই পড়িত? মাসে দুইখানি করিয়া চিঠি লিখিতে দিলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? নিজের পয়সায় বিড়ি সিগারেট খাইবার অধিকার দিলে তাঁহাদের কী ক্ষতি হইত? আরও কত কি অভিযোগ!

উঁচু গুমটির উপর হইতে সুর করিয়া জলদমন্দ্র স্বরে রাগিনী উঠিল—"বোলোরে এক নম্বার! বোলোরে দু নম্বার! বোলোরে তি-ই-ইন-নম্বার-বোলোরে—চা-আ-র-নম্বার! বোলোরে এ-এ-এ পাঁচ নম্বার! বোলোরে-এ ছে-এ নম্বা-আ-আ-র! বোলোরে-এ-এ নয়া গোল! বোলোরে আওরৎ কিতা-আ-আ!"

সব ওয়ার্ডের জবাব আসিল না—বোধ হয় আমার সেল পর্যন্ত সে শব্দ পৌঁছাইল না। গুমটির উপরের সিপাহীটিও যেন সব ওয়ার্ড হইতে উত্তরের প্রত্যাশা রাখে না। তাহার কাজ যন্ত্রের মতো, কলের গানের মতো একবার করিয়া চীৎকার করিয়া যাওয়া। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে উত্তর আসা উচিত কতগুলি করিয়া কয়েদী প্রতি ওয়ার্ডে বন্ধ হইয়াছে। ইহার 'টোটাল' আগেই গুমটির নীচের তলায় জেলকর্মচারীরা করিয়া রাখিয়াছে—চীৎকারটি কেবল একটি নিয়মরক্ষা মাত্র। সব ওয়ার্ডার 'মেট' বা 'পাহারা'ই[১] এ কথা জানে। সেই জন্য ইহার উত্তর দিয়া বৃথা পরিশ্রম করিতে রাজা নয়। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। 'গিনতি মিলান'[২] হইয়া গেল। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে! কালকের 'গিনতি মিলান্' আর শুনিতে হইবে না......গুমটির উপরে আলোটা নিশ্চয়ই পাঁচশ ক্যাণ্ডল পাওয়ারের। ব্ল্যাক আউটের জন্য উহার কালো ঢাকনা। কিন্তু ঠিক তাহার নিচেই বাঁশের চাটাই এর বোনা প্রকাণ্ড একটি ছাতা—ওয়ার্ডারকে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য। ব্ল্যাক আউটের জন্য গুমটিতে কালচে রঙ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ছাতাটির উপরে আলো পড়িয়া এত আলো চারিদিকে প্রতিফলিত হইতেছে যে, একটানা বেশীক্ষণ উহার দিকে তাকানো যায় না। ছাতাটি ব্ল্যাক আউটের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছে।...গুমটি ও তাহার উপরের ছাতাটি দেখিলেই কাশীর অহল্যাবাই ঘাটের কথা মনে পড়ে। ঘাটের সেই গম্বুজটির উপর আমাদের নিত্যকার

---

১ Convict Overseer-দের দুইটি শ্রেণী। ২ মোট (total) মিলিয়া যাওয়া।

সান্ধ্য আড্ডা ছিল।···সিন্‌হেশ্বর স্কুল একদিন উহার উপর হইতে পানের পিচ ফেলিয়াছিল—তাহা লইয়া কী হুলস্থূল কাণ্ড! অদ্ভুত সাহস সিন্‌হেশ্বরের! সে দেখিয়াছি মরিতে একটুও ভয় পায় না। সে এমন তাচ্ছিল্যের সহিত ফাঁসি যাওয়ার কথা বলিত যে, শুনিয়া আমার হিংসা হইত। বুঝিতে পারিয়াছিলাম সে আমাকে তাহাদের দলের সদস্য করিতে চায়; কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। অন্তরের ভিতর খোঁজ করিয়া যখন দেখি, তখন এক এক সময় মনে হয় যে, আমার সাহসের অভাবের জন্যই বোধ হয় তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই—তাহাদের কার্যক্রম পছন্দ হয় নাই বলিয়া নয়; কিন্তু আজ সে ভয় গেল কোথায়? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়াছি লোকের মৃত্যুভয় বাড়ে। আমার বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল নাকি? সিন্‌হেশ্বরের সহিত এখন দেখা হইলে কত কথা হইত! অনেকদিন পরে তাহার সহিত রামগড় কংগ্রেসের সময় হঠাৎ দেখা। সে কংগ্রেস মিনিস্ট্রীর সময় বেরিলি জেল হইতে ছাড়া পায়,—মেল ডাকাতিতে তাহার সাজা হইয়াছিল—লক্ষ্মৌর কাছের সে জায়গাটির নাম মনে পড়িতেছে না, পিপরাহা না কী যেন নাম······

নূতন সিপাহী কখন আসিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। চমক ভাঙ্গিল সে যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, একটা বিড়ি খাবেন?"

আজ ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত অন্তরঙ্গ হইতে চায়—যদি আমার কোন উপকার করিতে পারে—যদি আমাকে একটু খুশী করিতে পারে। এই সহানুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত—কিছুমাত্র কৃত্রিমতা ইহাতে নাই। তাহার সহানুভূতির দান প্রত্যাখ্যান করাতে বোধহয় সে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইল। একটু কিন্তু—কিন্তু করিয়া সে তাহার ডিউটি সারিয়া লইল। একবার তালাটা খটাং করিয়া নাড়িয়া শব্দ করিল। পরে হড়হড় করিয়া গরাদের দরজাটা নাড়াইয়া দিল। একাজ তাহার আগেই করা উচিত ছিল—আগের প্রহরী থাকিতেই। উদ্দেশ্য যে দরজা ঠিক বন্ধ কিনা আর হুড়কো ঠিক পড়িয়াছে কি না তাহা দেখা। আগের ওয়ার্ডারদের সঙ্গে কয়েদী বন্দোবস্ত করিয়া তালা ঝুলাইয়া রাখিতে পারে,—অথচ কয়েদী পলাইলে আগেকার ওয়ার্ডারের কোন দায়িত্ব নাই, কেননা, সে তাহার পরের ওয়ার্ডারকে চার্জ বুঝাইয়া দিয়াছে। এই জন্যই এত সতর্কতা, এই

ব্যবস্থা। কিন্তু আগের ওয়ার্ডার চলিয়া গিয়াছে। ঘরমুখো গরু—এ সময়টুকুর তর সয় না। এক নাগাড়ে দিনে আট ঘণ্টা ডিউটি দিয়াছে—দোষই বা কী ?···

সিপাহীজী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে করিয়া কথা বলিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ওদিককার 'ডিগরী'গুলোর (Cell) কাজ শেষ করিয়া আসিতেছে নাকি ?

বলিল, "হ্যাঁ। দশ নম্বর, নয় নম্বর, সাত নম্বর, তিন নম্বর আর এক নম্বর এই পাঁচটি ডিগরীতে 'আসামী' আছে। আজ দশ নম্বর থেকেই আরম্ভ করেছি। ওয়ার্ডের সিপাই তো কোথায় বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছে। আমার আর তিন নম্বর সেলের সিপাহীর উপরই 'গিন্তীর' ভার দিয়াছে।···"

'কনডেম্‌নড্‌ সেল্‌স' এর পাঁচজন কয়েদী। জেলের ভাষায় এই ওয়ার্ডটির নাম 'ফাঁসি সেল'। 'Condemned cell' শুনিলেই আমার মনে হয় যেন সেলগুলি এনজিনিয়ারিং বিভাগ কর্তৃক condemend, ইহা যে condemned Prisonerদের জন্য—তাহা হইতেই যে ওয়ার্ডের এই নাম, এই কথাটা প্রথমে মনে আসে না। নয় ও দশ নম্বর সেলে থাকে দুই জন বোমার কেসের আসামী—আণ্ডারট্রায়াল। উহাদের এ সেলে কেন রাখিয়াছে জানি না। 'ফাঁসি সেলের' কুড়িটি সেল ব্যতীত, এ জেলে আরও চল্লিশ পঞ্চাশটি সেল আছে। তথাপি ইহাদের কেন এখানে রাখিয়াছে বলা শক্ত। হয়তো পুলিশের আদেশ সেইরূপ। বোধহয় পুলিশ ইহাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি পাইবার আশা রাখে। সেই জন্য অপর রাজবন্দীদিগের সহিত মেলামেশা করিতে দিতে রাজী নয়। সাত নম্বরে থাকে একজন পাগল। সে আপন মনে বাজে বকে। ওয়ার্ডার দেখিলেই অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয়। নয় ও দশ নম্বর সেলের দরজা সারাদিন খোলা থাকে। দুপুরে কোন দিন তাহারা আমার সেলের স্পেশাল ওয়ার্ডারকে বিড়ি, চিনি প্রভৃতি দিয়া তাহার পরিবর্তে আমার সহিত দুই একটি কথা বলিয়া লয়। সন্ধ্যাবেলা তাহাদের দরজা বন্ধ হইবার পর, তাহারা নিজের নিজের সেল হইতে পাগলটিকে চটাইতে থাকে। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেই সে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে। ওয়ার্ডাররা বলে যে লোকটি মিথ্যা পাগলামির ভান করে। ঐরূপ তাহারা কত দেখিয়াছে।

"সরকার ওত্তা বুড়বক্ নহী হ্যায়,"[১] রেহাই পাওয়া অতটা সহজ নয়।... তিন নম্বরে থাকে একটা খুনী আসামী। ভাইকে খুন করিয়াছে। সে এক অতি কুৎসিত কাহিনী। তাহার পারিবারিক জীবনের কদর্য পঙ্কিলতার বিবরণ, তাহার স্ত্রী জজসাহেবের এজলাসে সর্বসমক্ষে বলিয়াছে। হাইকোর্টে আপীল হইয়াছিল, তাহাও খারিজ হইয়া গিয়াছে। লোকটি দিনরাত 'সীতারাম সীতারাম' বলে আর ভজন গায়।...

ওয়ার্ডার যে আমাকে 'আসামী' বলিল, কথাটি আমার পছন্দ হইল না। মনে হইতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা ভদ্র ভাষা তাহার ব্যবহার করা উচিত ছিল। ছোটবেলার শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার আমার মনে যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা একেবারে মুছিয়া ফেলা শক্ত। সত্যই তো, ওয়ার্ডার তো ঠিকই বলিয়াছে। আমাকে আসামী বলিবে না তো কী বলিবে? আজ তো আমিই জেলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আসামী। যাহার ফাঁসি শীঘ্রই হইবে সে-ই এক নম্বর সেলে থাকে। এক নম্বর সেলের পরেই একটি দরজা। কেবল ফাঁসি দিবার সময় এই দরজাটি খুলিয়া আসামীকে ফাঁসির মঞ্চে লইয়া যাওয়া হয়। অন্য সময় দরজাটি বন্ধ থাকে।...সেই চরম মুহূর্তের পূর্বে একবার দরজাটি দেখিতে ইচ্ছা করে। উহার তালাটি কি মর্চে পড়া?... আমার সহিত মৃত্যুর ব্যবধান কেবল মাত্র এই দরজাটি। তথাপি 'আসামী' কথাটিতে আমার মনটা খুঁতখুঁত করিতেছে। বোমার বাবুদেরও তো সিপাহীজী 'আসামী' বলিল, তাহা কিন্তু আমার কানে কটু বোধ হইল না। বোধ হয় 'বোমার মামলার আসামী' কথাগুলিতে আমার কান অভ্যস্ত। ঐ কথাগুলির সহিত দেশসেবকদিগের স্বদেশপ্রেমের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে– অন্তত আমার মনে। কিন্তু ফাঁসির আসামী কথাটি শুনিলেই আমার সাধারণ খুনে ডাকাতের কথা মনে পড়ে। ইহাদের চিত্রই ঐ কথাগুলির সহিত আমার মনে বদ্ধমূল বসিয়া গিয়াছে। মনে হয় সিপাহীজী আসামী শব্দটি ব্যবহার করিয়া আমাকে চোর ডাকাতের সহিত এক করিয়া দিল। এই জন্যই বোধ হয় কথাটিতে আমার অপছন্দ ও আপত্তি। অন্তরের ভিতর বেদনার অনুভূতি জাগে—একজন ওয়ার্ডারের চক্ষেও আমি পূজ্য

১। "সরকার অত বোকা নয়।"

দেশসেবক নই। আমি তাহার নিকট হইতে আশা রাখি প্রশংসার—কথায় না হউক অন্তত হাবভাবে, আমার ত্যাগের জন্য। ইহাদের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দিতেছি, কোথায় ইহারা কৃতজ্ঞ থাকিবে—তা নয়, কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে ইহারা দিতে জানে সহানুভূতি;—শহীদের প্রতি সহানুভূতি নয়, যে হতভাগ্য মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা এই লীলাময়ী ধরণীকে উপভোগ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি করুণা…

মনে পড়িল মাসিমাকে। নৈহাটী স্টেশনে মাসিমাকে পশ্চিমের গাড়িতে তুলিয়া দিতে গিয়াছি। মাসিমার মাথায় চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, গেরুয়া-বস্ত্র পরা, গলায় তুলসীর মালা। নিজের সংসারের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। মঠে বা আশ্রমে থাকেন। নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবন যাইতেছেন। সঙ্গে বিস্তর লটবহর,—সোনামুগের বস্তা, ডাব, ছানাবড়ার ক্যানেস্তারা, মাজা তিল। গুরুভাইবোনদের জন্য যাইতেছে। এই জিনিসগুলি গাড়িতে তুলিয়া দেবার জন্যই আমার আসা। মাসিমা গাড়িতে উঠিলেন। সব জিনিস কুলীর মাথা হইতে নামাইয়া গাড়িতে রাখিলাম। মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব জিনিস উঠেছে তো?" আমি এক-দুই করিয়া গনিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ মোট বাইশটি মাল উঠিয়াছে।" নিমেষে মাসিমার চোখে জল আসিল। আমিও অপ্রস্তুতের একশেষ। বুঝিতে পারিলাম নিজের অজ্ঞানতায় কোন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। পরে মাসিমাই তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন—রেশমী কাপড় দিয়া ঢাকা, তাঁহার স্বর্গীয় গুরুদেবের তৈলচিত্রটিকে আমি 'মালে'র মধ্যে গনিয়াছি। সেই সময় মাসিমার এই মনস্তত্ত্ব আমার নিকট অদ্ভুত মনে হইয়াছিল;—আর আজ 'আসামী' কথাটি শুনিবার পর নিজের চিন্তাধারা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতেছি।…ফাঁসির আসামীকে আসামী না বলিলেই আশ্চর্য হইবার কথা।

ফাঁসির মঞ্চ কথাটিকেও যেন কত শহীদের স্মৃতির সুবাস ঘিরিয়া আছে; কিন্তু উহাকেই 'ফাঁসিকাঠ' বলো, মনে পড়িবে খুনী আসামীর কথা। আর সব চাইতে আশ্চর্য, মানসনেত্রে দেখি একটি মৃতদেহ জিমনাস্টিকের হরাইজ্যাণ্টাল বারে ঝুলিতেছে—অসার পা দুখানি শূন্যে ঘুরপাক খাইয়া দুলিতেছে—ধীরে একঘেয়ে গতিতে,—উত্তর, উত্তরপূর্ব, পূর্ব, পূর্বদক্ষিণ,

দক্ষিণ, দক্ষিণপশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্বদক্ষিণ, পূর্ব, উত্তরপূর্ব, উত্তর,—কোন ইংরাজী নভেলে পড়া একটি দৃশ্য।…

দশ নম্বর সেল হইতে ওয়ার্ডার ডিউটি আরম্ভ করিয়াছে বলিল। তাহার মানে আজ এগারো হইতে বিশ নম্বর সেল খালি। যে সকল কয়েদী জেলের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে জেল-কর্তৃপক্ষ সাধারণত সেলের সাজা দেন। তাহারা ঐ সেলগুলিতে থাকে। সেলে একাকী কিছুদিন বাস করিতে হইবে ইহাই শাস্তি। কয়েকদিন নির্জনবাস যে কী সাজা তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না। ওয়ার্ডের হট্টগোলের ভিতর হইতে দিনকতক মধ্যে মধ্যে নির্জনবাস খুব খারাপ লাগিবার কথা নয়। ঐ সেলগুলির ব্যবহারও হয় খুব। আজ সব ঘর খালি কী করিয়া হইয়া গেল। এরূপ তো কখনও হয় না। বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের স্থানান্তরিত করা হইয়াছে,—হয়তো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদের শাস্তি মাপ করিয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বোধহয় চাহেন, আজ রাত্রে যত কম লোক 'কনডেম্‌নড সেল্‌স্' এ থাকে ততই ভালো। হয়তো আজ এখানে থাকিলে তাহাদের মনের উপর কিছু প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। সেই জন্য যাহাদের এই স্থান হইতে সরাইতে পারা যায়, তাহাদের সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তেরো নম্বরের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কয়েদীটিকেও কি জেনারেল ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে? এক এক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক এক রকম খেয়াল। মেজর ফিল্‌পটস্‌কে দেখিয়াছি, নারীচিত্র সম্বলিত পুস্তক তিনি কখনও জেলে 'পাস' করিতেন না। তিনি শুনিয়াছিলাম, মানসিক ব্যাধিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার মত ছিল যে নারীদেহের প্রতিকৃতি, যাহারা কিছুকাল যাবৎ জেলে আছে, তাহাদের মনের উপর নানারূপ প্রতিক্রিয়া আনিতে পারে। সেবার হাজারীবাগ জেলে এই লইয়া রামখেলাওনবাবুর সহিত 'সাহেবের' কী বচসা! বেচারীর অত সখের 'রয়াল একাডেমী'র সেই বৎসরের ছবিগুলির বই হইতে দশ পনরখানি পাতা কাঁচি দিয়া সযত্নে বাদ দেওয়া অবস্থায় তিনি পাইয়াছিলেন। ছবিগুলি পাইলে তাঁহার মনের উপর কী প্রতিক্রিয়া হইত, তাহা হয়তো আমরা দেখিতে পাইতাম না;—কিন্তু না পাইয়া সাময়িক প্রতিক্রিয়া কী হইয়াছিল, তাহা আমরাও দেখিয়াছিলাম,

ফিল্‌পটস্‌ সাহেবও দেখিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার চৌদ্দদিন নির্জন সেলের শাস্তি হয়।

বড়ই গরম। সেলে বায়ু চলাচলের রাস্তা নাই। বৈশাখ মাস শেষ হইয়া গেল, এখন বোধ হয় সেলের বাহিরেও এইরূপই গরম! দরজার উপর মেঝেতে, গরাদ ধরিয়া বসিয়া থাকি,—যদি বাহিরের ঠাণ্ডা কিছু পাওয়া যায়। ঘরের বদ্ধ গুমোট হাওয়ায় মাথা কেমন যেন ভার ভার মনে হয়। লক্ষ্য করিয়াছি যে এই সময়, কিছুক্ষণ গরাদের ভিতর দিয়া মুখ নাক যতদূর বাহির করা যায় ততদূর বাহির করিয়া, বাহিরের মুক্ত বাতাস সেবন করিলে, ধীরে ধীরে মাথার ভার ভার ভাবটি কাটিয়া যাইতে থাকে।··· আগে মাথার কষ্ট আরও বেশী হইত। কিছুদিন হইতে স্নান করিবার সময় ওয়ার্ডার একটু করিয়া সরিষার তেল দেয়। কোথা হইতে একটি পুরাতন মাখনের টিনে একটু তেল যোগাড় করিয়াছে। ফাঁসির আসামীর প্রতি এই অনুকম্পা,—প্রথমে ভাবিয়াছিলাম লইব না। কিন্তু সে যখন কোন কথা না বলিয়া হাতে ঢালিয়া দিল, তখন আপত্তি করি নাই,—বোধ হয় মাথার অস্বস্তির কথা মনে করিয়া—আর কোন কথা না বলিয়া সিপাহীজী যে, তেলটুকু হাতে ঢালিয়া দিল, তাহা দেখিয়া। বাকসংযম ইহারা জানে না। দিনে আট ঘণ্টা করিয়া ডিউটি, আর রাত্রে দুই ঘণ্টা করিয়া। বড় একঘেয়ে ইহাদের জীবন। এই ডিউটির সময়ের মধ্যে কথা বলিলে, একঘেয়েমির একটু লাঘব হয়। সে একটাও কথা বলিল না, তাহার উপর মাখিবার জন্য সরিষার তেল দিল,—এতখানি সরিষার তেলের মায়া ছাড়িয়া দিল। আশ্চর্য! ইহারা যে জিনিস পায় জেল হইতে চুরি করে। কাপড়-কাচা সাবান, চালভাজা, চীনা-বাদাম, আলু, নারিকেল দড়ি, লোহার পেরেক, হারিকেন লণ্ঠনের ছিপি প্রভৃতি কোন জিনিস ইহাদের হাত এড়াইতে পায় না। উচ্চশ্রেণীর রাজবন্দীদের চায়ের পেয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া, গামছা পর্যন্ত, সব জিনিসই চুরি যায় রাত্রে, যখন ওয়ার্ডাররা ব্যতীত জেলের সকল লোকই ওয়ার্ডে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে। চোরেরা ঘরে তালাবন্ধ, তথাপি চুরি বন্ধ হয় না। এহেন ওয়ার্ডারের এই উদারতা আমাকে বিহ্বল করিয়াছিল। আরও আশ্চর্য হইয়াছিলাম, যখন সেদিন, পাগল কয়েদীটিকে দিয়া

আমার কুর্তা ও জাঙ্গিয়া কাচাইয়া দিল। স্নান করিয়া শুকনো ইজার পরিয়াছি, আর অমনি আমাকে একরকম জোর করিয়াই সেলে ঢুকাইয়া দিল। আমাকে আপত্তি করিবারও অবকাশ দেয় নাই। তাহার পর নিজের হাফপ্যাণ্টের বেল্ট আলগা করিয়া পিছনের দিকে কোমরের নিচে হাত ঢুকাইয়া দিয়া একটি বিড়ি বাহির করিল। বিড়িটি পাগলকে দিয়া, নিজের দিয়াশলাই দিয়া ধরাইয়া দিল,—বুঝিলাম তাহার কাপড় কাচার পারিশ্রমিক। কোন কথা না বলিয়া কেহ যদি কোন কাজ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা বড় শক্ত। মনে হইল সিপাহীজীটি আমার ত্যাগ ও দেশভক্তি সম্বন্ধে সচেতন—ঠিক অন্য সিপাহীর মতো নয়। মন বেশ হাল্কা বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর হইতে আজ কয়েকদিন দিনের বেলায় দেখি সেই সিপাহীরই ডিউটি থাকে।

...তেল মাখে না আমাদের পার্টির চন্দ্রিমা। বলে, তেল লাগালেই তাহার মাথা গরম হইয়া ওঠে। বেঁটে ছোট্টখাট্টো মানুষটি,—অতি সরল, নীরব অক্লান্তকর্মী। অপরের কোন কাজে আসিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যায়। তুই নম্বর ওয়ার্ডে দিনরাত চরকির মতো এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাথার একরাশ রুক্ষ বাবরি চুলে তেল দেয় না। ১৯৩২ সালে মিলিকগঞ্জ কংগ্রেস আশ্রমে "জপতী উদ্ধার" সত্যাগ্রহের সময়, তাহার কানে নাকি সাইকেলের পাম্প দিয়া হাওয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হয়! সেই হইতে সে কানে শুনিতে পায় না।...চোখের সম্মুখে দেখিতেছি—আজ সকালে চন্দ্রিমা, তুই নম্বর ওয়ার্ডে ঘরের ভিতরে শোকসভার আয়োজন করিয়াছে। নীরব শোকসভা। রামভজনবাবু সভাপতি। সকলে সভাপতির সহিত এক মিনিট নীরবে দাঁড়াইল—তাহার পর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। চন্দ্রিমা দাঁড়াইয়া আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুক্ষ চুলের বোঝা তুই হাত দিয়া কানের পাশে সরাইয়া দিল—সিংহের কেশরের মতো দেখাইতেছে চুলগুলিকে। কয়েদীর তুই হাতে হাতকড়া দিয়া দাঁড় করাইয়া দিলে সে যেরূপ ভঙ্গীতে দাঁড়ায় সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া আরম্ভ করিয়াছে, "মেরে গোলাম ভাইয়োঁ! আজ..." চতুর্দিক হইতে গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। সবাই চন্দ্রিমাকে থামিতে বলিতেছে; এখনই হয়তো জেল কর্তৃপক্ষের কাছে মিটিংএর

খবর চলিয়া যাইবে; এখনই হয়তো লাঠি চার্জ হইবে; 'হমহী লোগোঁকে ভিতর কিৎনে সি আই ডি হঁয়'; 'শোকসভামে কহীঁ ভাষণ হোতা হায়'; 'বয়রা হায়, উহ কুছ নহী শুনেগা'; আরও কত প্রকারের মন্তব্য। চন্দ্রিমা কিন্তু আমার কথা বলিয়া চলিয়াছে—আমার ত্যাগের কথা—আমার দেশভক্তির কথা—তাহার সহিত আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথা, আপার ডিভিসন ওয়ার্ডের বর্তমান বাসিন্দা, আমার বাবা "মাস্টার সাহেবের" প্রতি সমবেদনার কথা—আওরৎ কিতার কয়েদী দেবীজী বিলুবাবুর মা, যাহাতে এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি পান, তাহার জন্য ইচ্ছা জ্ঞাপন—এই 'রাষ্ট্রীয় পরিবার'[১] ভারতের সম্মুখে কী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে তাহার কথা—শ্রোতাদের কর্তব্যের কথা—আরও কথার পর কথা গাঁথিয়া চলিয়াছে। অর্ধ নিমীলিত চক্ষের কোণে জল আসিয়া গিয়াছে।···সকলে ধরিয়া চন্দ্রিমাকে বসাইল। স্থির হইল মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য সকলে সারাদিন উপবাস করিবে।···চন্দ্রিমার উপবাসে চিরকাল আপত্তি। তাহার পার্টির লোকেরা রাজনীতি ক্ষেত্রে উপবাসের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া স্বীকার করে না। চন্দ্রিমা কয়েকজন সন্দিগ্ধচেতা শ্রোতাকে বুঝাইতেছে যে, ইহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য উপবাস নয়, শত্রুর হৃদয় পরিবর্তন করিবার জন্য উপবাস নয়, "বিলুবাবুকে প্রতিষ্ঠাকে খেয়ালমে দেশপ্রেমীকে নাতে হমে য়হ করনা হায়।"[২]

তারপর দুই নম্বর ওয়ার্ডে অশথ গাছটির নীচে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির মেম্বারদের একটি মিটিং বসিয়াছে। গোরে সিং বক্তৃতা দিতেছে—সব জিনিস objectively দেখিতে হইবে।···প্রতি মার্ক্সিস্টের কর্তব্য···আরও কত কী। জাতীয় সংঘর্ষে পার্টির দানের জন্য তাহারা গর্বিত; কিন্তু একজন কমরেডের মৃত্যুতে তাহারা শোকে মুহ্যমান নয়। কিন্তু পার্টির যে ইহাতে খুব ক্ষতি হইল এরূপ ভাব তাহারা দেখায় না।···কত লোক আসিবে যাইবে।--কত প্রকারের সামাজিক বন্ধন ও অচ্ছেদ্য পারিবারিক শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে নামিয়াছে—সকলে না হউক, অনেকেই।

১ যে পরিবারের লোকেরা রাজনৈতিক কর্মী।

২ "বিলুবাবুর খ্যাতির কথা মনে করিয়া ও আমরা স্বদেশপ্রেমী বলিয়া আমাদের ইহা করা উচিত"।

নিজের আদর্শের জন্য তাহারা কেহই প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নয়। নিজের প্রাণকে তাহারা মূল্যবান মনে করে না,—অপরের প্রাণের উপরেও তাহাদের সেইরূপ দরদ কম।—কমরেড ভোলা পিছনে বসিয়া হাসিতেছে। একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি রাজবন্দীদিগের মধ্যে। যে রাজনৈতিক কয়েদী দেশের জন্য নিজের স্বার্থ ও নিজের ভবিষ্যৎ সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছে, যে স্বদেশের জন্য হাসিমুখে সর্বদা মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত, তাহাকেও জেলের মধ্যে সামান্য স্বার্থের জন্য জঘন্য নীচ মনের পরিচয় দিতে দেখিয়াছি। কমরেড ভোলা ফাঁসির সাজা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, কিন্তু কয়েকটি মোকদ্দমা মিলাইয়া মোট তেত্রিশ বৎসরের শাস্তি হইয়াছে। অসম্ভব ফুর্তিবাজ সর্বদা হাসিমুখ,—ফাঁসির সাজা হইলেও নিশ্চয়ই মুখের কোণের হাসিটি লাগিয়াই থাকিত,—যে কাজে যত বিপদ তাহাতে তাহার তত আনন্দ বেশী। এই বালকের মতো সরল একনিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমীটির ভাবিবার ক্ষমতা অল্প কিন্তু কিছু হুকুম তামিল করিতে সে দ্বিধাহীন। এই কমরেডকেও দুই নম্বর ওয়ার্ডে থাকিবার সময় ডালের লঙ্কা লইয়া কালেশ্বর প্রসাদের সহিত মাথা ফাটাফাটি করিতে দেখিয়াছি।

রাজবন্দীদের এই সকল দুর্বলতা নিত্য জেল-কর্মচারীদিগের নজরে পড়ে। দেশের লোক রাজবন্দীদিগকে যে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে জেলের কর্মচারীগণ কেমন করিয়া সে দৃষ্টিতে উহাদের দেখিবে? এই জন্যই বোধহয় দেশের লোকের প্রশংসা ব্যতীত উহাদের প্রশংসার জন্য আমি এত লালায়িত।... জেলর একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বুঝাইতেছিলেন যে, নয় ও দশ নম্বর সেলের কয়েদীরা খুব ভালো; "They never grouse and grumble"—ইহাই উহাদের প্রশংসার মাপকাঠি।...সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন সেদিন আমাকে আমার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন জেলরবাবু একটি পকেটবুক খুলিয়া, ফাউণ্টেনপেন লইয়া আমি কি চাই তাহা নোট করিতে একেবারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভদ্রলোকটিকে খুব হতাশ করিয়াছি।

......সেলের বাহিরে যেখানে কুঁজাটি আছে ঠিক সেইখানে জেলর বাবু সেদিন দাঁড়াইয়াছিলেন।

...ঘরের বাহিরে দরজার সম্মুখে একটি কুঁজোয় জল থাকে। এটি কিন্তু

বাহিরে থাকে, আমাকে আত্মহত্যার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নয়; সেলের সকল কয়েদীকেই ইহা হইতে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়—অবশ্য নয় নম্বর ও দশ নম্বর বাদে। যাহার তৃষ্ণা পায় সে সিপাহীজীকে ডাকে, না হয় সেলের ঘণ্টা বাজায়। সিপাহীজী নিজের ইচ্ছা ও অবকাশ মতো উঠিয়া তাহাকে জল দেয়। সাধারণতঃ যে যখন জল চায় সে তখনই জল পায় না। অনেকের কাকুতি-মিনতি যখন একসঙ্গে বেশ মুখর হইয়া উঠে, তখন সিপাহীজী উঠিয়া কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া দেয়। এক নম্বর সেলের বিশেষ খাতির, সেইজন্য আমার দরজার সম্মুখে কুঁজাটি রাখা থাকে। কুঁজার নলটি গরাদের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া গ্লাসে জল গড়াইয়া লইলাম। যতদূর পারি জল গরাদের বাহিরে ফেলিতে চেষ্টা করিয়া, মুখে চোখে জল দিয়া লইলাম। মুখ চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। সেলে নালী নাই। এই দরজার নীচ দিয়াই জল বাহিরে যাইবার কথা। মুখচোখ ধুইবার সময় জল বেশীর ভাগ ভিতরেই পড়িল। কুলকুচা করিয়া বাহিরে ফেলিলাম,—দেওয়াল আর মেঝের সংযোগ-স্থলের সেই ছোট গাছটির উপর। এই গাছটিতে কুলকুচা করিয়া আমি প্রত্যহ জলসিঞ্চন করি। প্রতিবারই যখন কুলকুচা করি, কতদূরে জল ফেলা যায় তাহার পরীক্ষা করি। মোটামুটি এ সম্বন্ধে ধারণা হইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়া, বসিয়া, মুখের ভঙ্গী বদলাইয়া, কত রকমে নিজের সহিত প্রতিযোগিতা করি—আগের রেকর্ড ভাঙ্গিবার চেষ্টা করি। দ্বিপ্রহরে যখন বাহিরের সিমেন্টের মেঝে তাতিয়া আগুন হইয়া থাকে, তখন কুলকুচা করিয়া তাহার উপরে জল ফেলি। তাহার পর এক দুই করিয়া গনিতে থাকি, কতক্ষণে জল নিশ্চিহ্ন হইয়া শুকাইয়া যায়। কী গাছ জানি না, তামাটে রঙ-এর পাতা। পাতাগুলি নিমের পাতার মত দেখিতে। লণ্ঠনটি কাছেই থাকায় গাছটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ছোট লতানে গোছের গাছ, দেওয়ালটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। লণ্ঠনের আলোতে ছোট ছোট হল্‌দে ফুলগুলিকে দেখা যাইতেছে না। কী বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা গাছটির! ইট আর সিমেন্টের মধ্যে ফাটল। তাহারই মধ্য দিয়া ইহা জীবনী-শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, আমার অবর্তমানেও লইতে থাকিবে। আমার কুলকুচার জলের প্রত্যাশা সে রাখে না। গাছটির দিকে

তাকাইলে মনে হইতেছে উহার ডাঁটা ভাঙ্গিলেই সাদা ঘন দুধের মতো রস বাহির হইবে।—ক্ষেতপাঁপড়া, যাহাকে আমরা বলি ক্ষীরুই, তাহার রসও ঠিক এইরূপ দেখিতে।…সেই রস জ্যাঠাইমা আমার কণ্ঠার নীচে একটি ফোড়ার উপর লাগাইয়া দিয়াছিলেন, ফোড়া ফাটাইবার জন্য। তাহার পর হইতে দুর্গাদির খেলাঘরের জন্য একটি পুরাতন মাটির প্রদীপে, আমি আর নীলু কতদিন ক্ষীরুয়ের দুধ সংগ্রহ করিয়াছি।

…দুর্গাদির ছোট বোন টেপী, আধময়লা ফ্রক পরা, মাথায় বেড়া বিনুনি। আমি আর নীলু তাহাকে, আশ্রমের কাছে গ্যাঞ্জেস-দার্জিলিং রোডের উপর রবার গাছের নীচে লইয়া গিয়াছিলাম, কেমন করিয়া রবারের রস জমাইয়া রবার তৈয়ারী করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য। আমি গাছে উঠিয়া ছুরি দিয়া একটি ডালের উপরের ছাল কাটিয়া দিলাম। টপটপ করিয়া দুধের মত রস পড়িতেছে; নীলু টেপীকে ধরিয়া তাহার নীচে দাঁড় করাইয়া দিল। বলিল, "উপরে তাকাস না, খবদ্দার! তোর মাথার উপর ইরেজার তৈরী করে দিচ্ছি।" পরে টেপী বেচারীর কী কান্না! রবারের রস জমিয়া তাহার মাথার চুল কামড়াইয়া ধরিয়াছে। মা'র কাছে আমরা দুই ভাই সেদিন কী প্রহারই খাইয়াছিলাম! ভাগ্যিস বাবা 'দেহাত'[১] গিয়াছিলেন তাহার মাসখানেক পরেই টেপী মারা যায়। আমার আর নীলুর তাহার পর কী মানসিক দুশ্চিন্তা! কী অনুশোচনা! আশ্রমের শিশুগাছের তলায় বসিয়া আমরা ঠিক করিয়াছিলাম, রবারের-রস মাথায় দিয়াই তাহার ডিফ্থিরিয়া হইয়াছে। নীলু আমার আগেই খবর আনিয়াছিল, কার্তিক ডাক্তার টেপীর গলা কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে রবারের রস বাহির করিয়াছে।…দুর্গাদির বাড়ির সব ছেলেপিলেদের, মা সেদিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে লইয়া আসিয়াছিলেন। টেপীর ভাই ভোঁদা, এই বৎসর উকীল হইয়াছে, তখন সে কত ছোট। মা'র কাছে শুইয়াছিল। রাত্রে বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরিয়া কী কান্না!…

দরজার সম্মুখে বসিবার উপায় নাই, জলে ভিজিয়া গিয়াছে। নীল ডোরাকাটা ইজারটি দিয়া জল মুছিয়া লইলাম। ইজার ময়লা হইলেও আর

১ মফস্বল।

ক্ষতি নাই। কাল তো আর ওটি পরিতে হইবে না। নয় বৎসর আগে ভূমিকম্পের সময় মেঝেতে এই স্থানে গর্ত হইয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রহিয়া 'পি. ডব্লু. ডি'র কর্মনিষ্ঠার সাক্ষ্য দিতেছে। এক নম্বর সেলে যে থাকে তাহার আবার এত বাছ-বিচার! ফাঁসির মঞ্চ হইতে সর্বাপেক্ষা নিকটে এই ঘর, আর যে আসামীর ফাঁসির দিন সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তাহারই দাবী এই ঘরের উপর। সেলের সাড়ে চার হাজার বাসিন্দার মধ্যে এই ঘরের উপর আমারই দাবি সর্বোচ্চে। পি. ডব্লু. ডি'র লোকেরা ঠিকই ভাবিয়াছে—ভিজা মেঝের উপর বসিয়া বাতগ্রস্ত হইতে যতদিন সময়ের দরকার, এ বাসিন্দাকে ততদিন বাঁচিতে হইবে না। আর যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়া তাহার 'মার্সি পিটীশন্' মঞ্জুর হইয়া যায়, তাহা হইলে সামান্য রোগের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আজিকার দিনেও কিন্তু মনে হইতেছে, এই ভিজার উপরে বসিয়া অসুখ করিতে পারে। একটা গল্প পড়িয়াছিলাম,—একজন লোক আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। বিষের শিশি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার বন্ধু বাহির হইতে ইহা দেখিয়া, পিস্তলটি তাহার দিকে নিশানা করিয়া বলিল, "ফেলে দে বলছি গেলাসটা, না হলে এখুনি গুলি করলাম।" হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া গেল। কে বুঝিতে পারে মনের এই গতি!

হয়তো দরজার সম্মুখের এই গর্তটি ভূমিকম্পের পর মেরামতের সময় নজরে পড়ে নাই। এঞ্জিনিয়ারের বিশেষ দোষ নাই। হঠাৎ নজরে পড়ে না। কাছাকাছি জল পড়িলে সব জল ঐ স্থানে জমা হয়—তখন বুঝা যায়—ঐস্থানে একটা গর্ত।...কী কাণ্ড সেবার ভূমিকম্পের সময়! ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বলিতেছি।—পাটনা ক্যাম্প জেল হইতে উত্তর বিহারের সকল রাজবন্দীকে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিল—ভূমিকম্পপীড়িত জনগণের সেবার জন্য। নীলু ১৯৩২ এর শেষের দিকেই ছাড়া পাইয়াছিল। বাবা, মা দুজনেই জেলে। নীলু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়ে। আমরা বি. এন. ডব্লু. রেল দিয়া আসিতেছি। প্রতি স্টেশনেই ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার চিহ্ন বিদ্যমান; 'পথ্‌হারা' না কোন্ স্টেশনের কাছে একদিন বসিয়া থাকিতে হইল। পুল ভাঙিয়া গিয়াছে। নৌকায় পার হইবার

বন্দোবস্ত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিন আনা খোরাকি পাওয়া গিয়াছিল। সেই নদীর ধারের হাটে, দইওয়ালার সহিত 'ঠিকা' হইল চার পয়সায় যে যত দই খাইতে পারে। নগিন্দর সিং প্রায় চার পাঁচ সের দই খাইল,—বিনা মিষ্টিতে লালচে রঙ-এর মহুয়া দই। সঙ্গে পয়সা নাই। কারাগোলারোড স্টেশন হইতে পূর্ণিয়া পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতেই হইবে। গ্যাঞ্জেস-দার্জিলিং-রোডে কী বড় বড় ফাটল! হরদার পুলটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হরদাবাজারের নিকট গিয়া পা আর চলে না। দুবেজী কংগ্রেস-কর্মী। তাহার দোকানে উপস্থিত হইতেই তাহার স্ত্রী দৌড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই "পরণাম" এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল। দেখিলাম মিলের শাড়ি বদলাইয়া সবুজপাড়ের খদ্দরের শাড়িখানি পরিয়া আসিয়াছে। গায়ের রঙ এত বয়স সত্ত্বেও সুন্দর ফুটফুটে,—ঋজু দেহ, টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাকটি—সর্বোপরি চোখ মুখের একটি আত্মমর্যাদার ভাব বৃদ্ধার রূপকে আরও শ্রীময়ী করিয়া তুলিয়াছে। দুবেজীর স্ত্রী ও দুবেজী কী খাতিরটাই করিল!— দুধে চিঁড়ে ভিজাইয়া, সে চিঁড়া দই দিয়া আমরা রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে তৃপ্তি করিয়া খাইলাম। কৌতুকের লক্ষ্য দুবেজী। সকলেই তাহার ভোজপুরী বুলি অনুকরণ করিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। দুবেজী "পৌছাইলাম"কে 'চৌপল' বলেন, তাহা লইয়া কী হাসি! বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাও এই হাসিতে যোগ দিয়াছে। আগুনের 'ঘুরের' ধারে অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুবেইনের সহিত গল্প হইল—মা'র কথা,—এইবার সাদি করিতে হইবে—আরও কী কী মনে পড়িতেছে না। দুবেইন "নিমক সত্যাগ্রহের" সময় লবণ তৈয়ার করিয়া জেলে গিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ কেন জানি না, দুবেজীকে ধরে নাই, বোধ হয়, বয়স হইয়াছে বলিয়া। তাহার পর হইতে 'দুবেইন' নিজেকে দুবে অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে—দুবেজী আমার কাছে এই সব নালিশ করিল। ভারি সরল মন, এই স্বামী স্ত্রী দুই জনের। নিজেদের সামান্য জমি-জমা যাহা ছিল কংগ্রেসকে দান করিয়াছে। রাত্রিতে শুইয়া আছি; উহারা মনে করিল আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, আমাদের কম্বলের উপর আর একখানি করিয়া কম্বল চাপা দিয়া গেল

তাহার পর ঐ স্থান হইতে রওনা হইবার পূর্বে স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের দিকে আমাকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিল, "আমাদের একটি অনুরোধ রাখতে হবে। আমাদের ছেলেপিলে নেই। তোমাকে কতদিন থেকে, সেই যখন তুমি এতটুকু ছিলে, তখন থেকে দেখছি। মাস্টার সাহেবের ছেলে তো আমাদেরও ছেলে। আমরা গরীব মানুষ, তোমরা হলে বাঙালী, বিলুবাবু। কিন্তু আমাদের একটি কাজের দায়িত্ব তোমাকে নিতেই হবে। আমাদের যে কয়েক বিঘা জমি আছে, তাহার আয় আমি কংগ্রেসের কাজেই খরচ করি। এগুলো লেখাপড়া করে দিয়ে যেতে চাই। আমরা মরে যাবার পর তুমি এগুলো মহাত্মাজীর কাজে লাগিও। আমরা আর কটা দিনই বা বাঁচবো?" তাহাদের কাছে কথা দিয়াছিলাম। দুবেইন এখনও বোধ হয় সেই রঙীন কাগজের রথের মধ্যস্থিত রামজীর 'মূরতের' সম্মুখে বসিয়া, প্রদীপের আলোয়, তকলিতে এণ্ডির সুতা কাটিতেছে।

…হরদাবাজার হইতে পূর্ণিয়া পৌছিলাম পরের দিন দুপুর বেলায়। 'গান্ধী আশ্রম' গবর্ণমেণ্ট "জপতো" করিয়াছে। তথাপি সেই দিকেই চলিলাম।… দূর হইতে দেখিতেছি, জেলা কংগ্রেস অফিসঘরের পাশের শিশু গাছটি পীতাভ-জরদ রঙ-এর বিগ্নোনিয়া ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। আমি সেবার লতাটি ঐ গাছে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। পতাকাস্তম্ভের জাতীয় পতাকা পূর্বে বহুদূর হইতে দেখা যাইত। এখন তাহা নাই। কিন্তু ভাসমান, সাদা মেঘখণ্ডের পটভূমিকায়, বিগ্নোনিয়া ফুলে ভরা 'শিশু' গাছটি জাতীয় পতাকারই কাজ করিতেছে—সাদা, জাফরানী, সবুজ তিনটি রঙ!…আশ্রমের বাড়িগুলি খড়ের। আমাদের বাড়ির বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। টিউবওয়েলের উপরের অংশটি নাই। এস. ডি. ও. সাহেবের সীল করা দরজায়, তালার চিহ্নমাত্রও নাই। তক্তাপোষ ও বড় আলমারিটি ছাড়া আর কোন জিনিসই ঘরে নাই; ছোটখাট সব জিনিসই যে পারিয়াছে সেই লইয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের দরজার কপাট দুইটিও কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। মহাত্মাজীর ছবিখানি চুরি গিয়াছে। ন'দির তৈয়ার করিয়া দেওয়া ফ্রেমে বাঁধান তুলার পেঁচাটি দেখিলাম না। সহদেওএর বোন সরস্বতীর ছোটবেলার তৈরী কার্পেটের উপর বোনা "Untouchability is a sin"—'সিন' এর Nটি Zএর মতো করিয়া লেখা—

তাহাও নাই। আমার লেখা একটি কবিতা, নীলু পেস্টবোর্ডের উপর আঁটিয়া টাঙাইয়া দিয়াছিল—সেইটি রহিয়াছে। লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর আমারই আঁকা রবিবাবুর ছবি, পিজবোর্ডের উপর আঁটা, এখানিও দেখিলাম কেহ লইবার যোগ্য দ্রব্য বিবেচনা করে নাই। হয়তো ফ্রেমে বাঁধানো নয় বলিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। ফুলের গাছগুলি চুরি হইয়া গিয়াছে। কেবল গোলাপী আর সাদা ভিনকা ফুলে আঙ্গিনাটি ভরিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় উহার গাছ ছাগলে গরুতে খায় না। মধ্যে মধ্যে দুই একটা ভ্যারেণ্ডার গাছ মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে, আভিজাত্যহীন নগণ্য ভিনকাকে তাচ্ছিল্য করিবার জন্য। গুটিপোকার চাষের বাড়ি একেবারে পড়িয়া গিয়াছে। গোরুর গাড়ির চাকা দুইটি কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। তেলের ঘানির ঘরটি খাড়া আছে। কিন্তু ঘরের ভিতরটি অড়র গাছের মতো দেখিতে এক প্রকার আগাছায় ভরা। ভিতরে যাইবার উপায় নাই। আশ্রম লাইব্রেরীর বই একখানিও নাই। হলঘরের মধ্যে দেখিলাম রাশীকৃত আবর্জনা—অনেকগুলি ছাগল ও গরু প্রত্যহ বাঁধিবার চিহ্ন তথায় বর্তমান। প্রতিবেশীরা দেখিতেছি কংগ্রেসের এই দুর্দিনেও ঘরটিকে ভুলে নাই।...

মন উদাস হইয়া গেল। আশ্রম হইতে বাহির হইয়া জ্যাঠাইমার বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকিলাম। এটা বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ি। বাড়ির ঠিক সম্মুখে একটি তাঁবু। তাঁবুর দরজার উপর একটি সাদা ছাগল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া একমনে একটি লতাপাতার এমব্রয়ডারী করা টেবিল ক্লথ চিবাইতেছে। ননীদির মেয়ে বুড়িয়া, আর তাহার খেলার সাথীগণ, মাঠের মধ্য দিয়া যে বিরাট ফাটলটি চলিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উবুড় হইয়া শুইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সকলে দৌড়াইয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওখানে কী করছিলি?" বলিল, "ছোটমামা বলেছে যে, ফাটলের মধ্যে দিয়ে আমেরিকা দেখা যায়।"……বাহির হইতে চীৎকার করিতে করিতে বুড়িয়া বাড়ি ঢুকিল—"দিদিমা দেখ, কে এসেছে।" জ্যাঠাইমা আর ন'দি হবিষ্যি ঘরে খাইতে বসিয়াছেন। "কোথায় ন'দি" বলিয়া ঢুকিতেই দুইজনেই খাওয়া ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। জ্যাঠাইমার ডান হাত এঁটো। বাঁ হাত দিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইলেন। নীলু দেখি ঘরের মধ্যেই

ছিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিল। "জ্যাঠাইমার খাওয়াটি নষ্ট করলে তো—এখন জ্যাঠাইমার পাতে বসে ওগুলি গেলো"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ন'দি বলিল, "দেখেছ, দেখেছ. আমাদের তো হয়েই গিয়েছিল।" ন'দির চোখে কপট ক্রোধের চিহ্ন। জ্যাঠাইমা নীলুকে তাড়া দিয়া কহিলেন, "তুই আবার ঐ ভাঙ্গা ঘরে শুয়েছিলি! ঘর চাপা পড়ে মরবি না কি? তোকে নিয়ে আর পারি না। আর আমি তোকে এখানে রাখবো না। পাঠিয়ে দেবো মামার বাড়িতে। কী ডাকাত! কী ডাকাত! কাল রাতেও ঐ আটফাটা ঘরে শুয়েছিলি!" তারপর কত কথা, কত গল্প! নীলুর কথাই ফলিল। সেই পাতেই আমাকে খাইতে হইল। আমরা কখনও জ্যাঠাইমাদের বাড়িকে নিজেদের বাড়ি ছাড়া ভাবিতে পারি নাই। জ্যাঠাইমাদের বাড়ি চিরকাল আমাদের "ও বাড়ি"।

জ্যাঠাইমাকে মনে পড়ে—সম্মুখের দুইটি বড় বড় দাঁত মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। কপালে দুই ভ্রূর মাঝে একটি নীল উল্কির দাগ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ছোট্ট মুখখানি। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। আর হাসিলেই দেখা যায় সম্মুখের নীচের পাটির দুইটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। পরনে মটকার থান। জ্যাঠাইমার চোখে মুখে কথাবার্তায়, এমন মাতৃত্বের ভাব যাহা সচরাচর দেখা যায় না। রাফায়েলের মাতৃমূর্তি বড় গম্ভীর, কেমন যেন একটু আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব; সর্বশরীরে সাবলীল ছন্দ ও স্বচ্ছন্দগতির অভাব; হাসপাতালের নার্সদের মেট্রনের মতো যেন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ভরা; কিন্তু জ্যাঠাইমা যেন দেশী পটুয়ার আঁকা যশোমতীর ছবি,—চাকচিক্য নাই কিন্তু অন্তরে সাড়া দেয়। আমার মা'র যে-ভাব আমার আর নীলুর প্রতি, জ্যাঠাইমার সেই ভাব পাড়ার সব ছেলেমেয়ের প্রতি। সকলেরই এখানে অবারিত দ্বার; কিন্তু আমার গর্ব যে আমার স্থান তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চে। নীলুরা তো যখন-তখন জ্যাঠাইমাকে এই বলিয়া ক্ষ্যাপায় যে, তিনি আমার উপর পক্ষপাতিত্ব করেন; আর সকলকে না দিয়া, লুকাইয়া আমার জন্য খাবার রাখিয়া দেন। আমি জেলে থাকিবার সময় জ্যাঠাইমা একবার খুব অসুখে পড়েন। সেই সময় নাকি তাঁর সব সম্পত্তি আমাকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন দেখা যায়, তাঁহার নিজের সম্পত্তির মধ্যে আছে

একটি পুরানো বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ছাব্বিশটি টাকা,—আর এক কলসী পুরানো ঘি—প্রতিমাসে কিছু কিছু করিয়া জমানো। নীলু রসাইয়া এই সকল গল্প করে এবং যখন-তখন জ্যাঠাইমাকে এই জন্য উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে।

···সেই একবার জ্যাঠাইমার ভাইয়ের নাতনীর বিয়েতে জ্যাঠাইমাকে লইয়া গিয়াছিলাম তাঁহাদের দেশে। পাবনা জেলার ছোট একটি গ্রাম; যমুনা নদীর তীরে। জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহাদের গ্রাম দেখিতে বাহির হইয়াছি। তাঁহার কবিরাজদার ভিটে; গ্রামের বাবুদের ভাঙা মন্দির; ভৈরব ভুঁইয়া—যাঁহার নামে শুকনো গাছে ফল ধরিত, বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটী; আরও কত জায়গা দেখিলাম। জ্যাঠাইমার কাছে বাল্যকাল হইতেই এই সকল স্থানের এত গল্প শুনিয়াছিলাম যে, কিছুই যেন নূতন লাগিতেছিল না। তাহার পর জামাইদিঘীর ধারের বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছি,—জ্যাঠাইমা দেখাইলেন, এইখানে নবদ্বীপ ডাক্তার সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। "তখন এ জেলায় একখানি মাত্র সাইকেল ছিল। সাইকেল দেখবার জন্য আমরা পাড়ার সবাই এখানে এসে দাঁড়িয়েছি—বেচারা হুড়মুড় করে পড়ে গেল দিঘীর জলের ভিতর, একেবারে সাইকেল-টাইকেল নিয়ে!" আমি বলিলাম, "জ্যাঠাইমা, সে যে বলেছিলে ফেরিমেণ্টের রাস্তার (আসলে কথাটি Ferry Fund) উপর।" "আরে! এই বাঁধের উপর দিয়ে এইটাই ফেরিমেণ্টের রাস্তা। আর ছাখ, তোকে একটা কথা বলি; বোস এখানে। তুই যে আমাকে জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা বলে ডাকিস, আমার একটুও ভালো লাগে না। আমাকে মা বলতে পারিস না!" আমি কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, আগ্রহান্বিতভাবে, জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আমার উত্তরের প্রতীক্ষায়। প্রগাঢ় স্নেহপূর্ণ মাতৃত্বের ঝলকে মুখ উদ্ভাসিত। প্রশ্নটি এত অপ্রত্যাশিত যে আমার মুখে উত্তর যোগাইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "জ্যাঠাইমাও যা মাও তাই। দুইই তো একই।" দেখিলাম আমার উত্তরে তিনি বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হইয়াছেন। অপরাধীর স্বরে বলিলেন, "তোর মা

আছে; তোকে এ অনুরোধ করা আমার অন্যায় হয়েছে!" তাঁহার দৃষ্টি দীঘির অপর পারে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর নয়।......

সেই দিন হইতে অপর সকলের অসাক্ষাতে জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলিয়া ডাকি। সকলেই কথাটা জানে, কিন্তু তথাপি 'জ্যাঠাইমা' ডাকে ছোটবেলা হইতে এমন অভ্যস্ত, যে সকলের সামনে 'মা' বলিয়া ডাকিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। নবদ্বীপ ডাক্তারের সাইকেল হইতে পড়িয়া যাইবার স্থান দেখাইবার সময় জ্যাঠাইমার হঠাৎ আমার মা হইবার ইচ্ছা কেন হইল, তাহা আজও ঠিক করিতে পারি নাই।......

......ইহার কিছুদিন পরের কথা। যাহা ভয় করিয়াছিলাম, ঠিক তাই। আমার জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলা, মা পছন্দ করেন নাই। আমি আর নীলু রান্নাঘরের দাওয়ায় খাইতে বসিয়াছি। মা পরিবেষণ কারতেছেন। পরিবেষণ করিয়া মা আমাদেরই সঙ্গে খাইতে বসিবেন। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, 'মা, জানো, জ্যাঠাইমা তিল বাঁটা দিয়ে একরকম এমন সুন্দর ঝিঙ্গের ঝোল রাঁধেন?" "তা সেখানে খেলেই পারো। এখানে আর খাওয়ার দরকার কী?" কি কথার কী উত্তর! মা স্বভাবতঃই মিষ্টভাষিণী। তাঁহার কথার এই আকস্মিক ঝঙ্কার আমাকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। নীলু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আজকে মাকে বলেছি কিনা যে, তুমি জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলো, তাই মা চটেছে। দেখলে না 'তুমি' বললেন।" সত্যই মা বেশী রাগ করিলে আর আমাদের 'তুই' বলেন না। ......নীলুটাও আবার এমন বোকা; মা'র আড়ালে খবরটি আমাকে দিলেই পারিত। দেখিলাম মা'র দু'চোখ দিয়া জল আসিতেছে, তাহা ঢাকিবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমার মনে হইতে লাগিল যে একটি গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি।

......মা যে ওয়ার্ডে আছেন, তাহার নাম 'আওরৎকিতা'। আজ আর ঘুমাইতে পারিবেন না। মা বোধ হয় মশারি ফেলিয়া জপে বসিয়াছেন। মন খারাপ হইলেই মা দেখিয়াছি জপে বসেন। নীলু যখন দেউলীতে গত বৎসরের প্রথমের দিকে অসুখে পড়িয়াছিল, তখনকার কথা বলিতেছি। হঠাৎ খবর আসিল নীলুর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করা হইয়াছে, আজমীর

হাসপাতালে। সেদিন সারারাত মা পূজার ঘরে থাকিলেন। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় কেবল একবার আমার ঘরে আসিয়া আয়নার পাশে ও তাকের উপর, শিশিগুলির পাশে কিছু খুঁজিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল মা হয়তো নীলুর অসুখের সম্বন্ধে আমার সহিত কথা বলিতে চাহেন। অথচ সাহস পাইতেছেন না, পাছে আবার আমি অসুখের গুরুত্ব বা প্রাণের আশঙ্কা সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া ফেলি, সেই জন্য। বোধহয় জপ করিয়া মনে সম্পূর্ণ বল পান নাই। মা ভাবিলেন আমার দৃষ্টি বই-এর দিকে নিবদ্ধ— তাঁহাকে আমি দেখিতেছি না। দেখিলাম অতি ভক্তিভরে দেওয়ালে টাঙ্গানো গান্ধীজীর ছবিটিকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার আলনায় টাঙানো, গুছানো কাপড়গুলিকে আবার গুছাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন আমি মাকে বলিলাম, "অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন অতি সাধারণ ব্যাপার। সকলেরই সেরে যায়। আজকাল বিলেতে সুস্থলোকে এই অপারেশন করিয়ে নেয়।" মা এমন ভাব দেখাইলেন যেন এ বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা বা ঔৎসুক্য নাই। "দেউলী থেকে আজমীর কতদূরে রে?" আবার সারারাত্রি জপেই কাটিল।...

গুমটির উপর হইতে একজন ওয়ার্ডার একটানা চীৎকার করিয়া চলিয়াছে— "বোলোরে নয়াগোল; বোলোরে জুভলিন (Juvenile Ward)......।" রাত্রি এখনও কিছু বেশী হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে অধিকাংশ ওয়ার্ডের "পাহারা"ই দায়সারা ভাবে জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওয়ার্ডার গানের মতো সুর ধরিয়া বলিতেছে "বোলোরে..."। "বোলোরে পাঁচনম্বর" বলিতে, আমার ষোল গুনিতে যত সময় লাগিল, ততটা সময় লাগিল। একজন ওয়ার্ডার আমায় একদিন বুঝাইয়াছিল, তাহারা যে গানের সুরে কথাগুলি বলে তাহাতে কষ্ট কম হয়, আর গলা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রতি ওয়ার্ডে চারটি করিয়া বড় বড় হল—দুইটি উপরে, দুইটি নীচে। জেলের ভাষায় এই হলগুলির নাম "খাটাল"। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের প্রথম হল হইতে জবাব আসিল—ভাঙ্গা খনখনে গলায় "পাঁচ নম্বর, পহলা খাটাল—জমা একশো সন্তাওন—আসামী, তালা, বাত্তি[১] ঠিক হায়।" লোকটির গলা শুনিয়াই মনে

১। আলো।

হইতেছে উহার মুখজোড়া খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা গোঁফ, ভারি কর্তব্যনিষ্ঠ; তাহার মাথায় নীল টুপি, অর্থাৎ সে 'পাহারা'। মাসে চার আনা করিয়া বেতন তাহার নামে সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে জমা হয়। তাহার বদলে দুই ঘণ্টা রাত্রি জাগিয়া এই পাহারা দেওয়ার কাজ করে। সে সরকারের 'নিমক' খায়, কাজে ফাঁকি দিবে কেন? পাঁচ নম্বরের অন্য তিন খাটাল হইতে যে উত্তর আসিল তাহা এত স্পষ্ট নয়। তাহারা সব কথাগুলি বলিলও না। কেবল একটা "হো-ও-ও-ও···হৈ"-এর মতো শব্দটি শুনাইল; গ্রামের চৌকিদারের নিশুতি রাতের হাঁকের মতো। গানের সুরে বলিবার চেষ্টা নাই—কেবল দিনগত পাপক্ষয় করিবার ধরনে বলা। ইহারা নিশ্চয়ই সাদাটুপিধারী 'মেট' অর্থাৎ ইহারা 'পাহারা' অপেক্ষা পুরাতন কয়েদী। মাসিক আট আনা করিয়া বেতন পায় বটে, কিন্তু তাহারা জেলের অনেক কিছু দেখিয়াছে শুনিয়াছে। তাহারা জানে যে এই কাজ ভাল করিয়া করার উপর তাহাদের "মার্কা" (remission) নির্ভর করে না। আর জানে কী করিয়া হেড জমাদারকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। একজন মেট নেহাত কেউকেটা নয়। তাহার অধীনে আছে এতগুলি কয়েদী। তাহাদের শাসনে রাখিতে হইলে জেলের কর্মচারীদের প্রতি, জেলের নিয়ম-কানুনের প্রতি একটি বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইতে হইবে।···

"বোলোরে নয়াগোল" (Segregation Ward)। যতক্ষণ "বোলোরে" বলিতেছিল আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলাম যে পাঁচ নম্বরের পর ছয় নম্বর বলিবে, না নয়াগোল বলিবে। তাহা হইতেই বুঝা যাইবে ওয়ার্ডার নূতন না পুরানো। ছয় নম্বরের আর একটি নাম 'দামুলী কিতা'। যাহাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহারাই এ ওয়ার্ডে থাকে। এই কয়েদীরা অন্য ওয়ার্ডের কয়েদীদিগকে "কদ্দুচোর" বলিয়া ঠাট্টা করে ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তাহারা নাকি লাউ চুরি করিয়া জেলে আসিয়াছে। এই দামুলীদের (lifer) সকল ওয়ার্ডারই একটু সমীহ করিয়া চলে। আর পুরানো ওয়ার্ডারদের সহিত ইহাদের একটি বন্দোবস্ত আছে। তাহারা গুমটির উপর ডিউটিতে থাকিলে ইহারা সারারাত শান্তিতে ঘুমাইতে পায়। মেট পাহারার চীৎকার ও সংখ্যাগণনা হইতে তাহারা

অব্যাহতি পায়। আর সারাদিন বেচারারা জেলের ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। একটু অবিচ্ছিন্ন নিদ্রার সুযোগ না পাইলে ইহারা সারাজীবন এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিবে কেমন করিয়া!······নূতন ওয়ার্ডার হইলে নিশ্চয়ই 'বোলোরে ছয় নম্বর বলিয়া হাঁক দিত। দুই নম্বর ওয়ার্ড হইতে ছয় নম্বর ওয়ার্ডের দিকে তাকাইলেই যেন মনে হয়, একটি বড় জংশন রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া আছি। এ ওয়ার্ডটি একজন রাজা বাহাদুরের দান। দানের পাত্র, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বাছিবার প্রতিভা রাজাবাহাদুরের নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। যাহা হউক এই দানের দ্বারা রাজাবাহাদুরের কোন গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইয়াছে কি না জানি না, তবে যে হতভাগ্য আজীবন কারাগারে কাটাইবে, তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেয়। লাইফাররা সাধারণতঃ লোক ভালো। পাকাচোরের ছ্যাঁচড়ামি বা নীচতা তাহাদের মধ্যে নাই। জেলকেই ঘরবাড়ি করিয়া লইয়াছে। কেহবা ওয়ার্ডের আঙ্গিনায় সযত্নে তুলসী গাছ পুঁতিয়াছে; কেহ অল্প জায়গা পরিষ্কার করিয়া নিকাইয়া বসিবার স্থান করিয়া লইয়াছে। অনেকেরই নিজের নিজের লঙ্কা ও পুদিনার গাছ আছে। এই গাছগুলির উপর তাহাদের কী মায়া! স্নেহ, ভালবাসা, সন্তানবাৎসল্যের স্বাভাবিক প্রেরণা, তাহারা এই গাছগুলির উপর নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দেয়······

······হাজারীবাগ জেলের সেই ফিরিঙ্গী উইলিয়মস্ সাহেবের ছাড়া পাইবার দিন কী কান্না! চৌদ্দ বৎসর সে জেলে কাটাইয়াছে। তাহার পোঁতা পেয়ারা গাছটি কত বড় হইয়াছে। তাহারই হাতের লাগানো গোলাপজাম গাছটি পাউডারপাফের মতো ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। অশত্থ গাছটির নীচে সে বসিবার জন্য উঁচু বেদী তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছিল। তাহা লইয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও পি-ডব্লু ডি এঞ্জিনিয়রের মধ্যে কত মন-কষাকষি হইয়া গেল—সব জিনিসের দিকে তাকায়, আর ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে। একজন বয়স্থ লোককে এরূপ করিয়া কাঁদিতে খুব কমই দেখিয়াছি। বাড়ি যাইবার ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখিবার আনন্দ অপেক্ষা এই সকল গাছপালা ও জেলের বন্ধু-বান্ধবকে ছাড়িয়া যাওয়ার দুঃখ তাহার অনেক বেশী হইয়াছিল।...

একই ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া ডান পা-খানি অবশের মতো হইয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করিলাম, পায়ের ঝিনঝিনি সারাইবার জন্য দরজার গরাদ ধরিয়া আড়াআড়ি ভাবে যখনই বসি, দেখি নিজের অজ্ঞাতে ডান দিকে ভর দিয়াই বসিয়াছি। আর ডান হাত দিয়া গরাদগুলি ধরিয়া রহিয়াছি। কখনও ভুলক্রমেও বাঁ কাঁধ গরাদের সঙ্গে ঠেকাইয়া, বাঁ দিকে ভর দিয়া বসি না।

......তখন আমরা কত ছোট! স্কুলে যাই না। বোর্ডিংয়ের কাছে হেড মাস্টারের কোয়ার্টার। বাবা স্কুলে গিয়াছেন। মা বসিয়া সুপারি কাটিতেছেন। আমার আর নীলুর মধ্যে কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। নীলু বলিতেছে মা'র ডান কোলটি তাহার; বাঁ কোল আমার লইতে ইচ্ছা হইলে আমি লইতে পারি। কেন জানি না, আমার বাঁ কোলটি লইতে অপমান বোধ হইতেছে। দুই জনেই মা'র ডান কোলের উপর হাত রাখিয়া, নিজের নিজের দাবি কায়েম রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। এই হুড়াহুড়ির মধ্যে হঠাৎ নীলুর পায়ে লাগিয়া, কাটা সুপারি রাখিবার বেতের কাঠাটি উল্টাইয়া গেল। মা ঠাস-ঠাস করিয়া আমার পিঠে দুই চড় বসাইয়া দিলেন; "বুড়ো ছেলে, লজ্জা করে না, যত বয়স হচ্ছে তত গুণ বাড়ছে!" আমি জবাব দিলাম, "আমি সুপারি ফেলেছি নাকি?"

"ফের কথা! ছোট ভাই ডান কোল চাচ্ছে, তা ওঁনারও ডান কোল নিতে হবে। ডান কোল নীলুর। আর একটু হলেই আমার হাত জাঁতিতে কেটে গিয়েছিল আর কি!"

ক্রোধে, লজ্জায়, অপমানে চোখে জল আসিয়া গেল। খানিকটা দূরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নীলু কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া চলিয়া গেল,—বোধ হয় দাবিদার না থাকায় তাহার ঝগড়া করিবার সাধ মিটিয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ হইতে অনুভব করিতেছিলাম যে মা মধ্যে মধ্যে আড়চোখে আমি কী করিতেছি দেখিতেছেন। তাহার পর সুপারি কাটা শেষ হইলে কাঠাটি দেরাজের উপর রাখিয়া, আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "তুই এত বোকা কেন? বাঁ কোলটাই তো ভালো। দেখিস নি ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানোর সময়, ডান হাত দিয়ে খাওয়ায়; বাঁ কোলে মাথা দিয়ে ছেলে শুয়ে থাকে।

তুই তো ডান কোলেও শুয়েছিস। বাঁ কোলটা এখন তোর হ'লো। ওঠ, ছাখ, সে দস্যিছেলে আবার কোথায় গেল!" যুক্তিটি সে সময় অকাট্য মনে হইয়াছিল।......

ডান পায়ের অবশ ভাবটি কাটিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছি দেখিয়া, ওয়ার্ডার দরজার কাছে আসিল—যেন জানিতে চায়, আমি কী ভাবিতেছি, কেন হঠাৎ রাত ত্বপুরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলাম। বোধহয় ভাবিতেছে যে বাবুর মনের ঠিক নাই। আর আজকের দিনে তো থাকিবার কথাও নয়। গরাদের বাহির হইতে ওয়ার্ডার দেখিতেছে। মনে হইতেছে যেন চিড়িয়াখানার দর্শক খাঁচার ভিতর কোন বন্য জন্তু দেখিতেছে।

চিড়িয়াখানার কথায় মনে পড়িল...কাশীতে আমার বন্ধু নীরেশের ছোট ঠাকুমা তীর্থ করতে গিয়াছেন। কোন দূরসম্পর্কের ছোট ঠাকুমা। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হইয়াছিল এক বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে। বিবাহের কিছু-দিনের মধ্যেই বিধবা হন। কাশীতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন ছোট ঠাকুমার মা আর বাবা। নাম ছোট ঠাকুমা, কিন্তু বয়স এত কম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাদের লইয়া আমি আর নীরেশ প্রচুর উৎসাহের সহিত কাশীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়াছিলাম। রাজার চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছি। বাঘের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। বাঘটি দুই পা আগে বাড়াইয়া দিয়া একটি বিকট শব্দ করিল। উহার মুখের ভাব হাই তোলার মতো লাগিল। নীরেশের ছোট ঠাকুমা "মাগো', বলিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, বোধহয় ভয়ে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। সম্ভবত ব্যাপারটি তাঁহার মা, বাবা বা নীরেশ কাহারও চোখে পড়ে নাই। পড়িলেও অন্ততঃ বিসদৃশ ঠেকে নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র মুহূর্তটিকে উপলক্ষ্য করিয়া মনে মনে কত স্বপ্নজাল বুনিয়াছি! নীরেশের উপদেশ মতো ছোট ঠাকুমার মাকে মাসীমা বলিলাম। কাশীতে তাঁহাদের বাসায় নীরেশের সঙ্গে গেলাম, একেবারে রান্নাঘরে যেখানে তিনি রাঁধিতেছেন। মাসীমা অতি ভাল মানুষ, কথাবার্তা বিশেষ বলিতে পারেন না। শিক্ষিত শহুরে ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে গিয়া, কী বলিতে কী বলিব কেবলই সেই ভয়। আমি রান্নাঘরে

ঢুকিতেই বলিলেন, 'আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো।' কি ভাবিয়া এই কথা বলিলেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর খুন্তিখানি হাতে করিয়া কেমন যেন জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—মুখে একটি অর্থহীন হাসির ভঙ্গী। ইহার পরের কয়েকদিন উঁহাদের লইয়াই আমরা ব্যস্ত রহিলাম। ছোট ঠাকুমার বাবার জন্য চার রকমের চারটি টর্চ কত দোকান ঘুরিয়া কিনিলাম; বাজারে বাহির হইলেই তাঁহার ঐরূপ কোন একটি জিনিস কিনিবার কথা মনে পড়ে। গ্রাম্য অমার্জিত কথাবার্তা ভদ্রলোকের। মেয়ের অভিভাবক; জামাইয়ের অবর্তমানে সম্পত্তির দেখাশুনা তিনিই করেন। একমাত্র কন্যার বৈধব্যে বিশেষ দুঃখিত বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাঁহার দারিদ্র্যময় পূর্বজীবনের অতৃপ্ত সখগুলি মিটাইবার সুযোগ পাওয়ায়, আত্মম্ভরিতা যেন কিছু বাড়িয়াছে। একমাত্র ভয় করেন মেয়েকে।...... কাশীতে ছোট ঠাকুমার মা'র অসুখ করিল। অসুখের সময় তাঁহার বাতিক হইল, আমার হাত ছাড়া আর কাহারও হাতের ঔষধ খাইবেন না। প্রত্যহ বিশ্বনাথের মন্দিরের পাণ্ডার বাড়ি হইতে ডাব লইয়া যাইতাম—রোগীর জন্য। বাড়িতে ঢুকিতেই, ছোট ঠাকুমা বলিতেন, "এই যে সন্ন্যাসীঠাকুর এসেছেন। এতক্ষণে মা'র নিশ্চিন্দি।" তখন আমার মনে কেমন একটা কৃচ্ছ্রসাধনের সখ জাগিয়াছে। আমি তখন বাবরি চুল রাখি। গোঁফদাড়ি উঠিয়াছে কিন্তু কামাইতে আরম্ভ করি নাই। সেই জন্য ছোট ঠাকুমা আমাকে সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন। তাঁহার কথা মনে পড়িলেই তাঁহাকে দেখি—নীলাম্বরী শাড়ি পরনে, হাতে বোম্বাইবেঁকী চুড়ি, গলায় মোটা চেন হার—বোধ হয় তাঁহার মা প্রাণে ধরিয়া, তাঁহার একমাত্র মেয়েকে বৈধব্যবেশ লইতে দেন নাই। গায়ের রঙ কালো এবং তাহার সহিত চিড়িতন পাড় নীলাম্বরী শাড়ি একেবারে মানায় নাই। নেহাত সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থবাড়ির মেয়ে—ছোট ঠাকুমা। বলিবার মতো রূপ-গুণ তাঁহার ছিল না। কিন্তু আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহার রূপের স্নিগ্ধতা, সম্পূর্ণ আপন করিয়া লওয়া ব্যবহার আর কথাবার্তার আন্তরিকতা। তাঁহারা যেদিন দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন,—আমি, নীরেশ তাঁহাদের ট্রেনে উঠাইয়া দিতে গিয়াছি। নীরেশ আর ছোট ঠাকুমার বাবা পানওয়ালার নিকট হইতে, শেষ মুহূর্তের মনে পড়া, কিছু ভাল কাশীর জর্দা

কিনিতে গিয়াছেন। আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া—হাত দুইটি গাড়ির জানালার উপর। জানালার সম্মুখে বসিয়া ছোট ঠাক্‌মা আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিতেছি না। আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, "সন্ন্যাসী-ঠাকুর, আমাদের ওখানে একবার যেয়ো।" তাঁহাকে কথা দিয়াছিলাম। অনেক দিন পর্যন্ত ইচ্ছাও ছিল যে কথা রাখিব। ছোট ঠাক্‌মারা চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন সব খালি খালি বোধ হইয়াছিল—কোন কিছুতেই মন বসে না—ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি মুখ সর্বদাই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে! চিঠির প্রত্যাশায় পোস্ট-অফিস পর্যন্ত গিয়া হাজির হইতাম।......

তাহার পর সেই নীলাম্বরী শাড়ি, সেই বোম্বাইবেঁকী চুড়ি কবে স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে মনের অজ্ঞাতে। চার পাঁচ বৎসর পূর্বে পুরাতন চিঠির গোছা পুড়াইয়া ফেলিবার সময় একখানি নীল রঙ-এর কাগজে লেখা চিঠির দুইছত্র পড়িয়া তাহার অমার্জিতভাব বড়ই দৃষ্টিকটু লাগিয়াছিল। —"সন্ন্যাসীঠাকুর বিয়ের ভোজে ফাঁকি দিও না আমাকে; ভোজের জন্য আমি পেট চাঁচিয়া বসিয়া আছি।" 'পেট চাঁচিয়া' কথাটি বড়ই সুরুচির দৈন্যের পরিচায়ক। চিঠিতে এরূপ ধরনের কথা লেখা যায় একথা ভাবিয়াই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যে মন ভরিয়া যায়।......

খট্‌ খট্‌ খট্‌। ভারী মিলিটারী বুটের শব্দ হইতেছে শান বাঁধানো আঙিনার উপর। তিনটি নূতন সিপাহী আসিল। পূর্বের ওয়ার্ডারের নিকট হইতে চার্জ বুঝিয়া লইয়া ঘরের তালা ঠিক আছে কিনা দেখিল। কোন সেলের সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া চ্যাঁচামেচি করিল না। বুঝিলাম সেলের কোন আসামীই এখনও ঘুমায় নাই। ঘুমাইয়া পড়িলে ওয়ার্ডার নিশ্চয়ই ডাকিয়া তুলিত। যখন চার্জ বদল হয়, তখন নূতন ওয়ার্ডার প্রতি সেলের আসামীকে ডাকিয়া তুলিয়া দেখে যে, সে জীবিত আছে কি না! যদি কেহ সেলের দরজার নিকট বসিয়া থাকে, কিংবা কাশিয়া বা কোন উপায়ে সাড়া দিয়া বুঝাইয়া দেয় যে সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে, তাহা হইলে আর তাহাকে ডাকে না। কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। সেলের আসামী—তাহার আবার একটানা দুই ঘণ্টার অধিক প্রগাঢ় নিদ্রার প্রয়োজন কী?

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "এহি রুল হ্যায় বাবু। যদি কেহ অজ্ঞান হইয়া গিয়া থাকে, বা অসুখ হইয়া বাকশক্তি রহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা না ডাকিলে জানিতে পারিব কী করিয়া, 'ডাকদার'কে খবর দিব কেমন করিয়া?" সত্য কথা বলিতে কি, ইহাতে সেলের কয়েদীদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। মশা, ছারপোকা, পিঁপড়া, দিবারাত্র কর্মহীনতা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা কারণে, স্বাভাবিক কর্মজীবনের গভীর নিদ্রা সেলের বাসিন্দাদের নাই।......

দশ নম্বর সেল হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

"শহীদোঁ কে টোলী নিকলী..."

টোলী কথাটি শুনিলেই পাটনা ক্যাম্প জেলের ১৯৩২ সালের "সেবাদল" ট্রেনিং-এর কথা মনে পড়ে। আমি আর নীলু দুই জনেই "সেবাদল" ট্রেনিং লইব বলিয়া ঠিক করিলাম। প্রথম দিন "কবায়ৎ" (drill) শেষ হইলেই, নীলু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "টোলী কিরে?" আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে কয়েকজন 'সিপাহী' মিলিয়া একটি 'টোলী' হয়। 'সিপাহী' মানে হচ্ছে 'প্রাইভেট' আর 'টোলী নায়ক' হচ্ছে এন. সি. ও.। নীলু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "ওসব তো আজকে টেণ্ডুলকার ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি 'টোলী' কথাটা এরা পছন্দ করলো কেন? আর কোন কথা পেল না!" "টোলী," "টোলী" এই বলিয়া কী হাসি! সেই দিনই বিকাল বেলায় টেণ্ডুলকার যখন "কদম খোল" (Stand-at-ease) আর "সাবধান" (Attention) এর অর্থ বুঝাইতেছিল, নীলু একেবারে ড্রিলের মধ্যে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল। টেণ্ডুলকার তো চটিয়া আগুন। সে হুবলীতে হরদিকারের ক্যাম্পে ট্রেনিং লইয়াছে, বোম্বাইএ ক্যাম্প চালাইয়াছে; প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির বিশেষ অনুরোধে সে মহারাষ্ট্র ছাড়িয়া বিহারে সেবাদলের কাজ করিতে আসিয়াছে। সেবাদল ট্রেনিং সম্বন্ধে তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতা, কিন্তু ড্রিলের সময় এরূপ ডিসিপ্লিনের অভাব সে পূর্বে কখনও দেখে নাই। সে ভালো হিন্দী বলিতে পারে না। রাগে তাহার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। "তোমকো এহি লকড়ী মিলেগা" বলিয়া হাতের লাঠিটি দিয়া নীলুকে একটি গুঁতা মারিল।—নীলু তাহার হাত

হইতে লাঠি কাড়িয়া লইয়াছে, আর চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "লকড়ী মিলেগা! উসব মহারাষ্ট্রমে কিজিও, য়হাঁ উসব নহী চলেগা। রাষ্ট্রভাষা বোলনে নহী আতা হায়। পুণা শহরকো পুঁড়ে বোলতা হায়। আওর হিন্দীমে বাত বোলনেকা সওখ হায়।" নীলু টেণ্ডুলকারের হাত ধরিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিক হইতে সকলে গিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই এই খবর জেলের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ক্যাম্পজেলে তখন প্রায় সাড়ে চার হাজার রাজবন্দী থাকে। যে ওয়ার্ডে যাও, সকল স্থানেই ছোট ছোট দল এই বিষয়ই আলোচনা করিতেছে। জেলের প্রতি কোণে, আকাশে বাতাসে সজীব গুঞ্জনধ্বনি। জেলের কেন্দ্র—যাহার নাম আমরা দিয়াছিলাম "চওক"—সেখানে বেশ কয়েকটি বড় দল জটলা পাকাইতেছে। ওয়ার্ডাররা স্থদ্ধ রাজবন্দীদের সহিত মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের জেলের পলিটিক্সে উৎসাহ কম নয়। একজন বক্তৃতা দিয়া আসল পরিস্থিতি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন,—বিহারের স্থনামে কলঙ্ক পড়িবে;—বাহিরের লোক টেণ্ডুলকার। তাহার প্রতি অতিথি-সৎকার কি এমন করিয়াই করা হইল! তাহার উপর রাষ্ট্রভাষা লইয়া উপহাস! তাহার পর নিকটস্থ শ্রোতাদের বিশ্বাসের পাত্র বিবেচনা করিয়া যেন একটি গুপ্তকথা বলিতেছেন, এই ভাব দেখাইয়া গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন—"বাঙ্গালী কিনা।" তাহার পর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি আনিয়া তাহার দ্বারা ব্যক্ত করিতে চাহিলেন, "তোমরা তো সব জানই। তোমাদের কি আর বুঝিয়ে বলে দিতে হবে।" লজ্জায় অপমানে আমার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। ইহারা নীলুর মনের ভাব জানে না। তাহার ব্যবহারের একটি মনগড়া অর্থ করিয়া লইয়াছে। এই অর্থটি তাহাদের বেশ মনের মতো হইয়াছে। সন্ধ্যার পর ওয়ার্ডে নীলুর সহিত দেখা, খাইবার সময়। সূর্যাস্তের পূর্বেই খাওয়া হইয়া যায়। সে সময় ক্ষুধা হয় না বলিয়া আমরা রুটি লইয়া ওয়ার্ডে রাখি। পরে একটু অধিক রাত্রে খাই। নীলু নিজেই কথা পাড়িয়া আমার সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিল। বিকালের ঘটনায় আমি লজ্জিত হইয়াছিলাম; নীলু কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় নাই।…সে বলিয়া চলিয়াছে—"এই সমস্ত ড্রিলের অর্ডারগুলো ইংরেজীতে রাখলে কী ক্ষতি হতো। কুইকমার্চ, স্টাণ্ড-এট-ইজ বললে

ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া কি দুর্ঘট হয়ে যেত নাকি? হিন্দী জানেন না, আবার হিন্দী বলা চাই। ম্যানার্স্ জানে না। ছোটলোক। ওকে আবার খাতির কিসের?" কোন বিষয়ে অযাচিত উপদেশ আমি নীলুকে কোন দিনই দিই নাই। এখনও হয়তো আমি কোন কথা বলিতাম না, যদি ও নিজেই কথাটি না পাড়িত। অন্যান্য রাজবন্দীরা নীলুর আচরণের কী কদর্থ করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলাম। নীলু চটিয়া গেল—বলিতে লাগিল, "এরা আবার স্বরাজ নেবেন!" তাহার পর অনর্গল কত কী বলিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম সব রাগ গিয়া পড়িল কোন অজ্ঞাত সাথীর উপর, যে তাহার গুড় চুরি করিয়া খাইয়াছে। রবিবারের দিন যে সকল রাজবন্দী "এতোয়ার" করে তাহারা ভাতের বদলে গুড় রুটি বা ছয় পয়সার ফল খাইতে পায়। নীলু গুড় নেয়। রবিবার দিন আমার ভাত আমরা দুজন মিলিয়া খাই। আর এই অসুবিধাটুকু স্বীকার করিয়া, আমরা সারা সপ্তাহ একটু একটু করিয়া গুড় খাই। সেই গুড় চুরি গিয়াছে। কাজেই নীলুর মন তিক্ত হইয়া যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমার খারাপ লাগিল, নীলুর চীৎকার করিয়া সকলকে শুনাইয়া রাজবন্দীদের উপর কটু মন্তব্য করা,—বিশেষতঃ যখন আবহাওয়া ইহার পক্ষে অনুকূল নয়। সারা পৃথিবী নীলুর বিরুদ্ধে যাক.—নীলু কখনও নিজের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না। একবার সে মত স্থির করিয়া ফেলিলে আর কেহই তাহাকে টলাইতে পারিবে না। আমি সব সময়ে ভয় করি, এই বুঝি নীলু কোন একটি কাণ্ড করিয়া বসে। জেলের রাজবন্দীদের সময় কাটাইবার খোরাক চাই। যে অসীম কর্মপ্রেরণা জেলের বাহিরে থাকিতে তাহাদের সর্বদা চালিত করিয়া বেড়ায়, তাহারই তৃপ্তির জন্য তাহাদের জেলের মধ্যে নানাপ্রকার জটলা, দলাদলি ও পলিটিক্সের অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু নিত্যনূতন প্রোগ্রাম না পাইলে মন বসিবে কেন? এইজন্য নীলুর ব্যাপার সেবার বেশীদূর গড়াইল না। পরের দিন সকালেই জলখাবার বিতরণের সময় কে যেন কথা উঠাইল যে, প্রত্যহ ভিজাছোলা জলখাবার দেয়; ইহার পরিবর্তে যদি চিড়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভালো হয়। আর কোথায় যাইবে!...সঙ্গে সঙ্গে ছড়া বাঁধা হইল "চেনা-কা[1] বদলে চুড়া লেঙ্গে"; জেলসুদ্ধ লোক সমস্বরে

১। 'ছোলার'

এই চীৎকার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে থালা ও গেলাস বাজানো হইতেছে। কেহ শিষ দিতেছে; কেহবা দরজার গরাদগুলির উপর দিয়া নিজের থালা-খানি হড়হড় করিয়া টানিয়া যাইতেছে। তাহাতে একটি বিকট শব্দ হইতেছে। অনেকে জানালার উপর উঠিয়াছে। দুইজন জানালা বাহিয়া টিনের ছাদের উপর উঠিল। হঠাৎ যেন কোন যাদুদণ্ডের স্পর্শে সকলে একসঙ্গে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদের অতি ধীর ও গম্ভীর বলিয়া জানিতাম, তাহারাও দেখি উৎসাহের আতিশয্যে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিতেছে না। কয়েকজন পাগলের মত ওয়ার্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত "কম্বল" "কম্বল" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইতেছে। তাহার কথায় অনেকে একটি নূতন প্রোগ্রাম পাইল। রাশি রাশি কম্বল দেখিতে দেখিতে কয়েকজন বাহিরে আনিয়া ফেলিল। কম্বলগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। একজন রান্নাঘরে (জেলের স্থানীয় ভাষায় 'ভাঠহা') হইতে এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লা লইয়া আসিয়া খান-কয়েক কম্বলের উপর ফেলিল। তাহা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া ও উৎকট গন্ধ বাহির হইতেছে। দুইজন দৌড়াইয়া গিয়া, যে লোহার পাত্রটিতে ভিজা ছোলা রাখা ছিল, তাহা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। নিকটস্থ ওয়ার্ডার "পাগলী" (alarm) হুইস্‌ল্ বাজাইতেছে। একটানা হুইস্‌ল্ সে বাজাইয়া চলিয়াছে। ইহা শুনিয়া, জেলের সর্বত্র, যেখানে যে ওয়ার্ডার আছে, সকলেই বাঁশী বাজাইতেছে। ফুটবল রেফারীদের সহিত এঞ্জিন ড্রাইভারদের যেন হুইসেলের ঐকতান প্রতিযোগিতা হইতেছে। অগণিত বাঁশীর তীক্ষ্ণ, তীব্র শব্দ জেলের আবহাওয়াকে একটি নূতন রূপ দিয়াছে। গুমটি হইতে একটানা ঘণ্টা বাজিয়া চলিয়াছে—ঢং ঢং ঢং ঢং……। জেল-গেটে আর একটি ঐরূপ ঘণ্টা বাজিতেছে। একেবারে বইয়ে পড়া জাহাজ ডুবির দৃশ্য! আর এদিকে তুমুল কোলাহল "কম্বল জলতে রহে", "থারিয়া বাজতে রহে," "নৌকর-শাহী নাশ হো"—আরও কত কী যাহা ঠিক স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। জেল-কর্মচারী যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। গুমটিতে একটি সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে

"ওয়ার্ড নম্বর ১৭—১৮—১৯।" লাঠি লইয়া গেট হইতে ওয়ার্ডাররা আসিতেছে গুমটির দিকে। অনেকেরই উর্দি নাই, খালি গা, খালি পা। হরেনবাবু জেল-ডাক্তার একটি গেঞ্জি গায়ে দিয়া আসিয়াছেন। গুমটি হইতে একটি ওয়ার্ডার চীৎকার করিয়া বলিয়া চলিয়াছে—"সতরহ, আঠারহ, উনইশ নম্বর।" আর সকলে ঐ ওয়ার্ডগুলির দিকে দৌড়াইতেছে। হঠাৎ গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল "মিলিটারী আ রহী হ্যায়।" বন্দুক হাতে একদল মিলিটারী জেল-গেট দিয়া ভিতরে ঢুকিল। ইহাদের হাবভাবে ব্যস্ততা নাই। কুইকমার্চ করিয়া তাহারা গুমটির নিকট আসিল, পরে তিনটি ওয়ার্ডের কমন-গেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।—ওয়ার্ডের কোণে রাখা ছিল একরাশি বেল। আগের দিন ওয়ার্ডের বেলগাছটি কাটা হইয়াছিল। সকলে গাছের উপর চড়িয়া "গান্ধীজীকা জয়" বলিত, কংগ্রেস-পতাকা টাঙ্গাইয়া দিত। জেলের বাহিরে বহুদূর হইতে ইহা দেখা যাইত! সেইজন্য এই গাছটি কাটিয়া ফেলি-বার হুকুম হইয়াছিল। প্রথমেই চার জন ওয়ার্ডার আসিয়া এই বেলগুলি ঘিরিয়া দাঁড়াইল—যাহাতে লাঠি চার্জের সময়ে, কয়েদীরা ঐগুলি ওয়ার্ডার-দের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করিতে পারে। মিলিটারীগুলি ওয়ার্ডটিকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার পর একদল ওয়ার্ডার তাহাদের সঙ্গে জনকয়েক "মেট" (convict overseer) এবং কয়েকজন জেলকর্মচারী ওয়ার্ডের ভিতরে ঢুকিল। তাহার পরই আরম্ভ হইল লাঠি চার্জ—সরকারী ভাষায় মৃদু লাঠি চার্জ। ইহাতে দোষী নির্দোষের বিচার নাই—যাহারা নির্বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশী প্রহার খায়। মারিবার সময় সিপাহীরা মুখ দিয়া কেমন যেন একটি শব্দ করিতেছে। "উধার যাও।" "উধার কই একঠো ভাগা।" "ইস বদমাসকো মারো।" ওয়ার্ডাররা চীৎকার করিতেছে। "মেট"দের উৎসাহের অন্ত নাই। অফিসাররা যেদিকে দাঁড়াইয়া আছে, সেইদিককার কয়েদীদের কিছুতেই নিস্তার নাই—কারণ ওয়ার্ডাররা, তাহাদের কর্মনৈপুণ্য উপরওয়ালার নিকট দেখাইতে ব্যগ্র। কতকগুলি লোক পড়িয়া গিয়াছে; মাথায় চোট লাগিবার পর বসিয়া পড়িল। দ্বারভাঙ্গার একজন নিরীহ রাজবন্দী জপ করিতেছিল। সেও নিস্তার পাইল না। উহারা আমাদের দিকে আসিতেছে। বেশ নার্ভাস

বোধ হইতেছে,—মার খাইব জানি ; প্রতিরোধ করিতে পারির না তাহাও জানি। কিরূপ আঘাত কপালে আছে তাহার কল্পনা করিতেছি ; একটি লাঠি আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া পড়িল। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন দুই হাত দিয়া মাথা ঢাকিয়াছিলাম জানি না। বুঝিলাম যখন হাতে চোট লাগিল ; লাঠির উপরের দিকে একটি লোহার আংটা লাগান আছে, তাহা দিয়া হাত কাটিয়া গেল। আরও দুই তিনটি লাঠি এই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। আমি বসিয়া পড়িয়াছি। নীলু আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। বলিতেছে, "আবার মাথা ঢাকো, মাথা ঢাকো।" নীলুর উপর কয়েক ঘা লাঠি পড়িল—আমার উপর আর একটি। নীলুর মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ওয়ার্ডারগণ অন্যদিকে চলিয়া গেল। একস্থানে তাহারা বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করিতে পারে না......সারা ওয়ার্ডে কেমন একটি থমথমে ভাব। কেহ কেহ শুইয়া পড়িয়া আছে। যে ভাগ্যবানেরা আহত হয় নাই তাহারা কেহ আহতদের জন্য জল আনিতেছে, কেহ অচৈতন্য সাথীর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেছে, কেহ বা খবরের কাগজ বা গামছা দিয়া নিস্পন্দ বন্ধুকে বাতাস দিতেছে। অপেক্ষাকৃত কম আঘাত যাহাদের লাগিয়াছে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রাথমিক চিকিৎসা করিতেছে ; জেল হাসপাতালের উপর নির্ভর করিলে হয়তো আজ আর হইয়া উঠিবে না। যাহাদের একেবারেই কোন প্রকারের আঘাত লাগে নাই, তাহারা আহতদের জেনারেল ইন্সপেক্শনে বাহির হইয়াছে—ঘোর কালবৈশাখীর পর যেমন লোক গ্রামের ক্ষতির পরিমাণ দেখিতে বাহির হয়।...তাহার পর আসিলেন ঔষধপত্র লইয়া জেলের ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার, সঙ্গে কয়েদীরা আনিয়াছে কয়েকটি স্ট্রেচার—যাহারা অধিক আহত তাহাদের হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য।...

"বোলোরে অস্পতাল"। হাসপাতালের পাহারার গলার স্বর এখান হইতে পরিষ্কার শোনা যায়। সে লোকটা কিছু কথা না বলিয়া বাজখাঁই স্বরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল।—বোধহয় ঝিমাইতেছিল;—হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছে। এই চীৎকারে বোধহয় হাসপাতালের কোন রোগীর ঘুম হইতেছে না। সেবাশুশ্রূষা করার

লোক নাই, তাহার উপর এইরূপ দিনের পর দিন নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহিত করা। এর আগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়ম করিয়াছিলেন যে, হাসপাতালের "পাহারা"র রাত্রে গুমটির ডাকের উত্তর দিবার দরকার নাই। "মেডিকাল গ্রাউণ্ডস্"-এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীদিগকে নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা দিতে পারেন। এই বিরাট পেষণযন্ত্রের ভিতর, এই মেডিকাল গ্রাউণ্ডস-এর রন্ধ্র পথেই কিছু আলোবাতাস ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। সহানুভূতিশীল কর্মচারীরা ইহারই অজুহাতে কয়েদীদিগকে কিছু সুখসুবিধা দেন। নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া পাহারার হাঁকের পুরাতন নিয়ম আবার প্রচলিত করিয়াছেন।···দরদ ও সেবার জন্য লালায়িত রুগ্ন কয়েদীরা কি রোগশয্যায় শুইয়া, তাহাদের স্ত্রীপুত্রপরিজনের কথা ভাবিতেছে না? রোগ হইলেই, জেলে বাড়ির কথা বেশী করিয়া মনে হয়। সাধারণ কয়েদীরা জেলের বাহিরে থাকিবার সময় হয়তো দুই বেলা খাইতেই পাইত না। জেলে আর কিছু না হউক অন্ততঃ দুই বেলা দুই মুঠা ভাত খাইতে পাওয়ার সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তাই নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়,—রোগ হইলে তাহারা নিজেদের একেবারে অসহায় মনে করে। এই রুগ্ন কয়েদীরা কি শত চিন্তার মধ্যেও আজ আমার কথা একবার না ভাবিয়া থাকিতে পারিবে? সহানুভূতিতে না হউক, আতঙ্কেও তাহারা আজ আমার ফাঁসির কথা নিশ্চয়ই ভাবিতেছে,—ঠিক আমার কথা নয়, একজন অপরিচিত ফাঁসির আসামীর কথা, যে এক নম্বর সেলে আছে।

হাসপাতালের দোতলার উপর একটি খোলা বারান্দায় টি. বি. রোগীরা থাকে। সেই স্থান হইতে ফাঁসির মঞ্চ পরিষ্কার দেখা যায়। আজ মঞ্চের চতুর্দিক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—শান্ত্রীরা মঞ্চটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে,—কী জানি আবার কেহ যদি টাকা পয়সা খরচ করিয়া, ওয়ার্ডারদের দিকে, মঞ্চের কলকব্জা কাজের অযোগ্য করিয়া রাখিয়া দেয়। ঐ টি. বি. রোগীরা এই দীপালি উৎসব দেখিতেছে, আর হয়তো তাহাদের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাহারা তিলে তিলে মরিতেছে। তথাপি ফাঁসির কয়েদীর অপেক্ষা তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। তাহাদের দীর্ঘনিশ্বাস ও অযাচিত করুণা মাথায় লইয়া

আমাকে যাইতে হইবে। আমার ফাঁসি তো তবু জেলের ভিতর একটি সাময়িক চাঞ্চল্য ও বিষাদ আনিবে। আর ইহাদের মৃত্যুর কথা তো কেহ জানিতে পারিবে না। নিকট আত্মীয়ের নিকট একখানি সার্ভিস পোস্ট-কার্ড পৌঁছাইবে—আর হাসপাতালের মৃত্যুর সংখ্যায় একটি বৃদ্ধি দেখানো হইবে। উহার মৃত্যুর রাত্রে, নাইট ডিউটির জেল-ডাক্তার হয়তো লেপের ভিতর হইতে বাহিরই হইবেন না। হাসপাতাল ওয়ার্ডের পাহারা কেবল রাত্রে হাঁক দিবার সময় 'জমা'র সংখ্যা হইতে হঠাৎ একটি কম সংখ্যা গণনা করিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। আর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুমটির ওয়ার্ডারকে রসিকতা করিয়া খবর দিবে "এক আসামী একদম রিহা।"[১]

রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ শুনা যাইতেছে। বারোটা কখন বাজিয়া গেল? এই ট্রেন ছাড়িল। স্টেশন অনেক দূরে, তবু যেন মনে হয় প্ল্যাটফর্মের কোলাহল কানে আসিতেছে।......

যাত্রীদের হুড়াহুড়ি, "কুলী! কুলী! ইধার!" সেই রাউতারা স্টেশনের স্টেশনমাস্টারের চীৎকার "ঘণ্টা! ঘণ্টা!" সিগনালার ঘণ্টা দেয়।...

রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ জেলের সীমিত জগতের সহিত উন্মুক্ত উদার পৃথিবীর সংযোগের সূত্র। এত প্রাণ উদাস করা, মন উতলা করা বাঁশির স্বর কোন বৈষ্ণব কবিও কোনদিন কল্পনা করিতে পারেন নাই। "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"—আজ আর ছন্দোবদ্ধ শব্দবিন্যাসমাত্র নয়। কোন্ অজ্ঞাত ইথারের কম্পন মনের অবরুদ্ধ তন্ত্রীকে এত তরঙ্গিত করে? চটকলের ভোরের ভেঁপু মজুর-বস্তিতে সাময়িক আলোড়ন জাগায় বটে, কিন্তু রেলের বাঁশি আনে প্রতিটি কয়েদীর হৃদয়ে দ্রুততর স্পন্দন, প্রাণে জাগায় কত সুপ্ত মধুর স্মৃতি, রূপ দেয় কত কায়াহীন আকুতি ও বাসনাকে। ......রেলগাড়ি চলার শব্দ শুনা যাইতেছে; দূরে, কতদূরে চলিয়া যাইতেছে—আঁধারে দুই পাশের কিছু দেখা যায় না,—কেবল অনুভব করা যায় বিশাল সীমাহীনতা;—কোন প্রাচীরের বাধা নাই।

বি. এন. ডবলু. আর বদলাইয়া বোধ হয় সব গাড়ির উপর লেখা হইয়াছে ও. টি. আর। বি. এন. ডবলু. নাম যে কোনদিন পরিবর্তিত হইতে পারে

১। "একজন কয়েদী একেবারে ছাড়া পাইয়া গিয়াছে।"

ইহা ভাবিতেই কেমন লাগে। পৃথিবীতে দিকে দিকে কত পরিবর্তন অহরহ ঘটিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও কত জিনিসের আমরা এক স্থির অপরিবর্তিত রূপ ব্যতীত কল্পনা করিতে পারি না। বাবার দাড়ি গোঁফ কামানো মুখের কথা আমি কখনও ভাবিতে পারি না। ভাবিলেই হাসি আসে। দূর! তাহাও কি হয় নাকি?···

কেবল রেলগাড়ির শব্দ নয়, বাহিরের যে-কোন আওয়াজ, জেল কোয়ার্টার্সের কুকুরের ডাকটি পর্যন্ত শুনিতে মিষ্ট লাগে।···সেদিন জেলের বাহিরের রাস্তা দিয়া একদল ছেলে "হিপ্, হিপ্, হুর্‌রে" চীৎকার করিয়া চলিয়া গেল। বোধ হয় কোন ম্যাচ খেলিয়া ফিরিতেছিল। কত পুরান স্মৃতির সহিত ঐ ধ্বনির সম্বন্ধ;—ছোট ছেলেমেয়ে কত দিন দেখি নাই,—হাফপ্যাণ্ট-পরিহিত নয়-দশ বছরের ক্যাপ্টেন নীলু একটি চীনামাটির কাপ-সসার লইয়া, গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে, হিপ্, হিপ্, হুররে! গরমে পরিশ্রমে, চীৎকারে মুখ লোহিতাভ।···

বেলা তিনটায় আর রাত্রি সাড়ে বারোটায় বাজে রেলগাড়ির বাঁশি। সকাল পাঁচটায় আর বিকাল সাড়ে ছয়টায় বাজে স্টীমারের ভেঁপু;—আমার ঘড়ি,—সেলের সম্মুখের ছায়া অপেক্ষাও অনেক নিশ্চিত—আমার কল্পনা-বিলাসের সাথী। যখন-তখন এরোপ্লেনের শব্দ শুনি। রাত্রে তো প্রতি দুই ঘণ্টায় একখানি করিয়া যায়—বোধ হয় ডাক লইয়া যায় আসাম ফ্রণ্টে; কিন্তু সে শব্দ মনে কোন স্মৃতির সুবাস জাগায় না। হয়তো মুহূর্তের কৌতূহল —প্রত্যহ কোথায় যায়, রাত্রে পথ কেমন করিয়া ঠিক করে, কম্পাস ম্যাপ রেল-লাইন গঙ্গা,—এর বেশী নয়। দিনের বেলায় যেদিন অনেকগুলি এরোপ্লেন একসঙ্গে যায়—আমি সেলের মধ্য হইতে শুনি যে, নয় ও দশ নম্বরের বোমার বাবু দুইটি আমাকে খবর দিবার জন্য চীৎকার করিয়া গুণিতেছে— এক, দুই, তিন, চার। কিন্তু কী জানি কেন, এরোপ্লেনের শব্দ আমার মনে কোন সাড়া জাগায় না। আমার পরিচিত জগতের মধ্যে ইহাদের স্থান নাই; কারণ মাটির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ গৌণ। এই জন্যই বোধ হয়, কাক, শালিক, চড়ুই প্রভৃতি যে পাখিগুলি জেলের ভিতর দেখিতে পাই, সেগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাত্র, মনকে উদ্বেলিত করিতে পারে না। এগুলি

একঘেয়েমির জীবনে পরিবর্তন আনিবার কাজ করিতে পারে, কিন্তু তার বেশী নয়। বিরহী যক্ষের মেঘদূত, বিরহিণী রাধার হংসদূত কেবল কবির কল্পনা-বিলাস ; বাস্তব মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার ছাপ উহাতে নাই।

সিপাহীজা বসিয়া ঢুলিতেছে। অতি-পরিচিত বিড়ালটি ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতেছে। বিড়ালটি থমকাইয়া দাঁড়াইল,—বোধহয় আমি দরজার উপর বসিয়া আছি বলিয়া আসিতে সাহস পাইতেছে না। প্রত্যহ দিনে ও রাত্রে আসে থালা চাটিবার জন্যে ; সপ্তাহে একদিন একটু-আধটু দই পায়, অন্যদিন কী খাইতে আসে ? জেলে থাকিয়া অল্প অল্প নিরামিষও খাইতে শিখিয়াছে। আশ্রমে সহদেও-এর যে কুকুরটি ছিল, সেটিও দেখিতাম নিরামিষই পছন্দ করিত। এখন কুকুরটি কোথায় আছে ? সহদেও-এর দাদা বোধ হয় উহাকে বাড়ি লইয়া গিয়াছে। লণ্ঠনের আলোতে বিড়ালটির গায়ের রঙ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। বাঘের মতো হলদে, কালো ও ধূসর ডোরা কাটা। বেশ দেখিতে বিড়ালটি। সেদিন জেলরসাহেব যখন আসিয়াছিলেন তখন ওটি ওখানেই বসিয়া ছিল। জেলরসাহেব রসিকতা করিলেন—"কী, বিড়ালটির সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছেন নাকি ? কী নাম দিয়াছেন ?" আমি জবাব দিই—"না এমনি এসেছে।" "তাহলে এর নাম দিন 'তোজো'।" তাহার পর নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠেন। জেলরসাহেবের দাঁতগুলি মুক্তার মতো সাদা—টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের দাঁতের মতো।......

আমি উঠিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম, বিড়ালটিকে পথ দিবার জন্য। বিড়ালটি একবার ডাকিল—এখনও আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ভাতের থালা হইতে একটু তরকারি উঠাইয়া লইলাম—ধোঁদলের তরকারি। বিড়ালে ধোঁদল খায় নাকি ? এক টুকরা ছুড়িয়া বিড়ালকে লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। বিড়ালটি "মেও" করিয়া পালাইল। ধোঁদলের টুকরাটি কিন্তু গরাদে লাগিয়া গিয়াছে, দরজার বাহিরে যায় নাই।...

আমি আর নীলু কমলালেবু খাইতেছি—আশ্রমে মা'র ঘরে তক্তাপোশের উপর বসিয়া। দুই জনের ভিতর প্রতিযোগিতা চলিতেছে, কমলালেবুর ছিবড়া জানালার গরাদের ভিতর দিয়া বাহিরে ফেলিতে হইবে, গরাদে

যেন না লাগে। কিন্তু কী আশ্চর্য! অধিকাংশই গরাদে লাগিয়া যাইতেছে। কয়টাই বা গরাদের লোহা, আর কতটুকু জায়গাই বা উহা ঢাকিয়া আছে; কিন্তু তথাপি ছিবড়ার অধিকাংশ উহাতেই লাগিবে!...

...ঘুরিয়া ফিরিয়া কেন নীলুর কথাই বার বার মনে পড়ে? যে জিনিস ভুলিতে চাহিতেছি তাহারই জন্য নয় তো? জ্ঞানতঃ যে কথা আজ কতদিন হইতে মনে মনে বলিতেছি, এ কথা কি আমার অজ্ঞাতমন কিছুতেই লইতে পারিতেছে না? সত্যই, আমি জানি যে নীলু আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া নিজের কর্তব্য করিয়াছে। কোন আত্মসম্মানশীল, সত্যনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীর ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ইহা হইল যুক্তির কথা। সুপ্ত চেতনা হয়তো ভাবে যে এ যুক্তি কোর্টে চলিতে পারে, বই-এ ছাপার কালিতে ইহা দেখিতে ভালো, কিন্তু অন্যত্র ইহার স্থান নাই। তাহা না হইলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীলুর কথাই মনে হইবে কেন? নিজের পার্টির প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য, সহোদর ভাইয়ের ফাঁসির পথ সুগম করিয়া দেওয়া হৃদয়ের সততার প্রমাণ, না রুগ্ন মনের শুচিবাইয়ের পরিচয়? বোধ হয় নীলুর ব্যবহার আমার ভিতরের আসল আমি, কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছি না; তাই উপরের আমি পুরাতন স্মৃতির মধু দিয়া সেই দহনের জ্বালা স্নিগ্ধ করিতেছি।

আবার আসিয়া দরজার সম্মুখে বসি; এবার বাঁ দিকে ভর দিয়া—বাম হাত দিয়া গরাদ ধরিয়া। ডান দিকে ভর দিয়া, ডান হাত দিয়া গরাদ ধরিয়া বসা যেরূপ স্বাভাবিক ও স্বস্তিকর মনে হয়, বাঁদিকে ভর দিয়া বসিলে সেরূপ মনে হয় না। ঠিক নীচু জায়গাটির উপর বসিয়াছি। খুব বড় বুড়ো হাতির ঘাড়ের উপর, ঠিক মাহুতের পিছনে বসিয়াছি মনে হইতেছে। এমন সব উদ্ভট কল্পনা মাথায় আসে! উদ্ভট আবার কিসে হইল?

...সেই কারহাগোলার ধনী গৃহস্থ ধনপৎ যাদবের গ্রামে গিয়াছিলাম। পুলিশের ধারণা তাহার ডাকাতের দল আছে, তাহার উপর বি. এল. কেস চলিবে। তখন কংগ্রেস মিনিস্ট্রীর সময়। সে আমাদের লইয়া গিয়াছে নিজের গ্রামে, মিটিং করিবার জন্য। উদ্দেশ্য দারোগাকে ভয় দেখানো;—দারোগা যাহাতে ভাবে যে সে কংগ্রেসের লোক। খুব ঘটা করিয়া মিটিং

হইল। সে খাওয়া-দাওয়ার পর বলিল, চলুন শিকারের আয়োজন করিয়াছি। বাবলা ও ক্যায়া-গোলাপের জঙ্গলের দিকে হাতির পিঠে চলিয়াছি। আমি ঠিক মাহুতের পিছনে; বুড়ো হাতি—ঘাড়ের কাছটি একটি বেশ বড় গর্তের মতো হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বেশ আরাম করিয়া পদ্মাসনে বসিয়াছি। জঙ্গল আরম্ভ হইল। সেখান হইতে কিছুদূর আগে গিয়াছি। সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড অশ্বথ গাছ। হঠাৎ হাতিটির অশ্বথ পাতা খাইবার খেয়াল হইল। শুড়টি তুলিয়া একটি ছোট শাখা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল। নিমেষে কী যেন হইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল যেন আমাকে জাঁতার মধ্যে ফেলিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। যে গহ্বরের মধ্যে বসিয়াছিলাম হাতিটি মাথা উঁচু করায়, তাহা সঙ্কুচিত হইয়া আমার নিম্নাঙ্গ চাপিয়া ধরিয়াছে। আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মাহুত বুঝিতে পারিয়া হাতির শুঁড়টি নামাইয়া দিল। আমি নামিয়া পড়িলাম—পায়ের দিকটা অবশের মতো হইয়া গিয়াছে।···

আমার সেলের ওয়ার্ডার দেওয়ালে হেলান দিয়া ঘুমাইতেছে। পাগড়িটি খুলিয়া পাশে রাখিয়াছে। তিন নম্বর সেলের ওয়ার্ডারও বোধহয় ঘুমাইতেছে। আর বাহিরে এই ওয়ার্ডের ওয়ার্ডারের পদশব্দ শোনা যাইতেছে। সব সেলগুলি শান্ত। সকলেই বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাগলটিও কি আজ ঘুমাইয়া পড়িল? বোমার বাবুরা বোধহয় আলো জ্বালিয়া পড়িতেছে। ঝিঁঝির ডাক শুনা যাইতেছে। কিন্তু আশ্রমের ঝিঁঝির ডাকের মতো ঐকতান অত সজীব নয়। শীতের রাত্রে ছোটবেলায় ঘুম ভাঙ্গিলে, ঝিঁঝির ডাক যে রহস্যের রংমহল খুলিয়া দিত, এ ডাক সেরূপ প্রাণবন্ত নয়। নীলু বলিত যে, উহা এক রকম পিঁপড়ার ডাক। কে উহার সহিত তর্ক করিবে? জেলের আবহাওয়ার সহিত ঝিঁঝির ডাক যেন খাপ খায় না। রুটিন, সংখ্যা-গণনা, শৃঙ্খল, প্রাচীর, নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এই বিলাসের স্থান কোথায়? কিন্তু দেওয়াল আর গরাদ দিয়া কি সব জিনিস আটকানো যায়?······

হুড়মুড় করিয়া নূতন দলের ওয়ার্ডারগণ ঢুকিল। তাহা হইলে একটা বাজিল। নিশ্চয়ই উহারা তিনজন—একজন আমার সেলের, একজন তিন নম্বর সেলের, আর একজন এই ওয়ার্ডের। একজন আমার সেলের আঙ্গিনায়

ঢুকিল। সে নিদ্রিত ওয়ার্ডারের পাগড়িটি উঠাইয়া আস্তে আস্তে বাহিরে রাখিয়া আসিল। তাহার পর ওয়ার্ডার ডাকিল, "এ হায়দার, আজ কি এখানেই ঘুমাইবে নাকি?" সে ধড়মড় করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছে,—জেলর-সাহেব আসেন নাই তো! নাঃ! কে কিস্নুনচন্দ? নয়া দফা আসিয়া গিয়াছে? এ ভাই, দিল্লগী করিও না। পাগড়িটি কোথায় রাখিয়াছ বলো। নূতন সিপাহী বলে, আমি কী জানি? বা রে বা! আমি তো এই আসিতেছি। হায়দার প্রথমে বিশ্বাস করে না—পরে আতঙ্কে তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যায়। সে সবে নূতন চাকরিতে পাকা হইয়াছে। চাকরিতে ঢুকিয়াই গল্প শুনিয়াছে, জেলরসাহেব রাউণ্ডে আসিয়া নিদ্রিত সিপাহী দেখিলে—তাহাকে তখন কিছু বলেন না—কেবল তাহার পাগড়িটি সরাইয়া রাখেন, পরে তাহার জরিমানা হয়। এই তো গত সপ্তাহে হরেকিষুন ওয়ার্ডারের 'তকৃদীরে'[১] এরূপ ঘটিলে, সে 'কাপড়া গুদামের' ইনচার্জ কয়েদী বির্জবিলাসকে দেড় টাকা ঘুষ দিয়া একটি পাগড়ি যোগাড় করিয়াছিল। জেলরসাহেব পরের দিন প্যারেডের সময় তাহার পাগড়ি দেখিয়া, এ পাগড়ি কোথায় পাইয়াছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে হরেকিষুন "সাফ ইন্‌কার গিয়া"[২]। তাহার পর সে জেলরসাহেবের জেরায় সব কথা বলিয়া দেয়। মাঝের থেকে সে নিজে একা গেল না; বির্জবিলাসকেও সঙ্গে সঙ্গে "লিয়ে দিয়ে সাফ"[৩]। কিস্নুনচন্দ মুখভঙ্গীর সহিত একটি তুড়ি দিয়া তাহার গল্প শেষ করিল। হায়দার এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে। সে খোশা-মোদ করিয়া পাগড়িটি ফেরত চায়। ঘরমুখো অপর দুইটি ওয়ার্ডারও, আমার সেলের সম্মুখে আসিয়া জড়ো হয়। হায়দার পাগড়ি ফেরত পাইল, সকলে মিলিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিল,—কাল দুপুরে হায়দারের আপার ডিভিসন রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে ডিউটি থাকিবে; সেখান হইতে এক গ্লাস দুধ কাল সে কিস্নুনচন্দকে খাওয়াইবে। হাসিতে হাসিতে সকলে বাহির হইয়া যায়।

ইহাদের এই কর্মক্লান্ত জীবনের মধ্যেও সুখ আছে,—নিশ্চিত বেতন, স্ত্রী-পুত্র পরিবার।······

১। ভাগ্য। ২। সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ৩। চাকরিসুদ্ধ বিসর্জন।

···টুর হইতে ফিরিয়াছি। সরস্বতীর সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া, হাসি হাসি মুখ—সলজ্জ উৎকণ্ঠার সহিত বলে, "বোসো, একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ একটু চা করে নিয়ে আসি।" আমি উত্তর দিই না। হাসিতে হাসিতে তাহার পিছনে পিছনে গিয়া রান্নাঘরে পিঁড়ি পাতিয়া বসি। ভিজা কাঠে ফুঁ দিয়া আগুন ধরাইবার চেষ্টায় আরক্তিম ও ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডল একরাশ অসম্বৃত চুলে ঢাকিয়া গিয়াছে।—হইতে পারিত···

কিন্তু আমার জীবন কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শে গড়িয়া তোলা; আর যদি আমার মনের বাসনা অন্যরূপও হইত, তাহা হইলেই কি উপায় ছিল। চিরকাল পাড়া-প্রতিবেশী সকলের মুখে শুনিয়াছি, 'বিলুর মতো ছেলে দেখা যায় না।' আর এই প্রশংসা বজায় রাখিবার আকাঙ্ক্ষা, নিবৃত্তির পথ হইতে আমাকে কখনই বিচ্যুত হইতে দেয় নাই। মনের কত দুর্নিবার বাসনাকে কশাঘাতে সংযত করিয়াছি। কিন্তু আমার ভাবধারার sublimation হইয়া কি আমি কোন উচ্চতর স্তরে পৌছিয়াছি? না, তাহা হইলে আজ মনে এ সংশয় জাগিবে কেন? কত প্রকারের ভোগের আকাঙ্ক্ষা কেন মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারিবে?···কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না। ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। কেবল ফুটবল ম্যাচের টিকিট-ক্রয়ার্থীদের ন্যায় দেশসেবকদের অন্তহীন বিসর্পিল লাইনে নিজের স্থান করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম মাত্র। আমার কথা আমার প্রতিবেশীরাও বোধ হয় আগামী সপ্তাহে ভুলিয়া যাইবে—এখনই মনে আছে কিনা কে জানে। তবে এতদিন কী কারলাম? আমি তো অতিমানব নই; অতিসাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ—মানুষের সকল দোষ ভ্রান্তি দুর্বলতা আমার মধ্যে। কীট্‌স্ পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন—শেলী ত্রিশ বৎসর। পিট্ তেইশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর আমি তেত্রিশ বৎসর বয়সে কুকুর বিড়ালের মতো মরিব। কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না, কেহ দু-ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ফেলিবে না। যাহা কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এ নিষ্ফল প্রয়াসের কোনই মূল্য নাই। কবি যতই ছন্দ গাঁথুন যে, কিছুই পৃথিবীতে ব্যর্থ হয় না,—যে নদী মরুপথে ধারা হারায়

সেও সার্থক—এ সকল কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। যে কবির ব্যর্থতার অনুভব নাই, ইহা তাঁহারই ভাব-বিলাস।

না, হয়তো ইহা সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। আমার ন্যায় দুই-চারিটি জীবনের মূল্য কী? যাহা দেখিয়াছি—জনশক্তির প্রকৃত স্বরূপ—গত আগস্ট মাসে যাহা দেখিয়াছি—যুগ যুগ সঞ্চিত জগদ্দল পাথরের নীচে যে সুপ্ত শক্তির সন্ধান পাইয়াছি—তাহা সচেতন হইলে কি যে করিতে পারে, তাহার পূর্বস্বাদ লোককে বুঝাইতে আমার দান নগণ্য নয়। রাজনৈতিক কর্মীর পথ বড় কঠিন, বড় বন্ধুর। "তখৎ ইহা তখ্‌তা" (সিংহাসন অথবা ফাঁসির মঞ্চ)—আশা রাখিবে ফাঁসির রজ্জুর, হয়তো গৌরবের রাজমুকুট পাইতে পারো। অপার ক্লেশের জীবন। দিন দিন তিলে তিলে নিজের জীবনীশক্তি, উৎসাহ ক্ষয় হইয়া যাইতে দেখিবে। নিজের মনের তৃপ্তি ছাড়া, আর কিছুর আশা রাখিলে নিরাশ হইতে হইবে। পুঞ্জীভূত তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতার ভারে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবে। একপদ অগ্রসর হইতে যাও—কতশত,—লোকের স্বার্থে আঘাত লাগিবে—প্রত্যেকে হইয়া দাঁড়াইবে তোমার শত্রু। একজন লোকের সম্মান আকর্ষণ করিতে পারো, কিন্তু পদে পদে অনুভব করিবে যে তুমি দশজন লোকের উপেক্ষা ও উপহাসের পাত্র। এ জীবন হইতে জেলে আসিতে পারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা —মৃত্যুদণ্ডও শাপে বর। কত লোক তো যুদ্ধে মরিতেছে, বিনা অপরাধে। কেন, তাহা তাহারা বোঝে না। কত লোক অনাহারে মরিতেছে, বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে। অপরাধ—যে জন্মের উপর তাহার কোন হাত ছিল না, তাহারই অমোঘ নির্দেশ। পথে গাড়ি চাপা পড়িয়া মরার মতো, মাঠে সাপে কামড়াইয়া মরার মতো রাজনীতি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডও একটি সামান্য আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। তাহার বেশী কিছু নয়। দলের বাহিরে পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষ। কত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহিত সংঘর্ষ! তাহার জন্য তো সকল রাজনৈতিক কর্মী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ভিতরে?—ভিতরের সংঘর্ষ, আরও ভয়ানক। উপদলে উপদলে সংঘর্ষ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, প্রদেশে প্রদেশে সংঘর্ষ;—প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এ সবই রাজনীতি খেলার নিয়মের মধ্যে,—নিষ্ঠুর

নিষ্করুণ নিয়ম ; দুর্বলের স্থান এখানে নাই। সবাই আগে চলিয়াছে ; পিছনের লোক পড়িল কি মরিল, তাহা ফিরিয়া দেখিবার দরকার নাই।……

"বাবু, খুব মশা কামড়াইতেছে নাকি?" ওয়ার্ডার জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ ; কেন?"

"একটু মিট্টিকা তেল (কেরাসিন তেল) 'বদনমে' (শরীরে) লাগাইয়া লউন না কেন? সরিষার তেল এখন তো পাওয়া যাইবে না—না হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।"

"আচ্ছা দাও।"

আর ভাবি যে সরিষার তেল না পাওয়া যাওয়াই ভালো। সেদিন সরিষার তেল লাগাইয়া শুইয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি অসংখ্য পিঁপড়াতে সর্বশরীর ভরিয়া গিয়াছে। ছোট লাল পিঁপড়াগুলি বোধহয় তেল খাইতে ভালোবাসে। ওয়ার্ডার লণ্ঠনের কাগজের ছিপিটি খুলিয়া, তাহারই খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া লম্বা করিয়া পাকায়। আর তাহা ডুবাইয়া ডুবাইয়া আমার হাতে দুই এক ফোঁটা করিয়া কেরোসিন তেল দেয়। আমি তাহা সর্বাঙ্গে বেশ করিয়া মাখি। কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে—অডিকোলনের মতো…ডিগবয়ে কি মশা নাই?

করিয়াছিল বটে মেজর গোমেস পাটনা ক্যাম্প জেলে। কেরোসিন তেল দিয়া কি একটা ইমাল্‌সন তৈয়ারী করাইয়াছিল। অত বড় জেলে একটিও মশা ছিল না। সাহেব খামখেয়ালী হইলে কি হয়, ছিল কাজের লোক। পাগলাটে গোছের,—কালো লম্বা—বলিত, আমি ইণ্ডিয়ান। একদিন গয়ার একটি রাজবন্দীকে বলিয়াছিল, "জোয়ান, তুম ভি শালা, হম ভি শালা ; মৈ সব শালাসে মাফী মাঙ্গতা হুঁ।"[1] সকলকে 'জোয়ান' বলিত…

……"হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো।"……বড় বড় গাছের গুঁড়ি গড়াইয়া আনিয়া রাস্তায় স্তূপীকৃত করিতেছে, কবৈয়া গ্রামের শতাধিক লোক। হাস্যকৌতুকের মধ্যে ধামদাহা পূর্ণিয়া রোডের উপর গাছের গুঁড়ির একটি 'ব্যারিকেড' গড়িয়া উঠিল। অদম্য উৎসাহ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। যে গরীব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই, তাহাদের আজ হইল কী? প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু

---

[1] "জোয়ান, তুমিও শালা, আমিও শালা ; আমি সব শালার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি।"

বলিবার আছে। এ কয়দিন সকলেরই কিছু কিছু গল্প জমিয়াছে। অভাব শ্রোতার। বীরগাঁও থানায় গুলি চলিয়াছে, সাতচল্লিশ জন মরিয়াছে, 'ঘায়েলের'[১] তো অন্ত নাই। দারোগাসাহেবের স্ত্রী বলিয়াছেন যে দারোগা সাহেব যদি চাকরিতে ইস্তফা না দেন, তাহা হইলে আর তিনি উঁহাকে রাঁধিয়া দিবেন না। গ্রাম্য পঞ্চায়েত হরখু হাজামকে জরিমানা করিয়াছে, সে নায়েববাবুর 'হজামৎ'[২] করিয়াছিল—হরখু সকলের সম্মুখে 'কসুর'[৩] স্বীকার করিয়াছে—সে বলে, "নায়েববাবুকে গান্ধী টুপি পরিতে দেখিয়া আমি ভাবিলাম 'মহাত্মাজীমে'[৪] নাম লিখাইয়াছেন—আমাকে যাহা ইচ্ছা সাজা দাও; কেবল আঙ্গুলটি কাটিয়া লইও না।" 'টমি আওর পল্টন সব' কুশী নদীর মধ্যেখানে স্টীমারে রহিয়াছে—ডাঙ্গার উপর রাত্রি কাটাইবার সাহস নাই। আরও কত রকমের গল্প।......

কাঠের গুঁড়ির স্তূপ অনেক উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—আর মিলিটারী লরি আসিতে পারিবে না। এতক্ষণ মনে পড়ে নাই—রহুয়ার কাছে রাস্তার ধারে বড় বড় বটগাছ। 'চলো-ও!' 'চলো-ও'। কুড়ুল, কোদাল, দা, কাটারি যে যাহা পাইয়াছে হাতে লইয়াছে। কুইক মার্চ নয়, বেশ দ্রুত দৌড়! পরিশ্রান্ত হইলেও থামিবার উপায় নাই।—হরেশ্বরের হাতে ছোট একটি কংগ্রেস পতাকা। সে সবে মাত্র মাস কয়েক আগে কংগ্রেস সেবাদলের ট্রেণিং পাইয়াছে—জেলা-কংগ্রেস কমিটি গ্রাম্যরক্ষীদলের জন্য একটা ট্রেণিং ক্যাম্প খুলিয়াছিল, তাহাতে। গ্রামে তাহার এখন কদর কত! কিছুদিন হইতে সে গ্রামে দেখাইতেছিল তাহার নূতন-শেখা যুযুৎসুর প্যাঁচ, লাঠির পাঁয়তারা, আর সাইকেল চড়া। সে গান আরম্ভ করিয়াছে—"নৌ-জোয়ান নিকলে···।" হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাল-বৃদ্ধ সকলে উহা বলিবার চেষ্টা করিতেছে।

রহুয়া। রহুয়াগ্রামের লোকেরাও আসিয়া জুটিল। দুই ঘণ্টায় রহুয়ার পর্ব শেষ। আবার 'চলো-ও! চলো-ও'! কৃত্যানন্দনগর- রেল-স্টেশনের দিকে। রাস্তা বন্ধ করায় কোন উদ্দীপনা নাই। থানা জ্বালাইবার পর এসব কাজ নেহাত পানসে লাগিতেছে। এবার কবৈয়া রহুয়ার সমবেত দল—

১। আহত। ২। ক্ষৌরকার্য। ৩। দোষ।
৪। স্থানীয় অশিক্ষিত লোকেরা কংগ্রেসে কাজ করাকে বলে "মহাত্মাজীমে" নাম লিখানা।

ভূতাবিষ্ট ও নেশাগ্রস্তের মতো। আমাকে সাইকেল হইতে নামিতে দিবে না। সকলে মিলিয়া সাইকেল ঠেলিয়া লইয়া যাইবে। অত লোকের মধ্যে কি সাইকেলে বসিয়া যাওয়া যায়? কে কাহার কথা শুনে। "গান্ধীজিকা জয়!" সম্মুখে কাদা। "কুচ পরোয়া নহী হৈ।" "ভারতমাতা কী জয়!" উহার ভিতর দিয়াই সাইকেল চলিবে। "বোম্বাইসে আয়া তাজা খবর!" কত নূতন খবর। রহুয়ার একটি ছাত্র পকেট হইতে একটি লিথো-করা কাগজ বাহির করিয়া আবৃত্তির ভঙ্গীতে পড়ে। কাগজখানির উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা "দেশ কী পুকার" (দেশের আহ্বান)। "জিন্না সাহেব গিরফতার হো গয়ে। ভিজায়লক্সমী পণ্ডিত পর গোলী চালায়ী গয়ী। মুঙ্গের জিলা মে স্বরাজ হো গয়া।" আরও অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। আজ আর সম্ভব অসম্ভব বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। থাকিবেই বা কেমন করিয়া? গত কয়েক দিনে তাহারা কত অসম্ভব জিনিসকেই সম্ভব হইতে দেখিয়াছে। কোন কথাই মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে তাহারা ভরসা পায় না।...সদর কলেক্টরী যেদিন দখল করা হইবে সেদিন রহুয়া কবৈয়ার সম্মিলিত "জথা"[১] কে নেতৃত্ব করিবে, তাহা লইয়া বেশ বচসা জমিয়া উঠিয়াছে :—কবৈয়ার হরেশ্বর না রহুয়ার তিলকধারী সিং? হরেশ্বর সেবাদল ট্রেণিং পাইলে কি হয়, এখনও ভাল করিয়া 'মোচ'ও উঠে নাই। কবৈয়ার লোকেরা বলে, ও তো "বুৎরু"[২]। আর তিলকধারী—সে তো "বত্তিস-মে হো আয়া হ্যয়"—অর্থাৎ ১৯৩২ সালে জেলে গিয়াছিল। এই বুঝি আমাকে সালিশ মানে।...

রহুয়া গ্রামের ভিতর রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে এক বৃদ্ধা, আর কতকগুলি অর্ধোলঙ্গ বালকবালিকা। শুনিলাম বাদর বাহরগামিয়ার মা। জাতে মুচি। গ্রামের ভিতর থাকিবার প্রথা নাই—সেইজন্যই তাহাদের বলে "বাহরগামিয়া"। একটি ছেলের হাতে গাঁদাফুলের মালা। বাদরের মা আর সব ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বলিয়া উঠে "পরণাম"। বোধহয় পূর্ব হইতেই শিখানো। বৃদ্ধা সঙ্কুচিতভাবে আমাকে বলে, "আপনাকে তো 'খাতিরদারী'[৩] কিছু করিতে পারিলাম না। আর করিতামই বা কী?

১। দল। ২। শিশু। ৩। সম্মান।

আপনার 'মঞ্জুরী রহট' (মঞ্জুর করা কূয়া) ছিল বলিয়া সুখে দিন কাটিয়া যাইতেছে। দুই বৎসর হইতে কিছু কিছু বালি জমিতেছে।" বৃদ্ধা দেখিলাম খুব কথা বলিতে ভালোবাসে। মনে পড়িল 'আর্থকোয়েক রিলীফ'-এর কূয়াটির কথা। কংগ্রেস ভলান্টিয়ার বিরিঞ্চি, মকস্থদন সিংএর নিকট হইতে পাঁচ টাকা ঘুস লইয়া, তাহার 'কামতে' [১] কূপটি তৈয়ারী করাইয়া দিবার কথা দেয়। আমি ইন্‌স্‌পেকশনে আসিয়া কূয়াটি বাদর বাহরগামিয়ার কুটিরের নিকট ধামদাহ-পূর্ণিয়া রোডের ধারে তৈয়ারী করাইয়া দিই।

বলি—"এক লোটা পানি পিলাও মাই,—একদম ঠণ্ডাহ।" দেখি তোমার কূয়োর জল কেমন।

বৃদ্ধা যেন এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধে কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মুখে সম্মান অপেক্ষা ভীতির চিহ্নই অধিক পরিস্ফুট। জনতার মধ্যে তাহার গ্রামের যে সকল লোক আছে, তাহাদের মুখের দিকে প্রশ্নের ভঙ্গীতে তাকায়। এই কূয়ার জল মাস্টারবাবুর বেটা খাইবে নাকি? গ্রামের আর কেহ তো ইহার জল ব্যবহার করে না। বলে কি! সে জল আনিয়া দিবে! তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিলকধারী সিং তাহাকে সাহস দিয়া বলে, "লোটা মাজিয়া জল ভরিয়া আন; বিলুবাবু বলিতেছেন।" লোটায় করিয়া জল আসে। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী বাদরের স্ত্রী সঙ্গে দিয়াছে শালপাতায় মোড়া, ধূলাভরা, বহুদিন সঞ্চিত খানিকটা গুড়। সলজ্জ বালকবালিকাদিগের মৌখিক আপত্তি ঠেলিয়া, তাহাদের হাতে একটু একটু গুড় দিই। নিজেও গুড় ও জল খাই। বাদরের মা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। চোখের চাহনি, ঠিক খাইতে বসিবার সময় মা পাখা হাতে করিয়া বসিলে যেমন লাগে, তেমনি। আমাকে খাওয়াইবার সময় সকলেরই চোখে একই ভাব ফুটিয়া ওঠে, মা'র, জ্যাঠাইমার, ন'দির, সহদেওএর মা'র, দুবেজীর স্ত্রীর, সরস্বতীর। ধ্বনি উঠে, "বোলো গান্ধীজিকা জয়!" হরেশ্বর বলে, "বাদরমাই, আমাকেও জল খাওয়াও।" বালতিতে করিয়া জল আসে। সকলে কড়াকাড়ি করিয়া, বাহরগামিয়ার ছোঁয়া জল খাইতেছে। গ্রামের উপর, সমাজের চোখের উপর এই অনাসৃষ্টি

১। যে জমি গৃহস্থ বা জমিদার নিজে আবাদ করে।

…ও করিবার সাহস আজ ইহারা হঠাৎ পাইল কোথা হইতে? সকলের মুখে চোখে একটা বাহাদুরি দেখানোর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। "গান্ধীজিকা জয়! জয়, মহাৎমাজীকা জয়!" অবিরাম জয়ধ্বনির মধ্যেও সকলেই তাহাদের মনের উদারতা আমাকে দেখাইতে সচেষ্ট। আর এখানে দাঁড়াইবার কি সময় আছে? "নওজোয়ান নিকলে···।" বৃদ্ধার চোখের কোণ যেন একটু চিকচিক করিতেছে—কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে। ইহাই তাহার দেওয়া গ্রামবাসীদের উদারতার মূল্য। মহাত্মাজী তাহার "গোঁসাই" (গৃহদেবতা) অপেক্ষা জাগ্রত দেবতা। সেই কথাই সে ভাবিতেছে। এই রাস্তা দিয়াই তো ভূমিকম্পের পর মহাৎমাজী হাওয়াগাড়িতে ধামদাহার দিকে গিয়াছিলেন। হাওয়াগাড়িতে অত লোকের মধ্যে সে মহাৎমাজীকে চিনিতেও পারে নাই। কেবল মাস্টারসাহেবকে চিনিতে পারিয়াছিল। বাদর বলে, মহাৎমাজীর 'বদনসে জিয়োতী' বাহির হইতেছিল।[১] সে গান্ধীজির উদ্দেশ্যে প্রণাম করে······

জনতা চলিয়াছে। আগে চলিয়াছে, পিছনে ফিরিয়া তাকাইবে কেন? কত বাদরের মা কত স্থানে ঐরূপ প্রমাণ করিতেছে। ইহাদের দেখিবার সময় কোথায়! ইহাদের হাতে এখন কত কাজ। মাথায় কত বড় দায়িত্ব! "জয় বিলুবাবুকা জয়!" একদল বলিতেছে, "বোম্বাইসে আই আওয়াজ;" আর একদল বলিয়া দিতেছে, সে 'আওয়াজটি' কী। উহার সহিত সুর মিলাইয়া বলিতেছে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ!" কবৈয়ার উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের 'গুরু'টি[২] জয়ধ্বনি দিবার সময় নাচিতেছে—যেন নগর সংকীর্তন হইতেছে। তাহার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হাঁপানি রোগী কাশিবার চেষ্টা করিবার সময় যেরূপ শব্দ হয়, জয়ধ্বনি দিবার সময় সেইরূপ একটি শব্দ হইতেছে মাত্র; কিন্তু না আছে তাহার উৎসাহের অন্ত, না আছে তাহার নিজের ছাত্রদিগের সম্মুখে আত্মসম্মান বজায় রাখিবার প্রয়াস।···একজন লোক ঘোড়ায় চড়িয়া কৃত্যানন্দনগরের দিক হইতে আসিতেছে। আমাদের দেখিয়া নামিয়া পড়িল। "প্রণাম"। সে আমাকে খবর দেয় যে আপনার ভাইসাহেব তো

১। শরীর হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছে।
২। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক।

কৃত্যানন্দনগরে আসিয়াছেন—হরখচন্দ মারোয়ারীর গোলায়! কেরোসিন তেলের দাম তদারক করিতে। লোকটি আমাকে আর কিছু বলে না, কিন্তু পাশের দুই একজন লোককে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি যেন বলিতেছে। জনতা যেন কথা প্রকাশ করিতে চাহে না। বুঝিলাম নীলু—'পিপ্‌লস্ প্রাইস কণ্ট্রোল' কমিটির সেক্রেটারী—আসিয়াছে কেরোসিন তেলের স্টক কিংবা অন্য কিছুর তদারক করিতে। আর সে বোধ হয় কৃত্যানন্দনগরের লোকদের রেললাইন উঠানো, রাস্তা বন্ধ করা, আর টেলিগ্রাফের তার কাটার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছে। জনপ্রবাহ চলিয়াছে, আমাদের আদিম পুরুষেরা পেটের দায়ে, হতাশ হৃদয়ে অনিশ্চিত লক্ষ্য লইয়া যেরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ সেরূপ নয়। ইহা নূতন জগতের আশায়, উদ্‌ভ্রান্ত জনতার অবধারিত লক্ষ্যের দিকে চলা। কেবল Homo Sapiens বলিলে কবৈয়ার মাস্টারটির সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না, আর কেবল Biological necessity (জৈব আবশ্যকতা) বলিলে তাহার অফুরন্ত উৎসাহের পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না।…রেললাইন। দূরে কৃত্যানন্দনগর গ্রামটি দেখা যাইতেছে। …আধঘণ্টার মধ্যে প্রায় সিকি মাইল রেললাইন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। রেলগুলি ও কাঠের স্লিপার-গুলি, সকলে কাঁধে করিয়া ভুট্টার ক্ষেতে বা রেললাইনের ধারে ধারে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। কৃত্যানন্দনগরের দুইজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া-ছিলেন—এই দলকে এমন ভয়ানক কাজ হইতে বিরত করিতে। জনতা হাসি টিটকারি দিয়া তাঁহাদের বিদায় করিয়া দিল। একজন কাশের গুচ্ছ দিয়া দুইটি ছোট বালার মতো তৈয়ারী করিতেছে। কয়েকজন দৌড়াইয়া গিয়া সেই দুইজন ভদ্রলোককে ধরিল। হরিশ্চন্দর তাহাদের হাতে ঐ বালা দুইটি পরাইয়া দিল—বলিল "চুড়ি পহান্‌কর ভান্‌সা ঘরমে যাকর বৈঠো।"[১] আর একজন বলিয়া উঠিল "আয়! হায়! কেয়া নাজুক্ কলই!" অর্থাৎ আহা! কি নরম হাতখানি রে! "এই আর এক জোড়া চুড়ি দিলাম, তোমাদের নীলুবাবুকে পরাইয়া দিও। আর বলিয়া দিও, কলেক্টরসাহেবের পয়সায় এ এলাকায় ফুটানি ছাঁটিতে যেন না আসে। কবৈয়া রহুয়া জানে 'খুফীয়া'র (গোয়েন্দার) সহিত কেমন 'বর্তাব' (ব্যবহার) করিতে হয়।

১। "চুড়ি পরে রান্নাঘরে গিয়ে বসো।"

মনে না থাকিলে উইলসন নীলকরসাহেবের কী হইয়াছিল তাহা মনে করাইয়া দিও।" জনতার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর উহারা নীলুর সম্বন্ধে আমার সম্মুখে কোন মন্তব্য করিতে কুণ্ঠিত নয়—রেললাইনের কাঠের পুলটিতে আগুন লাগিয়া উঠিয়াছে। কী করিয়া এত তাড়াতাড়ি এত মোটা গুঁড়িতে আগুন ধরাইল? মা তো দেখি উনান ধরাইতেই হিমসিম খাইয়া যান। রহুয়ার সেই লাল গেঞ্জিপরা ছোকরাটি পাদরীসাহেবের নকল করিতেছে। কাল উহারা সাহেবের বাড়ি "ঘেরাও" করিয়াছিল। পাদরী-সাহেব কিরূপ স্বরে "গান্ধীজিকী জয়" বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া আকুল। রেলগাড়ির শব্দ হঠাৎ শোনা যায়। সত্যই তো এঞ্জিন দেখা যাইতেছে। এই আসিয়া পড়িল। মিলিটারীভরা গাড়ি; সঙ্গে থাকেন রেলের এঞ্জিনিয়ার। পালা! পালা! যে দিকে পারে—খানা ডোবার ভিতর দিয়া, আলের উপর দিয়া।...এক নিমেষের মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। টমিগানের কর্কশ শব্দ কানে আসিতেছে। কৃত্যানন্দনগরের দিকে একটি ভুট্টার ক্ষেতে আমি ঢুকিয়াছি। কৃত্যানন্দনগরের মধ্যে ইচ্ছা করিয়াই যাই নাই। গ্রামবাসীদের সহানুভূতি যখন নাই, তখন যাইব কেন। সাইকেলটি তাড়াতাড়িতে লাইনের উপর ফেলিয়া আসিয়াছি। ভুট্টার ক্ষেত,—পাদরীসাহেবটির দাড়ি ঠিক ভুট্টার শনগুলির মতো। গাছগুলি ভুট্টায় ভরিয়া আছে। ক্ষেতের সোঁদা মিষ্ট গন্ধের মধ্যে বারুদের গন্ধ পৌছায় না...।

...সেই মোকদ্দমা চলিবার সময় সরকারী উকিল ঠাট্টা করিয়া ভুট্টা ক্ষেতের বিবরণ দিতে দিতে বলিতেছেন—গোরার দল ঐ ভুট্টার ক্ষেত দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিল যে 'মকাই' ইণ্ডিয়ান কর্ন্ (Indian corn) নয়, নাজী কর্ন্ (Nazi corn)। জজসাহেব গাম্ভীর্য ত্যাগ করিয়া হাসিতেছেন; পেস্কারসাহেব হাসিতেছেন: আমার উকিল হরেনবাবুও এই রসিকতায় না হাসিয়া থাকিতে পারেন নাই।...পেরু আর চিলির সূর্যমন্দিরে থাকিত কৃত্রিম ভুট্টার গাছ। গাছের ডাঁটা ও পাতাগুলি রূপার,—ভুট্টার দানাগুলি সোনার।...

চোখের পাতা তন্দ্রায় ভারী হইয়া আসিতেছে। একটু হাত পা টান করিয়া লওয়া যাক। আঃ! গা হাত পা বসিয়া বসিয়া ব্যথা হইয়া গিয়াছিল।

হাই উঠিতেছে, আজও কি ঘুম আসিবে নাকি? কত লোকের গল্প শুনিয়া আসিতেছি—ফাঁসির আগের দিন তাহাদের সব চুল পাকিয়া গিয়াছিল। আমার চুলও পাকিয়া যায় নাই তো? একখানি আয়না থাকিলে হইত। কমরেড চনরবল্লী ফাঁসির আগে পাগল হইয়া গিয়াছিল; আর আমার ঘুম আসিতেছে! আশ্চর্য!...

...আমার যদি অনেক টাকা থাকিত, তাহা হইলে আজ উইল করিয়া যাইতাম। অনেক কোটি টাকা। তাহা দিয়া মার্ক্সবাদের প্রচারকার্য চলিত। ভারতের প্রতি গ্রামে গ্রামে রুশের বালক ও কিশোরদের সংঘের ন্যায় দলের সংগঠন হইতে পারিত। কিন্তু টাকা আসিবে কোথা হইতে? যদি লটারীর টিকিট না কিনিয়া লটারীতে টাকা পাইবার সুবিধা থাকিত? তাহা হইলেই একমাত্র টাকা পাইবার আশা ছিল। আর যদি রাষ্ট্র আমাদের হাতে আসিত তাহা হইলে কাজ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারিতাম, দশ বৎসরের মধ্যে দেশের কী করা যায়।.. কংগ্রেস-কর্মীরা আবার জেল হইতে বাহির হইলে, নিশ্চয়ই আমার নামে কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে।—"বিলুবাবুকা সড়ক," "বিলু আশ্রম;" না, বোধহয় আমার ভালো নামই ব্যবহার করিবে, 'পূর্ণ আশ্রম'। কিন্তু আমার ভালো নাম যে 'পূর্ণ' তাহা তো কেহ জানেই না। সকলেই জানে 'বিলুবাবু'কে। আর তাহারও পর কত কী হইতে পারে। হয়তো পূর্ণিয়ার নাম হইয়া যাইবে পূর্ণনগর—স্টালিনগ্রাড বা গর্কি শহরের মতো। বাজারে বালমুকুন্দ সাউর ধর্মশালার মোড়ের উপর থাকিবে, আমার মর্মর মূর্তি—বক্তৃতা দিবার ভঙ্গীতে। প্রতি বৎসর এই দিনে দলে দলে লোক জুটিবে, ইহার বেদীতলে—আমার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে।...বন্ধ চোখের পাতার উপর দেখিতেছি একটি সবুজ শিখা—ময়ূরের পাখার চোখের মতো, কিন্তু চঞ্চল ও কম্পমান। শিখাটি লাল হইল ...হলদে—সবুজ...স-বু-জ...নীল...কালো...শিখাটি আছে কি নাই... আঁধার......

জ্যাঠাইমার রান্নাঘরের বারান্দায় জ্যাঠাইমা বঁটি লইয়া বসিয়াছেন আম কাটিতে। একটি ঝুড়িভরা গোলাপখাস আম, সম্মুখে জামবাটি; আমগুলির বোঁটা কাটিয়া জামবাটির জলে রাখিতেছেন। আমি আর সরস্বতী তাঁহার

সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়াছি। জ্যাঠাইমা বলিলেন, "এক থালায় দি, তোরা দুজন খা।" আম কাটিয়া জ্যাঠাইমা থালায় দিলেন। সরস্বতী জ্যাঠাইমাকে বলিল, "কাটা আম কি এঁর মুখে রুচবে,—ওঁকে আস্ত আম দেন।" জ্যাঠাইমা সরস্বতীকে ঠাট্টা করিয়া বলেন, "ওমা, এরই মধ্যে এত।" বলিয়া আমার হাতে দেন একটি গোটা আম—সোনার মতো হলদে রং, মুখের কাছটি সিঁদুরে লাল। আমি আমটির নীচের দিকে একটি ছিদ্র করিয়া লই। টিপিয়া আমটিকে নরম করিয়া লই, তাহার পর চুষিয়া চুষিয়া খাই। মা রহিয়াছেন শোবার ঘরের বারান্দায়; হবিষ্যি ঘরে আসিবার ইচ্ছা কিন্তু আসিতে পারিতেছেন না। মধ্যে উঠানে একটি প্রকাণ্ড সাপ; মসৃণ কালো রং; ফণা তুলিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। মা চীৎকার করিতেছেন, "নীলু শীগগির এটাকে মার, এখুনি মেরে ফ্যাল্।" বাবা বলিলেন, "না মেরো না। হাততালি দাও, চলে যাবে।" নীলু কি বাবার কথা শোনে! একটি প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া আসিয়াছে, সাপটিকে মারিবার জন্য। সাপটি পলাইতেছে; অন্ধকার ইঁদারার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। আর সাপ নাই। সাপটি কুয়ার বালতির দড়ি হইয়া গিয়াছে; নীলু রাগে বালতির উপর এক লাঠির ঘা মারিল। খন্‌ন্ করিয়া শব্দ হইল।......

কিসের যেন শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বুটের শব্দ, মাথার কাছে। অ্যাঁ তবে কী আমাকে লইতে আসিয়াছে? এই দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল বুঝি! সর্বশরীর দিয়া ঘাম ঝরিতেছে। নিশ্চল ও স্পন্দনহীন হইয়া পড়িয়া আছি। না, দরজা খুলিল না। তবে বোধহয় নূতন ওয়ার্ডার আসিল—স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। হ্যাঁ, তাই বটে। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি? ভোরের দল নাকি? এখনও তো পাখির ডাক শুনা যাইতেছে না। ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করিব নাকি কটা বাজিল? না দরকার কী? যখন সময় হইবে তখন জানিতেই পারিব। জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে দুর্বলচিত্ত মনে করিবে। একজন সামান্য ওয়ার্ডারের কাছে জীবনের এই শেষ মুহূর্তে ছোট হইতে পারি না। পাগলটিও তো ভোর রাত্রি হইতে চীৎকার আরম্ভ করে। তাহা হইলে এখনও সকাল হইবার দেরী আছে। এ জগতের সহিত আর দুই ঘণ্টার সম্বন্ধ! বাহিরে যখন সুযোগ ছিল তখন জীবনকে উপভোগ করি

নাই। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কি করিয়া কাটাইলাম, ঠিক মনে পড়ে না। নিরর্থক জীবনের অন্তহীন বিস্মৃতির স্তরে স্তরে জমিয়া আছে, এক আধটি স্মৃতির কঙ্কাল। ইহার পরিচয় আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। ইচ্ছা করে বাঁচিতে—ইচ্ছা করে বাকি দুই ঘণ্টায় স্বপ্ন-বিলাসের মধ্য দিয়া জগৎকে নিঙড়াইয়া, যাহা কিছু ভোগের জিনিস আছে, একত্র করিয়া লইতে। যদি এই শেষ মুহূর্তে আমার ফাঁসি রদ করিবার হুকুম আসে! এমনও তো হয়। কত লোকের এরূপ ঘটিয়াছে।…জল্লাদ খড়্গ উঠাইয়াছে। অশ্বারোহী দূর হইতে নক্ষত্রবেগে আসিতেছে। ঘাতক বধ করিও না, বধ করিও না। কত কাহিনী পড়িয়াছি। পিথিয়াস ও ড্যামন।……

১৯৩৪-এর ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মতো ভূমিকম্প এখন যদি হয়, জেলের দেওয়াল যদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও, আমার বাঁচিবার উপায় নাই। যে ফাঁসি দিবে তাহার যদি হঠাৎ অসুখ করে? তাহা হইলে অন্য লোক পাইতে দেরী হইবে না। যদি হাইকোর্ট হইতে অথবা প্রভিন্সিয়াল এড্‌ভাইসরের নিকট হইতে, চিঠি আসিয়া থাকে, আমার ফাঁসি বন্ধ করিয়া দিতে, আর দৈবাৎ ভ্রমক্রমে তাহা যদি খোলা না হইয়া থাকে। আশ্চর্য কী! এরূপ তো কয়েক বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবে হইয়াছিল। বড়সাহেবের পকেটেই চিঠি থাকিয়া গিয়াছিল—লোকটির ফাঁসি হইবার পর সকলের খেয়াল হয়।….বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছে? কোন অনির্দিষ্ট শক্তির অমোঘ নির্দেশে তো আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। সত্যই কি ইহা মৃত্যুভয়? ভয় নিশ্চয়ই। এই তো কিছুক্ষণ আগে ওয়ার্ডারের পদশব্দে মনের ভাব যাহা হইয়াছিল, তাহা ভয় ছাড়া আর কী? উৎকণ্ঠার চরম অনুভূতিতেই আসে নিরাশা। সেই নিরাশার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে আমার মনের উপর।……'

মোটা শনের দড়ি। ছোটবেলায় আমরা ঐ দড়িকে 'লকলাইন' বলিতাম। তাহাতে একটি ফাঁস! ফাঁসের গোড়ায় একটি পিতলের গোলক (knob)। দড়িটিতে আগাগোড়া বেশ করিয়া চর্বি মাখানো। নীচে অন্ধকার গর্ত—দেখিতে ঠিক কুয়ার মতো। গর্তটি কত নীচু—বোধহয় বেশী নয়। কাঠের তক্তাটি টানিয়া লইলে যখন সমস্ত শরীরটি ঝুলিয়া পড়িবে,

তখন যাহাতে পা দুখানি মাটিতে না ঠেকিয়া যায়—সেই জন্যই গর্তটির দরকার। কাজেই কূয়াটি নিশ্চয়ই অগভীর। বেশী খুঁড়িলে তো জল উঠিবে। চার পাঁচ হাতের বেশী হইবে না। কিন্তু গর্তটি যত গভীর হইবে, আর দড়ি যত বড় হইবে, ততই শরীরটি নীচে পড়িবার সময় ঝাঁকানি বেশী খাইবে; আর ঐ ঝাঁকানিই তো আসল জিনিস। না হইলে ঘাড়ের কাছের হাড়টি ভাঙ্গিবে কী করিয়া? ফাঁসি মানে তো কেবল দম বন্ধ করিয়া মারা নয়। তাহা হইলে তো গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেই হইত; এত যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের কী দরকার ছিল? কম সময়ে, কম পরিশ্রমে, মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্যই ফাঁসির সৃষ্টি। পিতলের গোলকটি ঘাড়ের হাড়ের উপর, সজোরে আঘাত করিল; কুট করিয়া একটু শব্দ হইল। তাহার পর? তাহার পর সব শান্ত। না, একেবারে শান্ত হইবে কি করিয়া? মানুষের বাঁচিবার এত আকাঙ্ক্ষা! সেই জীবনবিলাসী ইচ্ছাশক্তির তাড়নায়, অসহায় শিথিল দেহটি কি একটুকুও সাড়া দিবে না! আর ইচ্ছাশক্তি যদি নাই থাকে, তাহা হইলেও তো reflex action-জনিত আক্ষেপ আছে। বলিদানের পর পাঁঠার ধড়টি ধড়ফড় করিতে দেখিয়াছি।—তাহার পর ফাঁসির আসামীর দেহটি শূন্যে ঝুলিতেছে—অন্ধকারে এদিক ওদিক দুলিতেছে। দড়িটিকে ঢিলা করিয়া দেওয়া হইল। মৃতদেহটির পা গর্তের মধ্যে মাটিতে ঠেকিয়াছে। ডাক্তার পায়ের শিরা কাটিবে নাকি? গল্প শুনিতাম, কে যেন বাঁচিয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্যই এত সাবধানতা। সব বাজে কথা। ডাক্তারের ওসব কোন কাজই নাই। কেবল সরকারী নিয়মরক্ষার জন্য ডাক্তারের উপস্থিতি ফাঁসির সময় দরকার। কেবল তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, হ্যাঁ, আসামী সত্যসত্যই মরিয়াছে; আইনের ভাষায়, যতক্ষণ না মরে ততক্ষণ পর্যন্ত ফাঁসি দিয়া ঝুলাইবার সাজা কিনা, সেইজন্য। তারপর দিল্লীর শা'য়ের বাউলীর ছোট সংস্করণের ন্যায়, গর্তটির ভিতর ধাপে ধাপে যে সিঁড়ি গিয়াছে, তাহা দিয়া নীচে নামিবে সেই লোকটি। সে নেহাত কেউ-কেটা নয়। এক মুহূর্তের শারীরিক পরিশ্রমে কয়জন লোক পাঁচ টাকা রোজগার করিতে পারে? তাহার উপর "রেমিশন" তো আছেই। দস্তুর মতো piece work (ঠিকা) মজুরি। শবদেহটি,—না আর শবদেহ নয়,—লাসটি উপরে আনিয়া ফেলা

হইল। বীভৎস মুখ! চোখ দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কী ভীষণ যন্ত্রণা হইবে তক্তা সরাইয়া লওয়ার মুহূর্তে! অসম্ভব তীব্র যন্ত্রণা! চোখে জল আসিতেছে! ছি, কতটুকু সময়ের জন্য যন্ত্রণা! হয়তো ঐ সময় উহা অনুভব করিবার শক্তিও থাকিবে না। হয়তো অন্য সকল চিন্তায় মন এত অভিভূত থাকিবে যে, যন্ত্রণার কথা মনেও থাকিবে না। সাংঘাতিকভাবে আহত লোকও যুদ্ধক্ষেত্রে নেশাগ্রস্তের মতো নিজের কাজ করিয়া চলে। তাহার কি নিজের যন্ত্রণার কথা ভাবিবার সময় থাকে? আর যদি যন্ত্রণা অসম্ভব তীব্রও হয়, তাহা হইলেই বা কি আসে যায়? জীবনেরই যদি আশা না থাকে, তাহা হইলে এক মুহূর্তের যন্ত্রণার কথা ভাবা নিরর্থক। মরিবার পূর্ব মুহূর্তে শুনিয়াছি, সারাজীবন চলচ্চিত্রের ছবির মতো চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আমার বিশ্বাস হয় না।···যে দেশে মৃত্যুদণ্ড নাই সে দেশে যদি আমার সাজা হইত তাহা হইলে? তাহা হইলে আজীবন কারাবাসের দণ্ড হয়তো আমাকে বৈচিত্র্যময়ী ধরণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত। কিন্তু জেলের মধ্যেও তো একখণ্ড জগৎ আছে। জেলের মধ্যেও তো শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার পরিবর্তন অনুভব করিতে পারা যায়। আকাশ, বাতাস, চন্দ্র-সূর্য-তারা সেখানেও মাধুর্য বিলাইতে কার্পণ্য করে না। কালবৈশাখীর মাতলামি, প্রথম বৃষ্টির পর ভিজা মাটির গন্ধ, নিশীথ রাতের বারিধারার মাদকতাভরা রিমিঝিমি, কত স্মৃতিভরা শরতের সোনালী তবকমোড়া রৌদ্র, রহস্যভরা শীতের কুয়াশা,—জেলের প্রচীরের ভিতরেও ইহাদের নিরঙ্কুশ গতি। তাহার উপর মানুষের মুখ দেখা—হউক তাহারা চোর ডাকাত তবু মানুষ তো। তাহাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা কি একটি দড়িতে ঝুলিয়া মরা অপেক্ষা অনেক ভালো না? অমেরিকায় কেমন ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিলাম, আর এক মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল। যন্ত্রণার লেশমাত্রও নাই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বের মানসিক যন্ত্রণা তো এখানেও যেরূপ, সেখানেও সেইরূপ—কেবল তাহাদের মারণ-যন্ত্রটি একটু মার্জিত। এই যা তফাত। কিন্তু যে দেশে বন্দুকের গুলি দিয়া মারা হয়, তলোয়ার দিয়া কাটা হয়, গিলোটিন করা হয়, তাহার অপেক্ষা তো আমাদের ব্যবস্থা ভালো। খাঁড়া দিয়া গলা কাটিবার

কথা ভাবিতেও মন শিহরিয়া ওঠে। আচ্ছা যদি ফাঁসির আসামীকে মর্ফিয়া ইনজেকশন দিয়া বা ক্লোরোফর্ম করিয়া তাহার পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি কি? তাহাতে যে শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক দুশ্চিন্তা হইতে লোকটি বাঁচিয়া যাইবে। লোকটিকে সমাজ হইতে সরাইয়া ফেলাই যদি রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান করাইবার পর ফাঁসির ব্যবস্থাই হইত। সব চাইতে ভালো পটাসিয়াম সায়ানাইড—ক্ষণিকের ভিতর সব শেষ।......

নীলু কলেজ ল্যাবরেটরী হইতে খানিকটা লইয়া আসিয়াছিল। ঐ জিনিস লইয়া কতরকম আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা। রবারের ছোট ক্যাপস্থলের মধ্যে ভরিয়া মুখে রাখা সব চাইতে ভালো, তাহাই ঠিক হইল। গ্রেপ্তার হইলেও ভয় নাই; যখন ইচ্ছা মুখের মধ্যে ক্যাপস্থল্‌টিতে দাঁত দিয়া একটি ছিদ্র করিয়া দাও। তখন যাহা ভাবিয়াছিলাম, যাহা ঠিক করিয়াছিলাম তাহা যদি করিয়া রাখিতাম তাহা হইলে আজ মানসিক দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তখন তো ভাবি নাই যে সত্যই আমার এ জিনিসের দরকার হইবে! যদি থাকিত তাহা হইলে যেই ভোর রাত্রে বুটের শব্দ শুনিতাম, তখনই ক্যাপস্থল্‌টি চিবাইয়া ফেলিতাম। দরজা খুলিয়া উহারা আশ্চর্য হইয়া যাইত। ঘাতক কয়েদীটি হতাশ হইত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভাবিতেন এ আবার কি ঝঞ্ঝাট আসিয়া জুটিল,—এখন আবার হাজার রকম ডিপার্টমেণ্টাল লেখাপড়ার মধ্যে পড়িতে হইল। সকলে ভাবিবে যে ভয়ে হার্টফেল করিয়া মরিয়া গিয়াছে। না, পোস্টমর্টেম নিশ্চয়ই হইবে। তাহা হইলেই পটাসিয়াম সায়ানাইডের কথা বাহির হইয়া পড়িবে।...

কিন্তু পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়াও অত সহজ নয়। সেবার তো পারি নাই। সেবার যখন ডিসপেপসিয়ায় ভুগিতেছিলাম, বিকেলে প্রত্যহ ফুটবল ম্যাচ দেখিতে যাইতাম। একদিন দেখিলাম জিতেনদা এস. ডি. ও. সাহেবকে ডাকিতেছে, "Come up ইসমাইল।" দুইজনে মোটরের ভিতর দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে লাগিল। একজন আর একজনের কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে।...হঠাৎ মনটা কেমন যেন হতাশায় ভরিয়া গেল—নিজের দুর্বলতা, নিজের নগণ্যতা, নিজের সপ্রতিভতার অভাবের কথা, মনের মধ্যে

কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, জিতেনদার সপ্রতিভতা কেন আমার হইল না। জিতেনদার উপর ঈর্ষা হয় নাই। এস. ডি. ও. সাহেবের সহিত বন্ধুত্বের জন্যও আমি লালায়িত ছিলাম না; তথাপি কেন যেন মন অবসাদে ভরিয়া গেল। ক্ষণেকের মধ্যে জীবনে বীতরাগ আসিয়া গেল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, বাঁচিয়া থাকিয়া কী হইবে, যে হীন অবস্থায় আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা মরণ অনেক ভালো। সব ঠিক—সেদিন রাত্রেই পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইব। এইরূপই জাগিয়া কত রাত পর্যন্ত জেলা কংগ্রেস অফিস-ঘরের বড় ঘড়িটির ঘণ্টা বাজা শুনিয়াছি। পরে ঠিক চরম মুহূর্তে মনে হইয়াছিল যে আজ থাক। "লেডিজ আফটারনুনটি" বিস্কুট খুব খাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কাল এই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাহার পর আত্মহত্যার কথা ভাবা যাইবে। পরের দিনে মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর যখনই ভাবিয়াছি সমস্ত ঘটনাটি হাসির গল্পের মতো মনে হইয়াছে।...কিন্তু আজ সায়ানাইড থাকিলে নিশ্চয়ই খাইতাম। ইহা তো স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা নয়; আর এক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় মাত্র। সায়ানাইডের শিশিটা লেবু গাছের তলায় পুঁতিয়া ফেলিয়াছিলাম। কী মনে হইয়াছিল জানি না—শিশিটি মাটিতে পুঁতিবার পূর্বে বাদামী রংএর একটি পুরান মোজার মধ্যে ভরিয়া তাহার পর পুঁতিয়াছিলাম। এখনও নিশ্চয়ই সেইখানে পোঁতা আছে।

লেবু গাছটির কয়েকটি করিয়া নীচের ডাল, সর্বদাই মাটি চাপা দেওয়া থাকে,—কলম তৈয়ারী করিবার জন্য। জেলার যত কংগ্রেসকর্মী কার্যো-পলক্ষে জেলা অফিসে আসে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই লইয়া যায় এই গাছের কলম।...নীলুর প্রত্যহ খাওয়ার সময় লেবু চাই। ডালের মধ্যে ছুচার ফোঁটা লেবুর রস না দিলে তাহার ভাল লাগে না। আশ্রমে মাছ রান্না হয় না। সেই জন্য বড় মাছ আসিলেই জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে আমাদের খাওয়ার ডাক আসে। ও বাড়িতে যাওয়ার সময়ও নীলুর একটি লেবু পকেটে করিয়া যাওয়া চাই—কী জানি ও বাড়িতে লেবু আছে কি নাই। ও বাড়ির ছোট ছেলেটি পর্যন্ত একথা জানে; কেহ নীলুকাকার পকেট দেখিতেছে: কেহ দৌড়াইয়া দিদিমাকে খবর দিতে গেল যে নীলুমামার পকেটে লেবু

আছে। জ্যাঠাইমা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "কিরে 'মাছপাতরী' তোরা এসেছিস।"—অনেকদিন আগের ঘটনা! জ্যাঠাইমার বাড়ির বারন্দায় সারি সারি পিঁড়ি পাতা হইয়াছে। সম্মুখে ভাতের থালা। আমি, নীলু, জিতেনদা, ঘ্যাণ্টা সকলে খাইতে বসিব। "আরে মাছপাতরী যে!" বলিয়া নীলু দৌড়াইয়া গিয়া পিঁড়িতে যেমন বসিতে যাইবে, পিঁড়ি পিছলাইয়া পড়িয়া গেল! ভাতের থালা ছিটকাইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে; একেবারে তছনছ কাণ্ড! সেই হইতে জ্যাঠাইমা নীলুকে 'মাছপাতরী' বলেন। কথাগুলির মধ্যে উপহাসের ইঙ্গিত যাহা ছিল, তাহা আর এখন নাই কিন্তু কথার কাঠামোটি রহিয়া গিয়াছে। তাহার পর জ্যাঠাইমা বলেন, "দেখি বারিন্দিরের ব্যাটা, পকেটে করে লেবু এনেছিস তো? দে, কেটে রাখি।"

সেই নীলু, সেই একরত্তি হাফপ্যাণ্ট পরা ক্যাপ্টেন নীলু, সেই 'মাছ-পাতরী'র নীলু, সেই দাদা বলিতে অজ্ঞান নীলু—সে কিনা আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করিল! তাহার নিকট হইতে এই ব্যবহার আমি তো কোনদিন আশা করি নাই। এত ঘৃণ্য পরিবর্তন হইয়াছে তাহার মনের! ছি!—একি? আমি একি ভাবিতেছি? পায়ের যে ক্ষতটির উপর আঘাত লাগিবে বলিয়া হাত দিই না, হাটে ঘাটে পথে, ভিড়ের মধ্যে যে ক্ষতটিকে অতি সন্তর্পণে আঘাত হইতে বাঁচাইয়া আসিয়াছি, বাড়িতে আসিয়া টেবিলে পা তুলিয়া আরাম করিয়া বসিবার সময় কি উহার উপর আঘাত লাগিল? মনের গভীর ক্ষতটিকে আর বুঝি বিস্মৃতির মলমে ও যুক্তির প্রলেপে ঢাকিয়া রাখা যায় না। না, আমিই যদি নীলুকে ঠিক না বুঝি, তাহা হইলে বাহিরের লোকে বুঝিবে কেমন করিয়া। সেকালে অনেক স্থানে, শিয়াল গ্রামে উপদ্রব করিলে, তাহাকে ধরিয়া গ্রামের মধ্যে চৌমাথার উপর ফাঁসি দিবার ব্যবস্থা ছিল। লোকে কেবল নিজের ক্ষতির দিক দিয়াই জিনিসটিকে ভাবিত, এবং সেই দৃষ্টিকোণ দিয়াই অনিষ্টকারীর উপর প্রতিশোধ লইত। কিন্তু আমাকে নীলুর দৃষ্টি দিয়াই সমস্ত ঘটনাবলী দেখিতে হইবে। সেদিন যখন নীলু দেখা করিতে আসিয়াছিল, এই কম্বলের উপরেই তো বসিয়াছিল! আমার মুখের দিকে প্রাণখোলা স্বাধীনভাবে তাকাইতে পারিতেছিল না। তাহার চোখে মুখে ছিল অপরাধীর সঙ্কুচিত ভাব। কেন? কোথাও গলদ

নিশ্চয়ই আছে। না হইলে তাহার কুণ্ঠার কারণ কী? বিবেকের দংশন, না কেবল অনুতাপ? নীলু আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছিল। কী বলিতে চাহিতেছিল তাহাও জানি। কিন্তু আমি সে কথা উঠাইবার সুবিধা দিই নাই, দিলে হয়তো আমারও সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত! নীলু আসিয়াছে তাহার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, তাহার প্রাতদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক পার্টির স্থানীয় নেতা বীলুবাবুর সহিত নয়। কী ভাগ্য যে সেদিন তাহার সম্মুখে আমার মানসিক দ্বন্দ্বের আভাস ফুটিয়া উঠে নাই। আমার আবার একটুতেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। তাহাই ছিল আমার ভয়। কিন্তু যাহা হউক কোন রকমে ভালোয় ভালোয় ইন্‌টারভিউ কাটিয়া গিয়াছিল। সে চলিয়া যাইবার পূর্বে আমি ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই। আর তাহার দিক হইতে আবেগের আতিশয্য দেখিয়াছিলাম। চলিয়া যাইবার সময় দুই হাত দিয়া আমার ডান হাতটি চাপিয়া ধরিয়াছিল—মুহূর্তের জন্য। মৃদু কম্পমান হাতের সেই হিমশীতল স্পর্শ এখনও অনুভব করিতেছি। বলিয়াছিলাম মা'র সহিত দেখা করিতে। করিল কিনা কে জানে? মাকে লইয়াই ভয়। মা'র একছেলে তো তবু থাকিল। চোখ বুঁজিয়া মা'র মুখটি মনে করিবার চেষ্টা করি।...

মা ভাতের সহিত জলপাইয়ের আচার খাইতেছেন। সম্মুখের চুল সাদাতে কালোতে মিশানো—কালোই বেশী, সিঁথির চুল কতকগুলি উঠিয়া সিঁথিটি চওড়া হইয়া গিয়াছে; তাহার উপর চওড়া করিয়া দেওয়া সিঁদুর। তাহার পিছনে দেখা যাইতেছে খদ্দরের শাড়ির লাল পাড়। কান, গলা সম্পূর্ণ নিরাভরণ। অর্ধনিমীলিত চোখের কোণে কতকগুলি বলিরেখা, একটি করিয়া মোটা, বাকিগুলি চুলের মত সরু। নাকের নীচের দিক হইতে দুইটি চর্মরেখা, ঠোঁটের দুই কোণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ধবধবে রংএর উপর রেখা দুইটি বেশ গভীর দেখাইতেছে। মা ঠোঁট দুইটি ছুঁচালো করিলেন—জিবটি চুষিতেছেন, গলনলীর মৃদুকম্পন উপর হইতেই বুঝা যাইতেছে। জিবটি টাকরায় ঠেকাইয়া টক্ করিয়া একটি শব্দ করিলেন। ঠোঁট দুইটি খুলিলে দেখা গেল, নীচের দন্তপংক্তির মধ্যে একটি দাঁত নাই। তাহার মধ্য দিয়া লালাসিক্ত জিহ্বা দেখা যাইতেছে। "তোরা ওঠ না, তোরা ওঠ।" আমরা কিন্তু বসিয়া থাকি।

জ্যাঠাইমা'রও কয়েকটি নীচের পাটির দাঁত নাই। থাকিবে কোথা হইতে? চব্বিশ ঘণ্টা দাঁতের নীচে, ঠোঁটের মধ্যে একরাশ চূনের সহিত ডলা জর্দা গোঁজা থাকে। লোকে পানের সহিত জর্দা খায়; কিন্তু শুধু জর্দা এতখানি করিয়া নিয়মিত খাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। জ্যাঠাইমা এখন কি করিতেছেন? আজ রাতে কি জ্যাঠাইমার ঘুম হইবে? কি শীত, কি গ্রীষ্ম চিরকাল রাত তিনটার সময় উঠিয়া, বিছানার উপর বসিয়াই মালা জপ করেন। ঘুম হইতে উঠিয়াই লণ্ঠনের শিখাটি বাড়াইয়া পাশের জানালার উপর রাখিলেন। আলো গিয়া পড়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো এমটি রাধাকৃষ্ণের ছবির উপর। তাহার পর চশমাটি চোখে লাগাইয়া ঐ দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া বসেন। ঐরূপই নাকি গুরুদেবের নির্দেশ। গোল মুখটি—মা একদিন বলিয়াছিলেন ডিবের বাটির মতো। মুখে গুটিকয়েক বসন্তের দাগ। কপালে একটি নীল উল্কির ফোঁটা; গলায় কণ্ঠি। জপ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে পাশের জানালা দিয়া জর্দার থুতু ফেলিতেছেন। আর সেই অবকাশে, আকাশের দিকে তাকাইয়া লইতেছেন, সকাল হইতে আর কত দেরী। এইবার বাইরের ইঁদারায় বালতি ফেলিবার শব্দ হইতেছে। পাড়ার মুদী রামদেব সাও প্রত্যহ ভোর না হইতে ইঁদারায় জল লইতে আসে। ইহাই জ্যাঠাইমার ঘড়ি। "বেলী, ওরে বেলী, আজ কি উঠবি না?" ন'দি ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া ওঠে।......

নীলুকে ছোটবেলায় সকালে ঠেলিয়া তুলিয়া দিতে গেলে, প্রথমে বলিত, "ভালো হবে না তা বলছি, দাদা।" বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইত। আবার ঠেলা দিতে গেলে বলিত "ফের"। তাহার পর বলিত "আবার"। আর একবার ঠেলিলে বলিবে "তবুও"। এবার গলার জোর কিছু বেশী। তার পর আপন মনে বকিতে বকিতে উঠিয়া বসিত। মা বলিতেন, "এই ভোরে উঠেই সাপের মন্তর ঝাড়া আরম্ভ হল।" নীলুর মুখটি মনে করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই মনে আসিতেছে না। যখন-তখন নীলুর মুখটি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু এখন মনে করিতে চাহিতেছি, শেষ মুহূর্তের একটু তৃপ্তির জন্য। কিন্তু এখন কি আর মনে

আসিবে? মনে করিতে চাহিতেছি নীলুর মুখ— আর মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে গণৌরী মাহাতোর মুখ—ন্যাড়া মাথা, থ্যাদা নাক, বুলডগের মতো মুখ, এক কানের উপরিভাগে ছিদ্র করিয়া একটি সোনার আংটা পরানো……

গা শিরশির করিতেছে। ভোর রাত্রের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। এই এখন দুই ঘণ্টা মাত্র সেলটি ঠাণ্ডা লাগিবে। পাগলটি চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। তিন নম্বর আবার কখন ভজন আরম্ভ করিল, পূর্বে খেয়াল করি নাই।

অশ্বত্থ গাছের কাকগুলি একবার কা-কা করিয়া ডাকিয়া চুপ করিয়া গেল। বোধ হয় বুঝিতে পারিল যে সকাল এখনও হয় নাই, সময় গণনায় একটু ভুল হওয়ায়, কিছুক্ষণ আগেই ডাকিয়া ফেলিয়াছে। কতটুকুই বা আমার মেয়াদ! এখন এক মুহূর্তের মূল্য আমার কাছে কত! সিনেমার ছবি হইলে হয়তো দেখাইত—একটি বালুর ঘড়ি, ডমরুর মতো। উপরের বাটির বালু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু টিপ্ টিপ্ করিয়া অনবরত বালুকণা নীচে পড়িতেছে। এক পলকেরও বিরাম নাই।…কিংবা হয়তো দেখাইত প্রদীপের তেল শেষ হইয়া আসিল।…হয়তো বা ঘড়ির কাঁটা চলিতেছে।… আমার ঘড়িও তাহার নিজের ধরনে, সেই বাঁধা নিয়মে চলিতেছে—ঠাণ্ডা হাওয়া, পাগলের চীৎকার, তিন নম্বরের ভজন;—বাকি কেবল আকাশ একটু পরিষ্কার হওয়া। শুকতারাটি চিনিতে পারিতেছি। আর সর্বাপেক্ষা রূঢ় বাস্তব আমার ওয়ার্ডার সাহেব সেলের আঙ্গিনায় চৌবাচ্চার উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে।……

এখন বিলু আছে, আর কিছুক্ষণ পরে থাকিবে না। রক্তমাংসে গড়া সুখদুঃখে ভরা বিলু বলিয়া কিছু নাই; আমি সরকারী স্ট্যাটিস্‌টিকসের একটি সংখ্যা মাত্র। অজস্র সংখ্যার মধ্যে একটির হ্রাস বৃদ্ধিতে কী আসে যায়? বৈজ্ঞানিক, "প্যারালাক্স বা ইনস্ট্রুমেণ্টাল এরর"-এর (দৃষ্টিবিভ্রম বা যন্ত্রজনিত ভুলের) জন্য শতকরা কিছু সংখ্যা তো ছাড়িয়াই দেন। ব্যবসায়ে 'ঝড়তি পড়তি' বলিয়াও তো একটি জিনিস আছে। আমি হয়তো ইহাদের মধ্যে পড়িব। হয়তো বা ভারতসরকারের হিসাবের সময়, আমি—

পূর্ণিয়া জেলের ১১০৯ নম্বর ফাঁসির আসামী—ফাঁসির শতকরা হার একটি দশমিক ভগ্নাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিব। সরকারী রিপোর্টের এতটুকু ছাপার কালির খরচ! ইহাই আমার জীবনের মূল্য—জাতীয় ইতিহাসে বিলুবাবুর দান।

গরুর গাড়ির চাকার যেরূপ কঁ্যাচর কঁ্যাচর শব্দ হয়, সেইরূপ একটি শব্দ হইল। বোধহয় ওয়ার্ডের দরজা খোলার শব্দ। তবে কি? ······ঠিকই তাই। যাহা ভাবিয়াছি তাহাই। সিমেণ্ট বাঁধান সেলের আঙ্গিনার উপর একসঙ্গে অসংখ্য জুতার শব্দ হইতেছে! কত লোক আসিতেছে! শুনিয়াছিলাম একদল সৈনিকের পদধ্বনির প্রতিশব্দে একটি পুল ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। সত্যই তো কত জোরে শব্দ হয়! ঐ পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করিতেছে। বুকের স্পন্দনের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। রসমোহন ঢাকী কোন নবমী পূজার রাত্রেও বোধহয় এরূপ শব্দের স্পন্দন তরঙ্গায়িত করিতে পারে নাই। সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখের সম্মুখে যেন কিসের একটা পর্দা পড়িয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন যেন ঠাণ্ডা আর খালি লাগিতেছে।—একবার আমার ডান হাতের আঙ্গুলটি সাইকেলের স্পোকের মধ্যে পড়িয়া কাটিয়া গিয়াছিল। রক্ত আর বন্ধ হয় না। সেই সময় রক্ত দেখিয়া মাথার মধ্যে এইরূপ ঝিমঝিম করিয়া উঠিয়াছিল।—কপালে ও নাকের নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। কেন জানি না দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিল। গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলাম। হাত পা অসম্ভব কাঁপিতেছে, দাঁড়াইতে পারিলাম না; পায়ের দিকটা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সেবার টাইফয়েডের পর প্রথম খাট হইতে নামিতে গিয়া এইরূপ বোধ হইয়াছিল। ওয়ার্ডার দাঁড়াইয়া নিজের পাগড়ি ঠিক করিয়া লইল। পাগলটি চীৎকার করিতেছে। তিন নম্বর ভজন গান বন্ধ করে নাই। জুতার শব্দ নিকটে আসিতেছে —আরও আরও। তলপেটের মধ্যটা যেন খালি হইয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে পেটের ভিতরটি বরফের মতো ঠাণ্ডা। একবার কারনিভালে নাগরদোলায় দোল খাইবার সময়, চাকাটি যখন উপর হইতে নীচে নামিতেছিল, তখন তলপেটে এইরূপ অনুভব করিয়াছিলাম। জিভটি

শুকাইয়া উখার মতো খরখরে হইয়া গিয়াছে, আর যেন গলার মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে।

সরস্বতী! মা! জ্যাঠাইমা! নীলু! নীলু তুই একি করলি? একটি লোহার horizontal bar-এ, আমার অসার মৃতদেহটি ঝুলিতেছে। পা দুইটি শূন্যে দুলিতেছে উত্তর, উত্তরপূর্ব, পূর্ব, পূর্বদক্ষিণ, দক্ষিণ।

একি? বুটের শব্দ আর আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে না। আমার ওয়ার্ডারটি উঁকি মারিয়া ওয়ার্ডের আঙ্গিনার দিকে দেখিতেছে। হঠাৎ তিন নম্বরের ভজন গান বন্ধ হইয়া গেল। আমার শ্রবণশক্তিও মানসিক উদ্বেগে হঠাৎ লুপ্ত হইল নাকি! না। গোঙার কথা বলিবার চেষ্টা করার মতো একটি শব্দ কানে আসিয়া পৌছাইল। অতি করুণ, কাতর, অসহায় আর্তনাদ!

কে? কেন?……

এইবার! এইবার—কেবল অগণিত জুতার শব্দ মাত্র নয়—গৌরীশৃঙ্গের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কালবৈশাখীর উগ্র মাতন—আবার আর্তনাদ—ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের বুকচেরা আর্তনাদ—"হুসিয়ারীসে"—পায়ের নীচের পৃথিবী ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল—নীচে—নীচে—অতল অন্ধকারের মধ্যে।

—"সামনে বাত্তি[১] দেখাও"—কতকগুলি বিকৃতাঙ্গ প্রেতের ছায়া ক্রমে ছোট হইয়া লণ্ঠনের আলোকে মিলাইয়া যায়। লণ্ঠনগুলি এইদিকে আগাইয়া আসিতেছে—সহস্র গ্রহ-উপগ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রতি লোমকূপে প্রত্যাশিত আতঙ্কের সাড়া—প্রতি স্নায়ুতে টাইফুনের বিক্ষোভ—এই আলোড়ন অক্ষিগোলকের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চায়।—তুমুল বাত্যাবিক্ষোভে আর বুঝি দাঁড়াইতে পারা যায় না।…দৃঢ় মুষ্টিতে গরাদ চাপিয়া ধরিয়াছি।

১। আলো।

আপার ডিভিসন ওয়ার্ড

(বাবা)

আপার ডিভিসন ওয়ার্ড

"রাষ্ট্রগগন্‌কী দিব্বিয় জিয়োতী রাষ্ট্রীয় পতাকা নমোমমো"[১]...... সন্ধ্যার কীর্তন ও গান শেষ হইল। ওয়ার্ডার দরজা বন্ধ করিতেছে আর আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে। শ্রোতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আর একজন ওয়ার্ডার।

"এক বাবু এখানে তো আর এক বাবু ওখানে। একজনকে ডাকিয়া ঘরে ঢুকাই তো আর একজন দেখি বাহির হইয়া গিয়াছে। কেহ পায়খানায় গিয়া বসিয়া আছেন; কেহ পূজায় বসিয়াছেন; কেহ বলিলেন, এক মিনিট সিপাহীজী; কেহ বলিলেন, তাসের এ হাতটি শেষ হউক সিপাহী সাহেব। ফুদনবাবুর পায়চারি তো শেষই হয় না: দেখিতেছেন দরজা বন্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি, তবুও ভিতরে ঢুকিবার নাম নাই। হজম করিবার জন্য যদি এত পায়চারির দরকার হয়, তাহা হইলে আর একটু কম খাইলেই তো হয়। বাড়িতে কী খাইতেন তাহা জানি! এখানে আপার ডিভিসন পাইয়াছে বলিয়া কি পেটে 'হাওয়া পানি'র জন্যও একটু জায়গা রাখিতে নাই?"

মেহেরচন্দজীই "রাষ্ট্রগগন্‌কী" গানটির সুর জানেন। আমরা উঁহার সহিত সুর মিলাই মাত্র। এখানে এই গানের নাম "প্রারথানা" (প্রার্থনা)। প্রার্থনার পূর্বে লণ্ঠনগুলি কমাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যহ উনি গানটির একটি লাইন ভুলিয়া যান। সেই সময় লণ্ঠনের শিখা একটু বাড়াইয়া দিয়া পকেট হইতে বাহির করেন, 'আশ্রম ভজনাবলী'। এতদিন হইতে গাহিতেছেন। তাঁহার ছাড়া পাইবার সময় হইয়া আসিল, কিন্তু এখনও উঁহার ঐ লাইনটি মুখস্থ হইল না। অন্য অনেকের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে কিন্তু সকলেই মজা দেখিতে চায়। মেহেরচন্দজী বোঝেন না যে, যখনই ঐ গানের মধ্যে ঐ

১। "জাতীয় গগনের দিব্যজ্যোতি জাতীয় পতাকাকে নমস্কার"।

লাইনটি আসে, আর উনি লণ্ঠন লইবার জন্য হাত বাড়ান, একটি চাপা হাসির শব্দে ঘর ভরিয়া যায়। আমি সেদিন লাইনটি মনে করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। দেখিলাম যে উনি তাহা পছন্দ করেন না। সেইজন্য আর কিছু বলি না।...

...এ ব্যবস্থা বেশ হইয়াছে। "লকআপ"-এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা ও ভজন শেষ হয়। আগে দরজা বন্ধ হইবার পর 'প্রার্থনা' আরম্ভ হইত। কিন্তু দেখিলাম সোস্যালিস্ট পার্টির অনেকেই ইহা ভালবাসে না। ঐ দলের বরহমদেও ও শিউপূজন একদিন প্রার্থনার সময় পাল্লা দিয়া বেসুরো স্বরে অন্য গান আরম্ভ কারিয়াছিল। উহারা যে আমাদের গানে এতদূর বিরক্ত হয়, তাহা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। সেইদিন হইতে বলিয়া কহিয়া প্রার্থনার সময় আগাইয়া দিয়াছি, যাহাতে 'লকআপ'-এর পূর্বেই গান শেষ হইয়া যায়। মেহেরচন্দ, সদাশিউ, ইহারা কিছুতেই রাজী হইবে না। তাহারা বলে, "আমারা ছোট হইব কেন? উহারা যে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত নাকের সম্মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে, লছমীকান্তের মার্ক্সক্লাসের লেকচারের ঠেলায় যে আমাদের ঘুমাইবার উপায় নাই—আমরা কি কিছু বলি? আপনি মাস্টারসাহেব আমাদের অনুরোধ করিবেন না। উহাদের ঠাণ্ডা করিতে বেশি 'তকলিফ উঠাইবার' দরকার হইবে না।" কত বুঝাই। "যাহা করিলে উহাদের সত্য সত্যই অসুবিধা হয়, তাহা আমরা করিব কেন? উহারা যাহা ইচ্ছা করুক, আমাদের দিক হইতে কর্তব্যের ত্রুটি হইতে দিব কেন? উহারা ছেলেমানুষ। তোমাদের আদর্শ মহাত্মাজীর দেখানো পথ। তাহা কত উচ্চে। তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে কেন?" এইরূপ কত বুঝাইবার পর মনে মনে সন্তুষ্ট না হইলেও আমার কথা মানিয়া লইয়াছে। সেইদিন হইতে দরজা বন্ধ হইবার পূর্বেই আমরা সন্ধ্যার প্রার্থনা সারিয়া লই। এখনও উহারা নেহাত ছেলেমানুষ। স্কুল কলেজের ছাত্র। ভলিবল খেলার সময় সেদিন দেখি কমরেড মাধোরাম কমরেড মুরলী মিশিরের বুকের উপর বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। খাবার লইয়া এখনও তাহারা কিচেন ম্যানেজারের সহিত ঝগড়া করে। আজ এর সঙ্গে ওর কথা বন্ধ, কাল ওর সঙ্গে ঝগড়া, এসব তো নিত্য লাগিয়াই আছে। ঐ সব একরত্তি ছেলে ওদের আবার

দোষগুণের বিচার করিতে যাইব আমরা! তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে—এখনও আমরা আমাদের মনের বৃত্তিগুলি সংযত করিতে পারি নাই। আর উহারা তো ছেলেমানুষ। উহাদের ত্রুটি বিচ্যুতি যদি গায়ে মাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের এপথে আসা বৃথা। বিলুও তো ঐ দলের মেম্বার—ওদের প্রত্যেকটি ছেলে যে আমার কাছে বিলুর মতো।...

আজ রাত্রিটা অন্তত যদি বিলুর কাছে থাকিতে পারিতাম। না, এক সঙ্গে না থাকায় ভালোই হইয়াছে। তাহা হইলে হয়তো দুজনেই ভাঙ্গিয়া পড়িতাম—তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথা তো বলিয়া লইতে পারিতাম।...হয়তো কথাই খুঁজিয়া পাইতাম না। ছেলেরা তো কোনো কালেই আমার সঙ্গে, নেহাত কাজের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলে না। আমার সম্মুখে আসিলেই বিলু দেখি সঙ্কুচিত হইয়া যায়,—কেমন যেন জড়সড় ভাব। সপ্রতিভতা উহার চিরকালই একটু কম। ও চিরকালই কুনো। কিন্তু সে দোষ তো আমার শিক্ষা দেওয়ার। উহাদের যেমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি, উহারা তেমনি গড়িয়া উঠিয়াছে। যদি শিক্ষার ত্রুটির জন্যই উহার স্বভাব এমন হইবে তাহা হইলে নীলুর স্বভাব এরূপ হইল না কেন? হইতে পারে যে বিলুকে ইংরাজী কলেজে পড়াই নাই বলিয়া, উহার মধ্যে একটি inferiority complex আছে। নীলু কলেজে পড়িয়াছে, সেই জন্যই বোধ হয়, নীলুর মনের মধ্যে এ ভাব নাই। ছেলেদের বাহিরের ব্যবহারের কথা বলিতে পারি না; তবে আমার ও উহাদের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহার জন্য দায়ী আমি। কোন দিন উহাদের সহিত প্রাণখোলা ভাবে মিশি নাই। কোলে পিঠে করিয়া আদর করি নাই। আমার ধারণা ছিল ছেলেদের সহিত বন্ধুভাব স্থাপন করিলে উহাদের শাসন করা শক্ত। উহাদের সহিত কম কথা বলো, উহারা ভয় ও সমীহ করিয়া চলিবে: উহাদের নাই দাও, মাথায় চড়িয়া বসিবে। এ-বিষয়ে আমি আর কাহারও কথা কোনদিন মানি নাই। ছিলাম স্কুলমাস্টার। অভ্যাসদোষেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, পৃথিবীর সকলক্ষেত্রেই এই শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছি। সেইজন্য রাজনীতিক্ষেত্রেও বড়কে গুরু বলিয়া মনে করি; ছোটকে শিষ্যের দৃষ্টিতে দেখি। কমরেড কোনো দিন হইতে পারিলাম না।...জিতেন যখন

ছোট ছিল, চব্বিশ ঘণ্টা যত্নদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। বাবার মোটা লাঠিটা হাতে করিয়া নাদুস-নুদুস ছেলেটি তাঁহার আগে আগে চলিত—হাটে-বাজারে, ভোজে সর্বত্র। তখন বাবার সঙ্গে আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় আসিয়া, আমার সহিতও দিব্যি আলাপ জমাইয়া লইয়াছিল। পরের ছেলেকে আদর করা, তাহার জন্য লজেনস্ আনিয়া পকেটে রাখা, নিজের ছেলেদের সহিত ব্যবহারের এই পার্থক্য বিলুর মা'র চোখেও অসঙ্গত লাগিয়াছিল। বিলুর মা কম কথার মানুষ। তাহাকে একদিন সে সময় মুখ ফুটিয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, "নিজের ছেলের দিকেও একটু ফিরে তাকিও।" একটু হাসিয়া সেদিন মনের অস্বস্তি দূর করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তখন হইতে যদি ছেলেদের সহিত একটু মেলামেশার সম্পর্ক রাখিতাম, তাহা হইলে আজ তাহাদের সহিত সম্বন্ধ হইত স্নেহ ভালবাসার, ভয়ও সমীহের নয়। নীলু বিলুর আদর আবদার যা কিছু সব মায়ের সঙ্গে। একসঙ্গে খাওয়া বসা, মনের কথাটি বলা, ছোটবেলার মতো এখনও সব সেই রকমের বজায় আছে।......ছেলেদের নাম মনে করিতে গেলে মনে আসে নীলু বিলু—আগে নীলু, তাহার পর বিলু। বিলু বয়সে বড় কিন্তু আগে বিলুর নাম মনে আসে না। কার্তিক গণেশই যেন ঠিক। সব কার্যারম্ভেই গণেশের নাম। কিন্তু আগে গণেশ, তাহার পর কার্তিক বলো তো,—গণেশ কার্তিক, নাম দুইটি যেন আর এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করাই যায় না।......

সদাশিউ আমার মশারি ফেলিয়া দিতে আসিয়াছে। হয়তো ভাবিতেছে আমি জপে বসিব। মশার জ্বালায় কি মশারির বাহিরে পূজায় বসিবার জো আছে। মশার কামড়ে মনের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়। রাত্রে শোবার সময় মশারি ব্যবহার করি না। শরীরকে যত সওয়াও তত সয়। মশার কামড় সহ্য করিবার মতো সহিষ্ণুতা যদি না থাকে, এতটুকু কৃচ্ছ্রসাধন করিবার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহা হইলে বড় কাজ আমাদের দ্বারা কী করিয়া হইবে? বিলুর তো মশারি না থাকায় কত অসুবিধা হয়। ইশারা করিয়া তাহাকে মশারি ফেলিতে বারণ করি। আজ সোমবার। আমার মৌন-ব্রত। মহাত্মাজী করেন "আত্মশুদ্ধির" জন্য। তিনি যে কাজ করা ভালো মনে করেন তাহা কি আমরা না করিয়া পারি! অন্য অন্য সোমবারে

সন্ধ্যার পূর্বে পূজা করিয়া তাহার পর উপবাস ভঙ্গ করি। খাইবার পর কথা বলি। তাহা লক্ষ্য করিয়াই সদাশিউ আমার পূজার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে। ভারি ভালো ছেলে সদাশিউ—সত্য সত্যই সদাশিব। কয়েক বৎসর পূর্বে "বস্ত্র-স্বাবলম্বী" প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম লেখায় ও সেই হইতেই প্রত্যহ অন্তত এক হাজার গজ সূতা কাটে।......

আপার ডিভিসন ওয়ার্ড। প্রকাণ্ড বড় হল ঘর। এখন চৌত্রিশ জন বন্দী এই ঘরে থাকে; উনিশ জন নিরাপত্তা বন্দী ও পনেরো জন রাজবন্দী—যাহাদের সাজা হইয়াছে, কিংবা যাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতেছে। মধ্যের দরজার পাশে আমার সিট। ঘরের মধ্য দিয়া যাতায়াতের রাস্তা, আর তাহাদের দুইপাশে দেওয়াল ঘেঁসিয়া সারি সারি চৌকি। তাহাতে নেটের মশারি টাঙ্গানো। প্রতি তক্তাপোশের পাশে একটি টেবিল, একখানি চেয়ার ও একটি করিয়া বইয়ের শেলফ্। অধিকাংশ চৌকির পাশে মেঝের উপর কম্বল বিছানো। টেবিলের উপর একখানি করিয়া টেবিল-ক্লথ। তাহার উপর আছে আয়না চিরুনি, আরও কত কী। লোহার গরাদ, তালা চাবি, আর ওয়ার্ডারের চেহারা না দেখা গেলে ইহাকে জেল বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই, ঠিক যেন কলেজের ছাত্রদের থাকিবার হোস্টেল। গত আগস্ট মাসে হরিহরজী আর তাহার খুনখুনে বুড়ো বাবাকে আণ্ডার-ট্রায়ালরূপে এখানে ধরিয়া আনে। তখন হরিহরের বাবা মনে করিয়াছিলেন যে পুলিশ তাঁহাকে একটি ধর্মশালায় আনিয়াছে। পরে জেলে লইয়া যাইবে। বৃদ্ধ একবার তাঁহার ছেলেকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে কখন জেলে লইয়া যাওয়া হইবে। তাঁহাকে পুলিশ দিন কয়েক পরে ছাড়িয়া দেয়। ১৯২১-১৯২২এ যখন জেলে আসি, তখনকার জেল আর এখনকার জেলে, আকাশ পাতাল তফাৎ। সেবার ছিলাম সাধারণ কয়েদীর শ্রেণীতে। প্রত্যেক কয়েদীকে কাজ করিতে হইত। "সরকার সেলাম" লইয়া কত গোলমাল। কোথাও যাইতেছ—হঠাৎ মেটের কর্কশ স্বর কানে আসিত "জোড়া ফাইল বান্‌হকর চলো।" পায়খানায় যাইবার সময় পর্যন্ত ঐরূপ লাইন বাঁধিয়া যাইতে হইবে। সকলের হাতে একটি করিয়া লোহার পাত্র। খাওয়া-দাওয়া সব কাজই ঐ পাত্রটি দিয়াই সারিতে হইবে। কথায় কথায়

"ডাণ্ডাবেড়ী" (Bar fetters), "খাড়া হাতকড়া", "চট্টি পেনহাও" (Sackcloth) প্রভৃতি সাজা। তাহার সহিত আজকের অবস্থার তুলনা হয়? চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, থাকা সম্বন্ধে প্রত্যেকটি সামান্য অধিকার পাইবার পিছনে আছে কত ত্যাগ, কত বিস্মৃত শহীদের আত্মবিলোপন। কিন্তু আশ্চর্য ইহাদের বিচার! আমাকে দিল আপার ডিভিসন, আমার স্ত্রীকে দিল আপার ডিভিসন। আমাদের ছেলে বিলুকে ডিভিসন থ্রি।......

চরখাটি লইয়া বসা যাক। মনের উদ্বেগ শান্ত করিতে এমন জিনিস আর নাই। কিছুক্ষণ একাগ্র মনে চরখা কাটিলে দেখিয়াছি স্নায়ুর উত্তেজনা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে। ডাক্তাররা হাসুক, সোস্যালিস্টরা অবিশ্বাস করুক, আমার যে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। চরখাটি লইয়া খুলিয়া বসিলাম। সদাশিউ কী যেন বলিতে চায়। না হইলে দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন? চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করি "কী?" সে আমতা আমতা করিয়া বলে, "আমরা কয়েকজন এখন 'সূত্রযজ্ঞে" বসিতে চাই। আপনার তাহাতে কিছু অসুবিধা হইবে না তো?" ইঙ্গিতে তাহাকে বলি "বসো।" আজকালকার ছেলেরা এত ফর্ম্যালিটি মানিয়া চলে! আশ্চর্য! একসঙ্গে বসিয়া চরখা কাটিবে সে তো আনন্দের কথা। তোমাদের এরূপ সুমতি হইলে তো বাঁচিয়া যাই। ইহাতে আবার আমার মত লইবার কী আছে? আমি তো ইহাই চাই। ভয় তোমাদের লইয়া। সোস্যালিস্টরা তোমাদের তাহাদের দলের সদস্য করিবার জন্য সর্বক্ষণই দেখি ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। তোমাদের উপর ভরসা আর পাই কই?...সন্ধ্যাবেলার ন্যায় প্রাতঃকালেও প্রার্থনা করার প্রস্তাব ইহাদের কাছে তুলিয়া সেদিন কী অপ্রস্তুতই হইতে হইল। মেহেরচন্দকে পর্যন্ত আমার আড়ালে ঠাট্টা করিয়া বলিতে শুনিলাম, দশ আনার খোরাকিতে আর দুইবেলা প্রার্থনা করা পোষায় না। রেশন পাঁচসিকা করিয়া দিক, তাহার পর দুই বেলা "সামূহিক" প্রার্থনা করিব। জিনিসপত্র দুর্মূল্য হওয়ার জন্য শীঘ্রই শুনিতেছি বারো আনা করিয়া 'খোরাকি' হইবে। বাড়িবার পর সপ্তাহে একদিন করিয়া ভোরবেলা প্রার্থনা করিতে পারি। বলে, আর হি-হি করিয়া হাসে। প্রার্থনা না করিতে চাও করিও না। কিন্তু প্রার্থনার কথা লইয়া ঠাট্টা-

তামাশা করিতে লজ্জাও করে না। তোমরা হইলে গান্ধিজীর শিষ্য, সত্যাগ্রহী; তোমরা তো আর নাস্তিক নও। তোমরাও যদি এই সকল বিষয় লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করো তাহা হইলে সোস্যালিস্টদের যাহা মনে আসে তাহা বলিলে দোষ দিব কী করিয়া?

সদাশিউ ও মেহেরচন্দ সারি সারি কম্বল বিছাইয়া দিল। আমার সিট ঠিক ওয়ার্ডের মধ্যখানটিতে। ঘরে ঢুকিতে বাঁ দিকে থাকে মহাত্মাজীর ভক্তের দল অর্থাৎ কংগ্রেসের মেজরিটিপন্থীরা। ইহাদের ছাড়া সেদিকে আছে একজন কম্যুনিস্ট, একজন কিষাণসভার সদস্য। এ দুই জনকে গভর্নমেণ্ট কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে ইহারাই তাহা জানে না। ইহারা তো অন্তরের সহিত বর্তমান যুদ্ধে গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে চায়। ঘরের ডান দিকটিতে থাকে সোস্যালিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা। মধ্যে আমি বাফার—(buffer)। জেল হইতে এইরূপ ভাবে সিটের বন্দোবস্ত করিয়া দেয় নাই। নিজেদের সুবিধামতো অনেক দিনের সিট অদলবদলের ফলে, এইরূপ স্থিতি দাঁড়াইয়াছে। আমার সিটের কাছেই ওয়ার্ডে ঢুকিবার দরজা। দরজার সম্মুখে অনেকখানি স্থান একেবারে খালি। এই স্থানটি একে রাস্তার উপর পড়ে, তাহাতে আবার ইহার ঠিক উপরে পায়রার বাসা। সেইজন্য, এখানে কোনো সিট নাই। এখানেই কম্বল পাতিয়া সকলে চরখা আনিয়া বসিল; রামচন্দর, কিষণদেও, হরিহর, রামদেনী, সদাশিউ, রামশরণ, ভূষণপ্রসাদ, রামলোচন, মেহেরচন্দ। অধিকাংশ নামের প্রথমেই দেখি রাম কথাটি। রামদেনী ছাড়া আর সকলেরই সম্মুখে যারবেদা "চক্র"। আর রামদেনী জেলে আসিয়া চরখা কাটা শিখিয়াছে, রেমিসনের লোভে। থানা রেড, আর খাসমহল কাছারি জ্বালানো, এই দুই অপরাধে বেচারার বারো বৎসর সাজা হইয়াছে। জেল হইতে সে চরখা কাটার কাজ পাইয়াছে। সেইজন্য তাহার সম্মুখে জেলের দেওয়া প্রকাণ্ড "বিহার চরখা"। দুইজন লোকের জায়গা জুড়িয়া আছে। রামদেনী যেদিন প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলে যে, সে জেলের কাজ করিতে রাজী আছে তাহাকে কাজ দেওয়া হউক, সেদিন সকালে উহাকে একঘরে করিবার কথা তুলিয়াছিল। রাজবন্দী আবার কাজ করিবে কী? কিছু

দিন হইতে দেখিতেছি যে আবার সকলে উহার সহিত কথাবার্তা বলা আরম্ভ করিয়াছে। উহারা চরখা আনিয়া বসিতেই, ডান দিকের একটি সিট হইতে চরখার শব্দের নকল করিয়া একজন মুখ দিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল— আর দুই তিন জন হাসিয়া উঠিল। সুখলাল না হইলে আর কে হইবে? না সুখলাল নয়, কমরেড সুখলাল; ছাই মনেও থাকে না। বেশ নকল করিতে ও ক্যারিকেচার দেখাইতে পারে ছোকরাটি।

দুটি লণ্ঠনে এতগুলি লোকের সুতা কাটার মতো আলো কি হয়? কিন্তু আর আলো পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? যুদ্ধের জন্য কেরোসিন তেলের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে। মাথাপিছু তেল দেয় বোধহয় সিকি ছটাক। সেইজন্য কয়েকজন মিলিয়া একটি লণ্ঠন জ্বালাইতে হয়। ওয়ার্ডের বাহিরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে। ওয়ার্ডের ভিতরে কয়েকটি আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিলে কী হয়? গভর্নমেণ্ট কি ভাবে, বুঝি না। উহাদের ভয় যে, ইলেকট্রিক আলো দিলেই কয়েদীদের আত্মহত্যা করার সুবিধা হইবে। সকলেই যেন আত্মহত্যা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যই জেলের যত পুরাতন ইঁদারা আছে সবগুলি কাঠের তক্তা দিয়া মজবুত করিয়া ছাওয়া রহিয়াছে। নজীরের অভাব নাই, কবে কোন আসামী ইঁদারার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এইতো সেদিন কয়েকজনের ব্যাসিলারী ডিসেণ্ট্রী হইবার পর, আমি ডাক্তারকে বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ওয়ার্ডে এক বোতল ইলেক্টোলিটীক ক্লোরিন দিলে, পানীয় জলে সকলে যাহাতে উহা নিয়মিত ব্যবহার করে, তাহার ব্যবস্থা আমি করিতে পারি। ডাক্তারবাবু হাতজোড় করিয়া আমাকে বলিলেন, "মাফ করবেন মশাই, অমন অনুরোধ করবেন না। আর পেন্সন নেওয়ার মাত্র তিন বৎসর দেরি আছে। এরই মধ্যে দুইবার ডিপার্টমেণ্টাল এক্‌শন্ হয়েছে। একবার একজন এক শিশি মালিশের ঔষধ খেয়েছিল; আর একজন ফিনাইল খেয়েছিল। আমার উপর এক্‌সপ্লেনেশন চাওয়া হল কিনা, এতটা ফিনাইল একসঙ্গে কোন কয়েদী পায় কী করে। যেন 'সাফাইয়া' (মেথর) কয়েদীর কাছ থেকে আর কেউ ফিনাইল নিতে পারে না। এ ডিপার্টমেণ্টের কি আর কিছু মা বাপ আছে মশাই?"

একসঙ্গে অনেকগুলি চরখার নানারকম শব্দ শুনিতে ভারি ভালো লাগে। অনেক উঁচু দিয়া যেন এরোপ্লেন উড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। মনে পড়াইয়া দেয় যে সোনার ভারত গড়িয়া তুলিবার পথে আমি একলা পথিক নই। ইহা তো কেবল এত গজ এত হাত সুতা কাটা মাত্র নয়। এখন যে চরখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহা যে রামরাজ্য ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র অস্ত্র। রামরাজ্য হইবে প্রেমের রাজ্য, গৌরাঙ্গের রাজ্য; লোকে হিংসা দ্বেষ ভুলিবে। পরিশ্রম করো; সুখে খাও দাও, থাকো, কাহারো অভাব নাই। প্রত্যেকের গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান। যত গজ সুতা কাটিবে, ততটা লক্ষ্যের নিকট পৌঁছিবে। একজন আর একজনকে সাহায্য করিতেছে, ধনী দরিদ্রকে নিজের বিত্ত বিলাইয়া দিতেছে। গ্রামগুলি আর নিজের প্রয়োজনের জন্য বাহিরের দিকে তাকাইয়া নাই। দরিদ্রের শোষণের সব পথ বন্ধ। কাহারও মুখাপেক্ষী নই তো শোষণ করিবে কেমন করিয়া।...'সূত্রযজ্ঞ' মনে করাইয়া দেয় যে আমার ধরনে তাহা হইলে আরও অনেকে ভাবে। দলে দলে রাজনৈতিক কর্মীরা আমাদের মত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। বোঝো না-বোঝো, মানো না মানো, সোস্যালিস্ট হওয়া তো একটি ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নীলু বিলুর কথাই ধরো না। এই তো ১৯৩০—৩২-এ কত চরখা কাটা, কত রকমের কথা! এমনভাবে উহারা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে আমি কোনদিন ভাবি নাই, যে ঐ উচ্চ আদর্শ উহারা কোনদিন ছাড়িতে পারিবে। যাহারা এখনও আমার মতাবলম্বী, তাহারা চলিয়া গেলে হয়তো আমারই মনে সন্দেহ হইবে যে আমার পথ ঠিক তো? নিজের দেশের বেদ পুরাণ, মুনি ঋষি, ইতিহাস সব গেল—সকলের নজর রুশের উপর। আরে, রুশ কি নিজের দেশের চাইতেও উঁচুতে? দেশ বিদেশের ইতিহাসের কথা আমরাও পড়িয়াছিলাম। ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটন, কোস্থের অমর কাহিনী আমাদেরও রোমাঞ্চ আনিয়া দিত। তাঁহাদের কীর্তির প্রেরণাই তো আমাদের ছাত্রাবস্থায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরবকথা ভুলিয়া যাই নাই। বিবেকানন্দের বাণী ছাড়িয়া মার্কসের বুলির ফাঁদে পড়ি নাই।

মহাত্মাজী অপেক্ষা স্ট্যালিনকে বড় বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। বিদেশী মনীষীদের লেখা পড়িবে না কেন, পড়ো। আমরাও কী বেনথাম, স্পেন্সার, মিল পড়ি নাই? কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে? বিলু যখন প্রথম কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করে, তখনও যদি উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে হয়তো আজ তার এরূপ ঘটিত না। আর বিলুকে শাসন করিতে পারিলে নীলুও হাত হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারিত না। কান টানিলে মাথা আসে। দাদা যাহা করিবে তাহার তো সকল জিনিস নকল করা চাই, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক—সে বুঝুক আর নাই বুঝুক। কিন্তু গায়ের জোরে কি কাহাকেও কোনো মতের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়—আর বিশেষ করিয়া যাহারা নেহাত বুদ্ধিহীন নয়। বিলু হইল বয়স্ক ছেলে—আর তাহাকে করিতে যাইব শাসন? আর কী জন্য?—না, আমার মতের সহিত মত মেলে নাই বলিয়া? তাহার ব্যক্তিত্বের এতটুকু সম্মান যদি আমি না রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পথের সংযম ও সহনশীলতা থাকিল কোথায়? উহারা তো নির্বোধ নয়। আমি যে সকল কথা উহাদের বুঝাইতে পারিতাম, তাহা কি উহারা নিজেরাই বিচার করিয়া দেখে নাই? উহারা যে আমার মতেরই আবহাওয়ায় রাজনৈতিক আশ্রমে মানুষ। উহারা যে এবিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদাভেদও জানে। এসব বিষয়ে কত আলোচনা, কত সময় কত স্থানে শুনিয়াছে। বিলু তো তিনমাস সবরমতী আশ্রমেও ছিল। মহাত্মাজীর পায়ের ধুলা লইবার সুযোগ নীলু বিলু দুই জনেরই হইয়াছে। উহারা পূর্ণিয়া আশ্রমে মহাত্মাজীর সহিত ফটোও তোলাইয়াছিল। হউক অল্পদিনের, তবুও এমন মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহার প্রভাব যাহাদের উপর খাটিল না—সেখানে আমার কিছু করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আর আমি যখন সরকারী স্কুলের হেডমাস্টারির চাকুরি ছাড়িয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে আসি তখন কি কাহারও কথা শুনিয়াছিলাম! পৃথিবীসুদ্ধ লোক বারণ করিয়াছিল। ডি-পি-আই আমার পদত্যাগের দরখাস্ত চাপিয়া রাখিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বুঝাইবার জন্য। পাটনায় সেই সাহেবের কুঠিতে সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি;

দেখিলাম সাহেবের বেহারাটা পর্যন্ত আমার পদত্যাগের কথা জানে। অন্যবার দেখা করিবার কার্ড দিবার সময় বেহারাকে খোশামোদ করিতে হইত। বকশিশ দিতে হইত। আরদালীটি দেখাইত কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব। আর এখন দেখিলাম গড় হইয়া পায়ের ধুলা লইল। "মাস্টারসাহাব শুনতে হেঁ স্বরাজীমে শরীক হুয়ে হেঁ"।[১] আমাকে প্রণাম করিতে পারিয়া, আমার কোন কাজ করিয়া দিতে পারিতেছে বলিয়া, কৃতজ্ঞতায় তাহার মুখ গদগদ হইয়া উঠিয়াছে। বলিয়াই ফেলিল, "আমারও মনের ইচ্ছা স্বরাজীমে যাইয়া আপনাদের কুছ সেবা করি। ছেলেটা আগামী বৎসর 'মিডিল ইমতিহান'[২] দিবে। তাহার পর সাহেবকে বলিয়া উহার একটি চাকুরি করিয়া দিব। তারপর আমিও 'স্বরাজীমে' যাইব।" ডি-পি-আই-এর নেকনজরে আমি ছিলাম। বি-টি পড়িবার সময়, তিনি ছিলেন আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল। সাহেব হাত ধরিয়া বসাইলেন, গুরু শিষ্যের সুরেই কথাবার্তা হইল,—উপরওয়ালা, আর অধস্তন কর্মচারীর মধ্যে যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নয়। আসিবার সময়ও সাহেব বলিলেন, "সান্যাল, ভুল করিতেছ। আবার ভাবিয়া দেখিও!" তখন বলিয়া আসিয়াছিলাম, "এতকাল ভুল করিয়া আসিতেছিলাম, আর করিব না।"...পাড়ার বৃদ্ধ মিত্তির মশাই, কালীবাড়ির পিছনের ইঁটের পাঁজার কাছে লইয়া গিয়া, খুব দরদের সহিত আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, "কেন এসব ব্যাপারে পড়িতেছ। বিয়ে-থা করিয়াছ। স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে। একেবারে আগে পিছে না ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া কি ভালো? ভারতবর্ষের অন্য সব জায়গায় যদি স্বরাজ হয়, তাহা হইলে পূর্ণিয়াতেও হইবে। এ জায়গাটুকু বাদ দিয়া তো আর স্বরাজ হইবে না।" কত লোক কত রকম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। কাহারও কথায় কি আমি কান দিয়াছিলাম? এপথে আসিবার পূর্বে কি কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়াছিলাম? জিজ্ঞাসা করিবার মধ্যে একমাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বিলুর মাকে। তাও ঠিক জিজ্ঞাসা নয়। নিজের সঙ্কল্প স্থির করিবার পর, একরকম জানানো। সে কী ভাবিয়াছিল তাহা জানি না; কেবল বলিয়াছিল, "তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। মেয়ে-

১। "মাস্টারসাহেব শুনলাম স্বদেশীর দলে যোগ দিয়েছেন।" ২। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা।

মানুষের আবার মতামত।" আমি কাহারও মত লইয়া চলি নাই। যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি। আর বিলুইবা আমার মতামত লইয়া চলিবে কেন?......

একটি চরখা হইতে গরুর গাড়ির চাকার শব্দের মতো ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হইতেছে। এই শব্দের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি, কানে বড়ই কর্কশ লাগিতেছে। সিমেণ্টের মেঝের উপর দিয়া একটি ধাতু নির্মিত বাসন টানিয়া লইয়া গেলে, এইরূপ অসহ্য মনে হয়। নরম ঘা'র ওপর দিয়া কেহ যেন শিরীষ কাগজ ঘষিতেছে। জেলে আসিবার পূর্বে আমার এই স্নায়বিক দৌর্বল্য লক্ষ্য করি নাই। আমার সুস্থ স্নায়ুগুলী অল্পতে বিচলিত হয় না, ইহাই ছিল আমার গর্ব। এবার জেলে আসিয়া একি হইল। নিশ্চয়ই রামদেনীর চরখা হইতে এই শব্দ আসিতেছে। আমার হাতের সুতা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া রামদেনীর চরখার দিকে তাকাই। রামদেনীর সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। রামদেনী চরখা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। নিজের সিটের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেছে। সকলেই উহার দিকে তাকাইয়া আছে; বোধ হয় ভাবিতেছে, একি শিষ্টাচারের অভাব! "সামূহিক চরখার"[১] ভিতর হইতে উঠিয়া যাওয়া! রামদেনী ফিরিল, হাতে তেলের শিশি। চরখায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তেল ঢালিয়া দিল। তাহার পর আবার সুতা কাটা আরম্ভ করিল। সকলেই দেখিতেছি সুতা কাটিতেছে আর আমার দিকে তাকাইয়া মধ্যে মধ্যে কী দেখিতেছে; আমার চেহারায় কিছু পরিবর্তন দেখিতেছে কি? আজ কিছুদিন হইতে আমার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব—যে সংশয় চলিতেছে, তাহার ছাপ কি ইহারা আমার চোখে মুখে দেখিতে পাইয়াছে? মনের ভাব কি চাপা যায়? গরমের মধ্যে উপোষ করিয়া হয়তো আমাকে শুকনো-শুকনো দেখাইতেছে। না, উপোষ তো কতদিন হইতে প্রতি সোমবারে করিয়া আসিতেছি, উপোষের জন্য কিছু হয় নাই। ইহাদের সমবেদনার মূল্য কী দিতে পারি? আমি যাহাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও মনের অশান্তি ভুলিতে পারি, সেই জন্যই ইহারা একসঙ্গে চরখা কাটিতে বসিয়াছে। সকলে মিলিয়া আমার বোঝার ভার লইয়া আমার মন হালকা করিতে চায়।......

১। অনেক লোক একত্রে বসিয়া চরখা কাটা।

…মাথাভরা কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে রং, একটু মেয়েলি মেয়েলি লম্বা ধরনের মুখ, চিবুকটি সরু, কালো চোখের গভীর দৃষ্টি ভাবুকতায় ভরা। আমি বিলুর দিকে তাকাইলেই সে চোখ নামাইয়া লয়।…কিন্তু ঐ চোখ হইতেও বজ্রের বহ্নিশিখা বাহির হইতে দেখিয়াছি।……আমার চাকরি ছাড়িবার কিছুদিন আগের কথা। হাইস্কুলের পাশে 'প্ল্যাণ্টারস্ ক্লাব'। দুই কম্পাউণ্ডের মধ্যে তারের বেড়া। ক্লাবে একটি চ্যারিটি মেলা না কী হইতেছে। মেমেরা নানাপ্রকার শৌখীন জিনিসের দোকান খুলিয়াছে। নীলু আর বিলু ঐ তারের উপর চড়িয়া, সাহেব মেমেদের উৎসব দেখিতেছে। নীলু তখন খুব ছোট; বিলু মধ্যের তারটির উপর নীলুকে দাঁড় করাইয়া ধরিয়া আছে। কাঝাকুঠির পেরিন সাহেব হঠাৎ দেখি আমার কোয়ার্টারের গেটের ভিতর আসিয়া ঢুকিল; হাতে ছড়ি, উদ্ধত দৃষ্টি। আমাকে বলিল— 'লেডিজ' স্টল খুলিয়াছে। কম্পাউণ্ডের তারের উপর দিয়া ছেলেরা চব্বিশ-ঘণ্টা হাঁ করিয়া কী দেখে? 'ইউ সি হেডমাস্টার' এ যদি তুমি বন্ধ না করিতে পার, তাহা হইলে আমরা নিজেরাই দেখিব, কী করিয়া এই অসভ্যতা বন্ধ করিতে হয়। তারের বেড়ার উপর উপবিষ্ট, নীলু বিলুর দিকে সাহেব ছড়ি দিয়া দেখাইয়া,—যেমন অশিষ্ট বলদৃপ্তভঙ্গীতে আসিয়াছিল, তেমনি ভাবেই চলিয়া গেল। আমি বিলুকে ডাকিয়া বলিলাম—খবরদার, ওদিকে যেও না। যে বিলু আমার মুখের দিকে তাকাইতে পারে না, তাহার চোখে দেখিয়াছিলাম সুপ্ত পৌরুষের ব্যঞ্জনা। আমার দিকে তাকাইল, যেন চোখ দুইটি হইতে আগুনের ফুলকি ছিটকাইয়া পড়িল। "কেন, ওখানে গেলে কী হয়েছে?" আমাকে জিজ্ঞাসা করা "কেন?" আমার কথার উপর কথা? কান ধরিয়া টানিতে টানিতে উহাকে বাড়ির ভিতর লইয়া গেলাম। উহার মা তখন রান্নাঘরে। "দ্যাখো তোমার গুণধর ছেলের কাণ্ড! সাহেবসুবোর সঙ্গে ঝগড়া করে কি চাকরি থাকে?" পরে আমি আমার ঘরের বারান্দা হইতে শুনিলাম, মা'র সহিত বিলু তর্ক করিতেছে, "কেন? আমাদের জমি থেকে সাহেব মেমের মেলা দেখছিলাম, তাতে হয়েছে কী?……সে রাত্রে বিলু খায় নাই, রাগে কি অভিমানে জানি না। অর্ধেক রাত্রে বিলুর মা আমাকে ডাকিয়া জাগাইল। বিলু তো

বিছানায় নাই। বিলু কোথায় গেল? খোঁজ খোঁজ! চাকর-বাকর, স্কুলের দরওয়ান, আমি, সকলে লাঠি লণ্ঠন লইয়া বাহির হইলাম। বিলুর মা হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে, আর আমাকে দোষ দিতেছে যে ঐ একরত্তি ছেলে মেমদের খেলা দেখিয়াছে, ইহার মধ্যে মেমদের অপমান হইল কোথা হইতে? কোথাও বিলুকে পাওয়া যায় না। শেষকালে একজন বোর্ডিং-এর ছেলে বিলুকে খুঁজিয়া বাহির করিল।—দিনের বেলা যেখান হইতে নীলু আর বিলু মেমদের মেলা দেখিতেছিল, ঠিক সেইখানে তারের বেড়ার উপর বিলু বসিয়া আছে। মেলার আলো কখন নিবিয়া গিয়াছে। বিলু কিন্তু আমার ভর্ৎসনার অন্যায্যতা প্রমাণ করিবার জন্য, তাহার নিজের অকাট্য যুক্তির সহিত কাজের সঙ্গতি রাখিবার জন্য, এই অন্ধকার শীতের রাত্রে একলা এখানে আসিয়া বসিয়া আছে। গায়ে একখানি কচিকলাপাতা রংএর আলোয়ান ছাড়া আর কিছু নাই। খালি পা। হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

জোর করিয়া বিলুকে দিয়া কেহ কিছু করাইয়া লইবে তাহা হইতে পারে না। উহাকে ঠকাইয়া, খোসামোদ করিয়া বা উহার কোমল হৃদয়ের সুবিধা লইয়া, উহাকে দিয়া লোকে যে-কোন কাজ করাইয়া লইতে পারে। কিন্তু গায়ের জোর দেখাও, বিলু রুখিয়া দাঁড়াইবে। মুহূর্তের মধ্যে স্বাভাবিক নমনীয়তা কোথায় চলিয়া যায়। উহার বাল্যকাল হইতেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। বছর কুড়িক আগের কথা হইবে। বিলুর মা'র চীৎকার শুনিয়া, জেলা কংগ্রেস অফিসের ঘর হইতে উঠিয়া, আমার কুটিরের দিকে চলিলাম। শুনিলাম বিলুর মা চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "বল্ শীগ্‌গির —এখনও বল্। তুই নিশ্চয়ই মুসলমানের থুতু খেয়েছিস্। আবার না বলছিস্?" বাড়ি ঢুকিয়া দেখি বিলুর মা খুন্তি দিয়া নীলুকে মারিবার ভয় দেখাইতেছেন। আর এক হাতে একটি নলভাঙ্গা চুনারের টিপট্—তাহার ভিতর সুজি থাকে। রাগের জ্বালায় টিপট্‌টি নীচে রাখিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি শুনিলাম। নীলু বিলু গিয়াছিল বেহবুদ মোক্তারের বাগানে কুল খাইতে। সেখানে বেহবুদ মোক্তারের জামাই উহাদের ধরে। দুইজনকে এক একখানি কুলের পাতার উপর থুতু ফেলিতে-

বলে, আর হুকুম দেয় যে উহা চাটিয়া ফেলিয়া বলিতে হইবে যে আর কখনও স্কুল পাড়িতে আসিবে না। ইহা না করিলে মারিবার ও মাস্টারসাহেবকে বলিয়া দিবার ভয় দেখায়। নীলু ভয়ে ভয়ে থুতু খাইয়াছে—বিলু রাজী হয় নাই। কী সব যেন বলিয়াছে। তাহার পর—বেহবুদ মোক্তারের জামাই উহাদের ছাড়িয়া দেয়। এখন বেহবুদ মিয়ার মেয়ে আসিয়া বিলুর মা'র কাছে নালিশ করিয়াছে যে, বিলুরা তাহার স্বামীকে অপমান করিয়াছে। ইহাতেই সব কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে। বিলুর মা এখনও আসল প্রশ্নে অর্থাৎ কুলচুরি ও অপমান করার প্রশ্নে হাত দেন নাই। এখন তাঁহার নিকট যেটি মুখ্য বিষয় তাহারই উপর জেরা চলিতেছে—নীলু যে থুতুটুকু খাইয়াছে, তাহা সত্যই নীলুর, না বেহবুদ্ মোক্তারের জামাইয়ের।...

চমকিয়া উঠিয়াছি। হো! হো! হো!—সমস্ত ঘরটি কম্পিত করিয়া এতগুলি চরখার সম্মিলিত ঘর্ঘরধ্বনি ডুবাইয়া দিয়া, হাসির রোল উঠিল। আমার ডান দিকে দুইটি সিটের পরে, জানালার পর্দা ও বিছানার চাদর দিয়া ঘিরিয়া একটি ঘরের মতো খাড়া করা হইয়াছে। ইহারই ভিতর হয় সোস্যালিস্ট পার্টির "ক্যাপিটাল" ক্লাস। ফরওয়ার্ড ব্লকের চারজন এ ক্লাসে যোগদান করে না; তাহারা দিনের বেলায় একত্র বসিয়া কী কতকগুলি মার্ক্সিস্ট বই পড়ে। 'ক্যাপিটাল' পড়িতেছে তাহার মধ্যে আবার এত হাসি কিসের? এই গরমের মধ্যে আবার চারিদিকে পর্দা টাঙ্গাইয়া বসিবার দরকার কী? আজকালকার ছেলেদের সবই অদ্ভুত। পর্দাগুলির উপর দিয়া রাশি রাশি কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠিতেছে। উহারা সিগারেট খাইবার সুবিধার জন্য ঐরূপ পর্দা ফেলে না তো? না, সে দিন-কাল কি আর আছে? সিগারেট চুরুট খাইবার জন্য ইহাদের আর কোন আড়াল দরকার হয় না। ওদের দলের কমরেড বাণারসী—বিলুর চাইতে কত ছোট, বিলুর ছাত্র—আমারই সঙ্গে বিলুর সম্বন্ধে আসিয়া গল্প করে,—মুখের কোণে একটি সিগারেট। সকলে জেল-অফিসের পার্সনাল একাউন্ট হইতে টাকা ধার করে, আবার ওদিকে...

"কিৎনে আদমী হ্যাঁয় আপলোগ?"

তাহা হইলে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। নূতন ওয়ার্ডার আসিয়াছে।

ঘেরা পর্দার মধ্য হইতে একজন ওয়ার্ডারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "যাও, চিল্লাও মৎ।" আর একজন বলিয়া উঠিল, এ ওয়ার্ডে আসামী সাড়ে সাতজন। ওয়ার্ডার রাগে গজগজ করিতে করিতে চলিয়া যায়। বলিতে বলিতে যায় "পাউরুটি আর মুর্গীর আণ্ডা খায়—এরা আবার 'মহাত্মাজীর' কাজ করতে জেলে এসেছেন!"

পর্দার ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠে, "বৈজনাথ, শীগ্‌গীর ওঠ্‌। দে তো রাস্কেলটার গায়ে কুঁজোর জল ঢেলে।"

সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠে। কমরেড বৈদ্যনাথ একটি গ্লাস লইয়া পর্দার বাহিরে আসে। রোগা, শুকনো দড়ি পাকানো পাকানো শরীর। পায়জামা পরিহিত। গায়ে পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির কলারটি উঁচু। সোস্যালিস্টদের সকলেই দেখি, "কাপড়া গুদাম"-এর কয়েদী-দরজীকে বিড়ি দিয়া, এইরূপ জামা তৈয়ারী করাইয়াছে। এত গরমেও ইহারা খালি গা করিবে না। এঁরাই আবার পৃথিবীতে সর্বহারার রাজ্য আনিবেন!

এগারোটা বাজিয়াছে। সকলে চরকা কাটা শেষ করিল। টেকো পাঁজ, সব ঠিকঠাক করিয়া উঠিবার জন্য তৈয়ারী হইতেছে। একসঙ্গে দুই ঘণ্টার বেশী চরকা কাটিতে কি সকলে পারে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় হাজারীবাগ জেলে, গান্ধী-জয়ন্তীর দিন, একসঙ্গে আট ঘণ্টা সুতা কাটিবার পর আমার কিডনীর গোলমাল হয়। সেই হইতে আর একবারে বেশী সুতা কাটি না। হয়তো অসুখ করিয়াছিল অন্য কারণে, কিন্তু জেল-ডাক্তারের মত হইল যে একসঙ্গে অতক্ষণ এক অবস্থায় বসিয়া, কিডনীর গোল হইয়াছে! ডাক্তারের মতের উপর তো আর কথা বলা চলে না। সকলে নিজের নিজের সিটে চলিয়া গেল। সদাশিউ ও মেহেরচন্দ দাঁড়াইয়া আছে।

মেহেরচন্দ বলে, "মাস্টারসাহেব, একটু কিছু খান। সারাদিন পিত্ত পড়িয়াছে। আপনার খাবার ঐ টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছে। দুখানি রুটি খান।"

একটি কাগজে লিখিয়া দিলাম যে, এই গরমে আর খাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।

মেহেরচন্দ বলে, 'একটু দই এনে দিই। আমার বাড়ি থেকে আজ দই

দিয়া গিয়াছে। নিজের বাড়ির গরুর দুধের দই। তাহা না হইলে আপনাকে বলিতাম না। আপনি গান্ধীসেবাসঙ্ঘের মেম্বর ছিলেন। মোষের দুধ ঘি খান না, তাহা আর কে না জানে। জেলে তো এইজন্যই দুধ ঘি আপনার খাওয়াই হয় না। যদি বা দৈবক্রমে আমার বাড়ি হইতে আসিয়া গিয়াছে, তাহাও যদি আপনি না খান, তাহা হইলে বড়ই দুঃখিত হইব।"

মেহেরচন্দ নাটকীয় ভঙ্গীতে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে—"এ অনুরোধটা আমার রাখতেই হবে মাস্টারসাহেব! আমার 'ফাদার' সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন দইটুকু"......আবার ফাদার বলিয়াছে! বিহারে যে অল্প ইংরাজীও শিখিয়াছে, সেও মা, বাবা, বোন এই শব্দগুলি নিজের ভাষায় বলিবে না। কাহারও শুনিবে সিস্টার কী সাদি হইবে। কেহ মাথা নেড়া করিয়াছে কারণ জিজ্ঞাসা করো, বলিবে, মাদার কী ডেথ হো গয়ী। কথার মধ্যে ইহারা যে বেশী ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে তাহা নয়। তবে বাবুজী, মা, বহীন এই শব্দগুলি নিজের ভাষায় বলিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে।......

"ফাদার বার বার আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে মাস্টারসাহেব যেন দই খাইয়া দেখেন। একেবারে ঘুঁটের আগুনে জ্বাল দেওয়া দুধের ফাস্টকিলাস দই।" এমন করিয়া অনুরোধ করিতেছে; না বলিবারও উপায় নাই। একটু না খাইলে ইহারা বড়ই দুঃখিত হইবে। ইঙ্গিতে উহাদের স্বীকৃতি জানাই, এমন নাছোড়বান্দা ইহারা। সম্মতি না দিলে একঘণ্টা ধরিয়া আমার কান ঝালাপালা করিত। উহাকে তো আমি জানি। মেহেরচন্দ ও সদাশিউ, দুই জনের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। ও, তাহা হইলে সদাশিউই মেহেরচন্দকে আমার পিছনে লাগাইয়াছিল। নিজে সাহস পায় নাই। বোধহয় বলিয়া গিয়াছিল যে যতক্ষণ না রাজী হন ছাড়িবে না। মেহেরচন্দ গুছাইয়া চরখার বাক্সটি বন্ধ করিল ও উঠাইয়া রাখিল। তাহার পর কম্বলগুলি এককোণে জড় করিয়া রাখিয়া দিল। ঘরের মধ্যে যেখানে জলের ড্রামটি থাকে সেখানে আমার গামছা ও মগ রাখিয়া আসিল এবং খাটের তলা হইতে খড়মজোড়া বাহির করিয়া সম্মুখে দিল। আমার নিজের ছেলেদের নিকট হইতে এত সেবা ও যত্ন কোন দিন পাই নাই। কোনদিন

চাহিয়াছি বলিয়াও মনে পড়ে না। চাকরি ছাড়িবার আগে ছুটিছাটার দিন, নীলু বিলুকে রৌদ্রে খেলা না করিতে দিবার উদ্দেশ্যে, হয়তো পাকা চুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছি।

আর, ১৯২১-এর পর হইতে তো ইচ্ছা করিয়াই কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার সেবা লই নাই। বিলুর মা'র ইহা লইয়া কত কান্নাকাটি, কত অভিযোগ! নূতন খড়মজোড়া চার পাঁচ মাস আগে রামচরিত্তরজী আমাকে প্রেজেণ্ট করেন। তাঁহাকে "না" বলিতে পারি নাই। বেশ পছন্দও হইয়াছিল। পরে শুনিলাম বিষুণদেওজী রামচরিত্তরজীকে বলিতেছেন, "বেল্‌টিংকা চামড়া কিৎনেমে যোগান কিয়া।" রামচরিত্তরজী উত্তর দেন, "চামড়া চার বিড়িমে; আওর লকড়ী ছে বিড়িমে"। বিষুণদেওজী অবাক হইয়া বলে, "এত আক্রা! দশ বিড়িতে তো জেলে 'বিটি' কম্বল পাওয়া যায়। আপনারা বাজার খারাপ করিয়া দিতেছেন।"—তাই বলি! অমন চওড়া, সুন্দর নূতন ধরনের ব্যাণ্ড,—উহা জেলা ফ্যাক্টরীর কম্বলের কলের বেলটিং! অভদ্রতা হইবে বলিয়া খড়মজোড়া ফিরৎ দিই নাই। কিন্তু খড়মজোড়া আজ পর্যন্ত ব্যবহারও করি নাই। রাখিয়া দিয়াছিলাম খাটের তলায়। সদাশিউ আবার টানিয়া বাহির করিল। এমন সংসর্গে আসিয়াছি যে ইহার মধ্যে নিজের নীতি ও সিদ্ধান্ত বজায় রাখিয়া চলাও শক্ত। খড়মজোড়াকে ঠেলিয়া আবার খাটের নীচে রাখিয়া দিই। ড্রামের নিকট গিয়া মুখ হাত ধুই, সদাশিউ হাতে গামছা দেয়। ড্রামের পাশের সীট দাসজীর। তাঁহার নাক ডাকিতেছে। প্রতিবার নিশ্বাস ফেলিবার সময় মুখের ভিতর দিয়া হাওয়াটি বাহির হইতেছে। ইহাতে ঠোঁট দুইটি কম্পিত হইয়া একটি শব্দ উঠিতেছে ফর্‌-র্‌-র্‌-র-র্‌—ঘোড়া ঘাস খাইবার সময় মধ্যে মধ্যে এরূপ শব্দ করে। ভদ্রলোকটি ঠিক সন্ধ্যা বেলায় শোন—আর শোওয়া মাত্র ঘুমাইয়া পড়েন। আর ওঠেন রাত দুইটার সময়। এই গরমের মধ্যেও সন্ধ্যা আটটায় ঘুমান কী করিয়া? রামায়ণ মহাভারতে ইচ্ছামৃত্যুর কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু ইচ্ছানিদ্রা—ইহাও কম সাধনের ফল নয়। সন্ধ্যার পর ঘরে প্রার্থনা হয়, কত চ্যাচামেচি হট্টগোল হয়, তাহাতে তাঁহার নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না।

আমার চৌকির পাশে মেহেরচন্দ দই দিয়া শরবত তৈয়ারী করিতেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"গুড় দিব, না ভুরা দিব? আমার কাছে একটু ভুরা আছে।" তাহাকে ইশারা করিয়া গুড়ই দিতে বলি। একঘটি শরবত তৈয়ারী হইল। সদাশিউ কম্বল পাতিয়া দিল। তাহার সম্মুখের জায়গাটিতে জলের ছিটা দিয়া, সেখানে ঘটি গ্লাস রাখিয়া দিল। আমি এলুমিনিয়মের গ্লাসে এক গ্লাস শরবত ঢালিয়া লইলাম। দই দিয়াছে; শরবত তো নয়—পাতলা দই। জেলের গ্লাসগুলিও অদ্ভুত; জল খাইবার সময় গায়ে আর কাপড়ে নিশ্চয়ই জল পড়িবে। মিষ্টিও দিয়াছে খুব।

মেহেরচন্দ গল্প করিয়া চলে—"সকালে ইণ্টারভিউ ছিল। দুই হাঁড়ি আসিয়াছিল, আর এক হাঁড়ি "গঁদকা-লাড্ডু"[১]। অফিসের লোকদের খাইতে ইচ্ছা না কী কে জানে! জেলর প্রথমে জমাদারকে বলিলেন, কাঠি গুঁজিয়া হাঁড়ির নীচে পর্যন্ত দেখ, দই ছাড়া আর কিছু আছে কিনা। তাহার পর রাখিয়া দাও ডাক্তারসাহেব আসিলে পাশ হইবে। জেলর আমার উপর এরূপ চটিল কেন কে জানে। আর কাহারও বেলায় তো এমন করে না। জমাদারসাহেবকে চারিটি গঁদের লাড্ডু দিয়া, চুপচাপ হাঁড়িটি লইয়া চলিয়া আসিলাম।"

তাহার পর কী মনে হয়। আমাকে বলে—"চিনি দিয়া তৈয়ারী লাড্ডু কিনা, সেইজন্য আপনাকে দিই নাই। আর এক গ্লাস দিই মাস্টারসাহেব?" তাহাকে বারণ করি। এক গ্লাস খাওয়াই শক্ত, তাহার উপর আবার আর এক গ্লাস! মুখ হাত ধুইয়া আবার কম্বলের উপর আসিয়া বসি। মেহেরচন্দ গ্লাস দিয়া ঘটি বাজাইতেছে, আর চ্যাচাইতেছে "চলো, চলো-ও শরবত পিনেবালোঁ!" বিষুণদেওজী ছাড়া আর কেহই লইল না—চিনির শরবত হইলে হয়তো কেহ কেহ লইত। বিষুণদেওজী আধসের আটার রুটি খায়। বয়স কম; স্বাস্থ্য বেশ ভালো। কিন্তু তাই বলিয়া রাত দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, এক ঘটি দই খাইবে নাকি? এই ওয়ার্ডে গুড়ের শরবত কেহ খাইতে চাহে না। আর বিলু? তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরা একটু গুড়, একটি লঙ্কা বা একটা পেঁয়াজ পাইলে কৃতার্থ হইয়া যায়। স্কার্ভির প্রতিষেধক

১। গঁদের আঠা ঘিতে ভাজিয়া আটা ও চিনির সহিত মিশাইয়া এক প্রকার মিঠাই করা হয়।

হিসাবে তাহারা সপ্তাহে দুই দিন একটু একটু আচার খাইতে পায়। এই সৌখীন খাদ্যদ্রব্যটি যে দিন থাকে, সেদিন যেন ভাত খাইয়া তাহাদের পেটই ভরে না! কেবল আচার দিয়াই সমস্ত ভাত খাওয়া হইয়া যায়। ডাল দিয়া খাইবার ভাত কোথায়? বহু কষ্টার্জিত ডালের লঙ্কাটি বৃথাই নষ্ট হইয়া গেল বলিয়া মনে হয়। বিলুর দুই বেলাই ভাত খাওয়া অভ্যাস—এখানে তাহাও পায় কিনা কে জানে? জেলকোড অনুসারে দুইবেলা ভাতের নাম 'বেঙ্গল ডায়েট'। যে ইহা না পায়, তাহাকে সন্ধ্যার সময় দেয় দুই হস্ত পরিধির—রুটি নামক পদার্থ—দুইখানি করিয়া। এই অর্ধসিদ্ধ, দুষ্পাচ্য খাদ্যদ্রব্যটিকে আয়ত্তাধীন করা ভীমভবানী বা গোবরের পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে,—কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে, অসম্ভব।...মনে ইচ্ছা হয়, বিলু জানুক, যে তাহারই কথা মনে করিয়া, এইবার জেলে ফলমূল দুধ এ সকল জিনিস খাই না, মশারি ফেলিয়া শুই না। হয়তো, বিলু এ খবর জানিতে পারিলে, তাহার মনে একটু তৃপ্তি হইত। তাহার বাবা যে তাহার জন্য একটুও ভাবে একথা সে বুঝিতে পারিত। বিলুর যদি ফাঁসির সাজা না হইত, তাহা হইলে হয়তো এতক্ষণ, এইরূপ একটি পর্দা ঘেরা ঘরের মধ্যে বসিয়া, লোকদের 'ক্যাপিটাল' পড়াইত। বিলু এখানে থাকিলে, আর কমরেড লছমী চতুর্বেদীকে এখন গুরুগিরি করিতে হইত না। মনিহারীঘাটে, সেবার উহাদের দলের যে সামার-ট্রেনিং ক্যাম্প খুলিয়াছিল, বিলুই তো তাহার অধ্যক্ষ ছিল। কমরেড বাণারসীও সেদিন চুরুট টানিতে টানিতে আমার নিকট বলিতেছিল, "বিলুবাবুর মতো আমাদের দলে আর কেহ পড়াতে পারে না। সেইজন্যই সেবার যখন শোনপুরে আমাদের প্রাদেশিক সামার-ক্যাম্প খোলে—সেখানে বিলুবাবুর উপর 'ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম' পড়াইবার ভার পড়িয়াছিল। 'অপরচুনিস্ট'দের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল যথার্থ কর্মীদের কথা ধরা যায়, তবে আমাদের দলের 'ইনটেলেকচুয়াল্‌স'-এর মধ্যে বিলুবাবুর স্থান খুব উচ্চে। অবশ্য বিলুবাবু মিলিট্যাণ্ট একটু কম। এইজন্য পার্টির সর্বাপেক্ষা উচ্চ শিখরে উঠিতে পারেন নাই।" কমরেড বাণারসী আরও কত কী বলিয়াছিল—সব মনে রাখাও শক্ত, কথা বলিবার সময় উহাদের

এমন এমন শব্দ ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, যেগুলির আসল অর্থ আমাদের কাছে একরূপ অজ্ঞাত। উহাদের সহিত গল্পের সময় ঠিক থই পাই না। সাধারণ চলতি ভাষায় কি কথাবার্তা বলা যায় না? উহারা বাড়িতেও কি এই ভাষাতেই কথা বলে? আমরাই উহাদের কথা অর্ধেক বুঝি না—উহাদের মা-বোনেরা এসব কথার কী বুঝিবে? সেই যে গল্প আছে না—একজন ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়া ঠিক করিয়াছিল যে তাহার মা'র সঙ্গে ইংরাজী ছাড়া আর কিছুতে কথা বলিবে না। তারপর বেচারা অসুখে পড়িয়া জলতেষ্টায় মারা যায়—'ওয়াটার' কথাটি তাহার মা বুঝিতে পারেন নাই। সেই রকমই হবে আর কি। বিলুও তো তাদের দলের একজন নেতা। তাহার এরূপ ধরনের কথাবার্তা তো কোনদিন আমার কানে পৌছায় নাই। দলের মধ্যে কী সব বলিত তাহা জানি না; কিন্তু বাড়িতে তো তাহাকে অস্বাভাবিক সাম্যবাদী অভিধানের কোন শব্দ ব্যবহার করিতে শুনি নাই। উহাদের পায়জামা আর কলার উঁচু পাঞ্জাবি পরিতেও কোনদিন দেখি নাই। তামাকের গন্ধও উহার গা হইতে কোন দিন পাই নাই। তোমাদের ভাষার 'মিলিট্যাণ্ট' কথার মানে হয়তো আমি ঠিক বুঝি না—যে দেশের জন্য আজ রাত্রে ফাঁসি যাইবে তাহাকে তোমরা বলো মিলিট্যাণ্ট নয়। সে কেন মিলিট্যাণ্ট হইবে—মিলিট্যাণ্ট ঐ শুঁটকো বৈজনাথ—যে খানিক আগে গ্লাস লইয়া বাহির হইয়াছিল, ওয়ার্ডারের গায়ে জল দিবার জন্য। ছি, আমি একি ভাবিতেছি! বিলু মিলিট্যাণ্ট হইলেই যেন আমার গর্বের বিষয়। মহাত্মাজী, আমার প্রণাম গ্রহণ করো। হয়তো বাণারসী ঠিকই বলিয়াছে। বিলু আমার পক্ষপুটে, আশ্রমের আবহাওয়ায় মানুষ। উহার পক্ষে 'মিলিট্যাণ্ট' না হওয়াই স্বাভাবিক…সদাশিউ আমার টেবিলের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে আমার মুখের দিকে তাকাইতেছে। নিশ্চয়ই ভাবিতেছে যে হঠাৎ আমি প্রণাম করিলাম কেন। ইহার একটি মনগড়া অর্থ নিশ্চয়ই করিয়া লইল।

"বিষুণদেও বাবু! বিষুণদেও বাবু!"

বাঁ দিকে দুই তিনটি সিট পরে বিষুণদেওজীর সিট। একটি ওয়ার্ডার তাঁহার সিটের সম্মুখের জানালার বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে।

বিষুণদেওজীর বাহিরে বেশ বড় কারবার আছে—ব্যবসাদার লোক। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বিষুণদেওজী জেলের মধ্যেও বেশ বড় কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। উনি আমাদের কিচেন ম্যানেজার। জেলের কণ্ট্রাক্টরের সহিত উঁহার আলাপ আছে। এই ওয়ার্ডারটি উঁহার ও জেল-কণ্ট্রাক্টরের মধ্যে খবরাখবর ও জিনিসপত্র আদান-প্রদানের কাজ করে। প্রত্যহ জেল-কণ্ট্রাক্টর "রেশন"-এর যে রিকুইজিসন্ থাকে তাহা অপেক্ষা কম জিনিস দেয় ও কাগজের উপর ম্যানেজারের দস্তখত করাইয়া লইয়া যায়, যে সে সব জিনিসই দিয়াছে। তাহার পর রাত্রে এই ওয়ার্ডার আসিয়া অন্যান্য জিনিস দিয়া যায়—যে সব জিনিস রেশনের মধ্যে পড়ে না। জেলের কর্তৃপক্ষও মোটামুটি ব্যাপারটা জানেন, এবং ইহা বন্ধ করিবার জন্য জেলের রসদ গুদাম হইতে শিডিউল অনুযায়ী জিনিস দিবার চেষ্টাও কয়েক বার করিয়াছেন। কিন্তু এই যুদ্ধের বাজারে শিডিউল অনুযায়ী সব জিনিস প্রত্যহ দেওয়া শক্ত। আর না দিলেই ফ্যাসাদ। হয়তো আপার ডিভিসন রাজবন্দীরা অনশনই আরম্ভ করিয়া দিবে। হয়তো লক-আপ হইতে অস্বীকার করিয়া দিবে। গায়ের জোরে এবং লাঠি চার্জের বলে অবশ্য ইহাদের সাময়িক বাগ মানানো যায়। কিন্তু দুই চারিবার এইরূপ ঝগড়া হইলে, ট্যাক্টফুল নয় বলিয়া ডিপার্টমেণ্টে জেলর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বদনাম হইয়া যায়। কিছুদিনের মধ্যে বদলির হুকুম আসে। তাহার উপর মার-ধোর করিয়া জিনিসটি চাপিয়া দিব, নিরাপত্তা বন্দীরা থাকিতে সে উপায়ও নাই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম না হইলে উহাদের উপর লাঠি চার্জ করা যায় না। আর এখন জেলে স্থানাভাব এত বেশী যে নিরাপত্তা বন্দীদের আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা করাও শক্ত। এই সাত-পাচ ভাবিয়া, জেল কর্তৃপক্ষ চাহেন যাহাতে রাজবন্দীরা গোলমাল না করে। একটু-আধটু দেখিয়াও দেখিতেছি না, এই ভাব দেখাইলেই যদি চলে তবে ইহাদের ঘাঁটাইবার দরকার কী? তাঁহাদের কণ্ট্রাক্টরের নিকট হইতে প্রাপ্তির তো ইহাতে হ্রাস বৃদ্ধি নাই। কাজেই সুবিধা হইয়াছে বিষুণদেওজীর। বিষুণদেওজী ও ওয়ার্ডার আস্তে আস্তে কী সব কথা বলিতেছে, ঠিক বুঝা যাইতেছে না। হঠাৎ বিষুণদেওজী জোরে জোরে বলিলেন, "সিপাহিজী, একটু দহির শরবত

খাইবে নাকি?" সিপাহিজী বলিল, "লাইয়ে।" গ্লাসটি গরাদের মধ্য দিয়া বাহির হইল না। "ঠাহরিয়ে, মৈ পিয়ালী লাতা হুঁ।"[১] বিষুণদেও চায়ের কাপে করিয়া, ওয়ার্ডারকে ঘোলের শরবত খাওয়াইতেছে। ও— এইজন্যই সে শরবত লইয়াছিল! তাইতো বলি—হঠাৎ উহার গুড় দেওয়া ঘোলের শরবত খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল কেন। সিপাহিজী চলিয়া গেল। বোধহয় উহার ডিউটি অন্য ওয়ার্ডে। ভূষণজী তাহার বিছানায় মশারি ফেলিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক বিষুণদেওজীর পাশেই তাহার সিট। সে মশারির ভিতর হইতে বলিল, "কেয়া তিক্রম কর্ রহেথে ইয়ার?" নিয়ম বিরুদ্ধভাবে যোগাড়যাগাড় করার নাম ইহারা দিয়াছে 'তিক্রম'। আসলে শব্দটির কোন অর্থই নাই—ওই জেলের মধ্যেই কথাটির সৃষ্টি। বিষুণদেও প্রত্যহ বিড়ি আনায়, আর দিনের বেলায় মেটের হাত দিয়া এই বিড়িগুলি বিক্রি করিতে পাঠায় জেল ফ্যাক্টরিতে। সেখানে সাধারণ কয়েদীরা এই বিড়ি কেনে—দশ পয়সা প্যাকেট। বিষুণদেওজীর ইহাতে বেশ লাভ থাকিয়া যায়। মেসের মেম্বরদের মধ্যে যাহারা হয়তো একটু গোলমাল করিতে পারে, তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গন্ধ-তেল ও অন্যান্য টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস আনাইয়া দেয়। তাহা ছাড়া জেল-গুদামের কয়েদীর সহিতও বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে—দুই বাণ্ডিল বিড়িতে এক গ্লাস ঘি, এক প্যাকেট বিড়িতে আধসের চিনি। বিড়িই জেলের লিগাল টেণ্ডার মুদ্রা। ভূষণজী বিষুণদেওজীকে বলে, "আমাকে এক বাণ্ডিল বিড়ি দাও তো—গরম জামাটা শীতের পর কাচানো হয় নাই। কাল ওটাকে ধোবি-কম্যাণ্ডে পাঠাইতেই হইবে, ইস্ত্রি করিবার জন্য। আর কাল আমার জন্য একটা ফাউন্টেন পেনের কালি আনিতে বলিয়া দিও তো ভাই, কণ্ট্রাক্টরকে।" তাহার পর হাসিয়া উঠিয়া বলে, "আমি হচ্ছি ভাই, ঝপট্টানন্দের দলে।" ঝপট্টানন্দ কথাটির একটি ইতিহাস আছে। বিষুণদেওজী একটি ছড়া তৈয়ারী করিয়াছিল। ছড়াটি ঠিক মনে আসিতেছে না। তবে তাহার ভাবার্থ এই যে—জেলে রাজবন্দীরা সকলেই সিদ্ধপুরুষ। তাহাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর নাম "যোগাড়ানন্দ"। ইহারা

১। "একটু অপেক্ষা করুন, আমি চায়ের পেয়ালা আনিতেছি।"

বিড়ি ও পয়সা ঘুস দিয়া, মিষ্টি কথা বলিয়া জেল ডাক্তারকে খোসামোদ করিয়া ও মধ্যে মধ্যে জেল-কর্মচারীদের সহিত ঝগড়া করিয়া, নানাপ্রকার জিনিসপত্র যোগাড় করেন। ইহাদের নেশার জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া কোন জিনিসের অভাব হয় না। যোগাড়ের ফন্দি-ফিকিরেই থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন "ঝপট্টানন্দে"র দল। "ঝপট্টা মারনা" কথাটার মানে ছোঁ মারা। এই ধরনের বন্দীরা সাধারণতঃ থাকে চুপচাপ নিষ্ক্রিয় ভাবে। মুখে চোখে নিস্পৃহতার চিহ্ন পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু চিল যেমন উঁচু গাছের উপর সমাধিস্থের ন্যায় বসিয়া থাকিলেও, শিকারের উপর ঠিক নজর রাখে, ইহারাও সেইরূপ সব সময় নজর রাখেন—যোগাড়ানন্দরা কে কী করিতেছে তাহার উপর। ঠিক যে সময় কোন জিনিস যোগাড়ানন্দের হাতে পৌঁছায়, সে সময় ঝপট্টানন্দরা, সম্মুখে গিয়া হাজির হন—উহার একটি অংশ দাবী করিতে। 'তিক্রম্' করিতে গিয়া ধরা পড়িলে বিপদ আছে—কিন্তু ঝপট্টানন্দদের কোন বিপদের ভয় নাই। তবে যোগাড়ানন্দদের তুলনায় ইহারা জিনিসপত্র পান কম পরিমাণে। যোগাড়ানন্দরা অল্প অল্প জিনিস অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহাদের দিতে বাধ্য হন—গোলমেলে লোকদিগকে ঠাণ্ডা তো রাখিতে হইবে। তাহার পর বাকী থাকে আর একশ্রেণীর রাজবন্দী; ছড়াতে ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে "বেকুফানন্দ"। ইহাদের সংখ্যাই বেশী। যোগাড় করিবার বা যোগাড়ের জিনিসের অংশ লইবার ইচ্ছা ইহাদেরও ষোল আনার। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কী হইবে—সামর্থ্যে কুলায় না। ইহাদের ভয় যে ধরা না পড়িলেও, অপর সকলে ইহাদের নামে কানাঘুসা করিতে ছাড়িবে না। আর হাতেনাতে ধরা পড়িয়া গেলে তো বদনামের একশেষ। কাজেই এই সব গোলমেলে জিনিস হইতে আলাদা থাকিয়া, সমালোচনার অধিকার রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।...

হট্টগোল করিতে করিতে সকলে ডান দিকের পর্দাঘেরা স্থানটি হইতে বাহির হইল। উহাদের ক্লাস তাহা হইলে শেষ হইল। সারাদিন সময় পায়, তাহা হইলেও ইহারা রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা করিবেই। সকালে তো আটটার আগে ইহাদের কাহারও উঠিবার নাম নাই। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়াও যে ইহারা পড়াশুনা ভুলে নাই, ইহা দেখিয়া সত্যই আনন্দ হয়।

করিতাম মাস্টারি; ছেলেদের পড়িতে দেখিলে সেইজন্য এখনও মনের আনন্দ চাপিতে পারি না। সোস্যালিস্টরা, ফরওয়ার্ড ব্লকের ছেলেরা, কম্যুনিস্ট ও কিষাণ সভার ছেলে দুইটি, সকলেরই পড়ার উৎসাহ দেখি, আর অবাক হইয়া আমাদের পন্থার কর্মীদের সহিত তুলনা করি। ফরওয়ার্ড ব্লকের তিন জন মাত্র তো থাকে এখানে, কিন্তু তাহারাও দেখি কত খরচ করিয়া সেন্সর না-করা মার্ক্সিস্ট বই সব আনাইয়াছে। কম্যুনিস্ট ছেলেটিরও টুকিটাকি বই আনা লাগিয়াই আছে। ইহাদের মতো ঘড়ি ধরিয়া পড়াশুনার ক্লাস করিতে যাও আমাদের মধ্যে, নিশ্চয়ই ছেলে জুটিবে না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো হইয়াই গিয়াছে। সদাশিউ-এর উৎসাহ ও অনুরোধে আমি শীতকালে বেলগাছটির তলায় "রচনাত্মক কার্যক্রম" [1]-এর উপর ক্লাস লওয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। প্রথম সপ্তাহে কিছু ছেলে হইয়াছিল। পরে দেখিলাম থাকিয়া গেল কেবল সদাশিউ, দাসজী, আর রামশরণজী। আর—সি. এস. পি.র রুশবিপ্লবের ইতিহাসের ক্লাশে দেখি লোক ধরে না—আমাদের ছেলেরাও দেখি সেই ক্লাশে বসিয়া আছে।—অবশ্য ইহা অস্বাভাবিক নয়। নীলু বিলুদের দলের প্রোগ্রামের ভিত্তি মানুষের মন আজ যেমন আছে তাহারই উপর; আর আমাদের কার্যক্রমের ভিত্তি, হিংসা লোভহীন আদর্শ মানবমনের উপর। সেইজন্য সাধারণ লোককে উহাদের পথই আকর্ষণ করে বেশী।...

নীলু বিলুর কী পড়ার ঝোঁক! আর আমাদের পন্থার লোকদের? তাহাদের কথা আর বলিয়া কী হইবে? আমি একখানি বই নিয়া বসিলেই বলে—"মাস্টারসাহেব আবার 'ইস্তিহান' দিবেন নাকি?" আমাদের দলের রামচন্দরজী আর হরিহরজী এই দুই জনের একটু পড়াশুনার বাতিক আছে। তাহার মধ্যে রামচন্দরজী পড়েন জলচিকিৎসার বই, আর হরিহরজী পড়েন আসন আর প্রাণায়ামের বই। ইহাদের ধারণা যে গান্ধীজীর মতের উপর যাহাদের আস্থা আছে, তাহাদের আবার পড়াশুনা করিয়া নূতন জানিবার কী থাকিতে পারে? সাধে কি আর নীলু আমাদের ঠাট্টা করে? আমি টুরে বাহির হইবার সময়, বিলুর মা যখন আমার লোহার স্যুটকেসটি গুছাইয়া দেন, তখন কতবার শুনিয়াছি নীলু তাহার মাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে. "মা, পুরোনো

১। গঠনমূলক কার্যক্রম—Constructive programme

'সর্বোদয়'[1] এর ফাইলটি দিয়েছো তো?" লঘুগুরুর জ্ঞান নীলুর ছোটবেলা হইতেই কম। এ বিষয়ে বিলুর সহিত তাহার আকাশ পাতাল তফাত। নীলু চিরকালই একটু উদ্ধত স্বভাবের, রাগিলে উহার জ্ঞান থাকে না।

……বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখি, রান্নাঘরের বারান্দায় বিলুর মা; নীলু ও বিলু অল্প দূরে দূরে বসিয়া রহিয়াছে—যেন একজনের সহিত আর একজনের কোনই সম্বন্ধ নাই। বিলুর মা ও বিলু কাঁদিতেছে। আর নীলু একটি ঝাঁটার কাঠি দিয়া নিকানো মাটির মেঝের উপর, বোধহয় কিছু লিখিতেছে কিংবা আঁকিতেছে। পাশে একটি বঁটি পড়িয়া আছে। কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই লক্ষ্য করিলাম, বিলুর মা কাপড় দিয়া কী একটা যেন ঢাকিবার চেষ্টা করিল। আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ব্যাপারটি বাহির হইয়া পড়িল। বিলুর হাত হইতে দোয়াত উল্টাইয়া পড়িয়া নীলুর "ক্ষীরের পুতুল" বইটির মলাট খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাই নীলু রাগ করিয়া বিলুর মার্সডেনের ইতিহাস বঁটি দিয়া কাটিয়াছে। সত্যসত্যই দুই টুকরা করিয়া কাটিয়াছে—একেবারে দুইটি ছোট ছোট নোটবুকের মতো দেখিতে হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য ছেলে! উহাদের মাও আদর দিয়া দিয়া ছেলেদের মাথা খাইয়াছেন। ছেলে অন্যায় করিয়াছিল; কোথায় আমার কাছে আসিয়া বলিয়া দিবে, তা নয়, আমার কাছ হইতে ব্যাপারটি লুকাইবার চেষ্টা হইতেছিল।

"কেয়া সদাশিউ, ভূমিহার-রাজপুত-জাতীয় মহাসভা কী বৈঠক খতম হুই" —কমরেড বৈজনাথ সদাশিউকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল। লক্ষ্য "সূত্রযজ্ঞে"র উপর। বিহারের গরমপন্থীরা, অর্থাৎ সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভার সদস্যরা, দক্ষিণপন্থীদিগকে এই বলিয়া ঠাট্টা করে যে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কেবল স্থানীয় ভূমিহার ও রাজপুত জাতের পারস্পরিক দলাদলির মুখপাত্র মাত্র। প্রাদেশিক কংগ্রেসে নাকি রাজনৈতিক দলাদলি নাই, দলাদলি আছে জাত লইয়া, আর ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া। কথাটা কতকাংশে সত্য। জেলের মধ্যেও দেখি রামশরণজী আর হরিহরজী জাতের ভিত্তিতে ছোট ছোট উপদল গড়িবার চেষ্টা করেন—বাহিরে গিয়াও যাহাতে তাঁহাদের লীডারগিরি বজায় থাকে। আমাদের দেশে স্বরাজ কি কখনও

১। কাগজ বিশেষ—গান্ধীবাদীদের মুখপত্র।

হইবে? এক এক সময় ঘৃণা ধরিয়া যায়। নীলুর বিলুর দলগুলি যাহা বলে তা'র সবই ভুল নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা কিছুক্ষণ পূর্বে যে সূত্রযজ্ঞে বসিয়াছিল তাহার সহিত জাতীয় দলাদলির কী সম্বন্ধ? আর সদাশিউ না হয় তোমার সমবয়সী; কিন্তু সে যখন আমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে, তখন ইহার অর্থ আমাকেও আঘাত দেওয়া। বয়োজ্যেষ্ঠকে একটু সমীহ করিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত নাকি?

সদাশিউ জবাব দেয়, "চুপ কর্ 'লালদাসিয়া'। কথায় বলে বামুনকে খাওয়াইয়া, রাজপুতকে বাবুসাহেব বলিয়া, কায়স্থকে টাকা দিয়া, আর বাকি সব জাতকে প্রহার দিয়া, যে কোন কাজ করাইয়া লওয়া যায়। কয়টি টাকা পাইলে তো এখনই পার্টি ছাড়িয়া দিতে ইতস্তত করিবে না। তোমাদের কায়স্থদের আর জানি না!"

বৈজনাথ কায়স্থ। মিথিলার কায়স্থদের প্রায়ই পদবী হয় লাল, না হয় দাস। এইজন্য কায়স্থদের সাধারণ লোক অনেক সময় বলে 'লালদাসিয়া'। জমিদারের নায়েব গোমস্তা, পাটোয়ারী প্রভৃতি কাজ ইহাদেরই একচেটিয়া। সেইজন্য গরিব কিষাণদের নিকট ইহাদের জনপ্রিয়তা কম। ইহা হইতেই 'লালদাসিয়া' কথাটির মানে আর কেবল স্থানীয় কায়স্থ নয়—উহার যোগরূঢ় অর্থ দাঁড়াইয়াছে, একটি অর্থলোলুপ পাটোয়ারী মনোবৃত্তিযুক্ত জীব।

বৈজনাথ বলে, "হাঁ, আর একটা প্রবাদ মনে আছে তো? গয়লার দেখা ঘাস, আর বামুনের দেখা দই—দুটি জিনিসেরই বরাত একই রকমের।"

সদাশিউ ভূমিহার ব্রাহ্মণ। সে জবাব দেয়—

"সে তো আমি স্বীকারই করি। দেখলে না আমার দেওয়া দই মাস্টার-সাহেব খেলেন। কায়স্থরা "কহাবতের সচ্চাই" (প্রবাদের সত্যতা) মানিতে রাজী নয় বলিয়াই তো কথা বাড়িয়া যায়।" তাহার পর সদাশিউ টেবিল হইতে নামিয়া বৈজনাথের নিকট গেল। দুইজনে ফিসাফস করিয়া কী সব কথা বলিতেছে। উহাদের আবার হঠাৎ গোপনীয় কথা কী মনে পড়িয়া গেল? আজ বৈজনাথদের দলের একজন নেতৃস্থানীয় কমরেডের ফাঁসি, কিন্তু ইহাদের কার্যকলাপে অন্য দিন হইতে বৈলক্ষণ্য তো কিছু দেখি নাই। সেই

পর্দাঘেরা ক্লাস, সেই হাস্যধ্বনি, মধ্যে মধ্যে ভ্যালু, লেবার পাওয়ার, সারপ্লাস ভ্যালু শব্দগুলি অন্যদিনের মতো আজও কানে আসিয়াছে। আমার বাঁদিকে যাহারা থাকে, তাহাদের জীবনও তো প্রায় অন্যদিনের মতোই দেখিতেছি। কোথাও একটি আঁচড়ও পড়ে নাই। না, হয়তো সকলেই অনুভব করিতেছে —না হইলে, দাসজী ছাড়া আর প্রত্যেকে এখনও জাগিয়া থাকিবে কেন? ভূষণজী, বিষুণদেওজী মশারি ফেলিয়া শুইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের কথাবার্তা তো কিছুক্ষণ আগেই শুনিলাম। উহারা ঘুমায় নাই। অনেক সিটেই মশারি ফেলা, বেশী দূর পর্যন্ত দেখা যায় না—তবে কানে কথাবার্তার গুঞ্জনধ্বনি আসিয়া পৌঁছাইতেছে। অস্কার ওয়াইল্ড-এর সেই Ballad of Reading Gaol-এর ফাঁসির রজনীর লাইন কয়টি মনে পড়িতেছে।

But there is no sleep, when men must weep
Who never yet have wept ;
So we the fool, the fraud, the knave—
That endless vigil kept,
And through each brain, on hands of pain
Another's terror crept…

আমার মনে পড়িতেছে না। কবে মাস্টারি ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি আজকের কথা? এই কয়টা লাইনও যে মনে আছে তাহাই আশ্চর্য! এখন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছি। এখন আর মনে পড়িবে না। পরে হঠাৎ কোনো এক অপ্রয়োজনীয় মুহূর্তে, অপ্রত্যাশিতরূপে মনে পড়িয়া যাইবে। ইহারা সকলে কি ভয়ে জাগিয়া আছে? হয়তো সহানুভূতিতে। না, এ জাগিয়া থাকা ইচ্ছাকৃত নয়। চেষ্টা করিয়াও ইহাদের ঘুম আসিতেছে না। গল্প করিয়া ইহারা মনের গুরুভার লাঘব করিতে চায়। আমার নিজের মনও তো বেশ শান্ত আছে। বোধহয় আমি আমার ছেলেদের যতটা গভীরভাবে ভালোবাসা উচিত, ততটা গভীরভাবে স্নেহ করি না। না হইলেও এখনও আমার মনে সেরকম চাঞ্চল্য নাই কেন? বৈজনাথের সিটের পাশে সদাশিউ আর বৈজনাথ খানকয়েক চেয়ার আনিয়া রাখিল। এত রাত্রে আবার

চেয়ার দিয়া কী হইবে? সদাশিউ তাহার পর আসিয়া আমার খাটের উপর বসিল। আমি নীচে কম্বলে বসিয়া আছি। বৈজনাথ, লছমী চতুর্বেদী, রামপ্রকাশ, গিরধর চেয়ারগুলিতে বসিল। ইহারা সারারাত জাগিবে নাকি? বিলুরও রাত জাগিয়া পড়া অভ্যাস। কতদিন বারণ করিয়াছি। এখন বিলু কি করিতেছে? হয়তো পাগলের মতো সেলের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কি একবার বাবার কথা মনে পড়িবে না? ভয় পাইবার ছেলে সে নয়, কিন্তু না কাটে চরখা, না আছে ভগবানে বিশ্বাস। আজকের রাত্রে, এই দুইটির মধ্যে একটিও থাকিলে মনে কত বল পাইত। স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত জেলের রিলিজিয়াস্ ইনস্ট্রাক্টর। রবিবারে জেলে হিন্দু কয়েদীদের ধর্মোপদেশ দিতে আসেন। আমি হেডমাস্টার থাকার সময়েই পণ্ডিতজী চাকরিতে ঢুকিয়াছিলেন। সেই সূত্রে সেদিন দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বিলু তাঁহার ছাত্র। তিনি দুঃখ করিয়া গেলেন যে, তিনি বিলুর সেলে গিয়াছিলেন। বিলু বলিয়াছে ধর্মোপদেশের কোনো দরকার নাই। পণ্ডিতজী আরও বলিয়াছিলেন যে বিলু অবশ্য তাঁহাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে ভোলে নাই। বিলু সে ছেলেই নয়। আচ্ছা ভগবানে বিশ্বাস করিলে কি সত্যিই সাম্যবাদী হওয়া যায় না? কত গেরুয়াপরা স্বামীজী যে দেখি, ওদের সব দলের কর্মী। তাঁহারাও কি ভগবানে বিশ্বাস করেন না? সেদিন একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেলরের হাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম একখানি পকেট গীতা, বিলুকে দিবার জন্য। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেলর পরের দিন বইখানি ফেরত দিয়া যাইবার সময় বলিলেন, "আপনার ছেলে বলিয়াছেন যে ঐ বইয়ের দরকার নাই, অন্য ভালো বই-টই দেন তো পড়িতে পারি।" আমার কাছে খানকয়েক অন্য বই ছিল। তাঁহাকে সেই বইগুলি বিলুর কাছে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ধর্মপুস্তক দিবার আমার অধিকার আছে। ডিভিসন থ্রি কণ্ডেমণ্ড প্রিজনারকে অন্য বই দিতে হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুম লইতে হয়। সাহেব ভারি লিনিয়েণ্ট আর ভালমানুষ। তিনি আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, কোন জিনিসের দরকার আছে কিনা। কিন্তু প্রিজনার নিজেই তো সাহেবের সম্মুখে বলিলেন, তাঁহার কোন জিনিসের প্রয়োজন নাই।"

ঠিকই বলিয়াছে। এইরূপ কথাই বিলুর নিকট হইতে আশা করিতে পারা যায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শির উন্নত রাখিয়া চলিয়া যাইবে। আমার নাম উজ্জ্বল করিয়া, সকল প্রকার হীনতায় পদাঘাত করিয়া, গৌরবোজ্জ্বল মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি লইয়া নন-মিলিট্যাণ্ট বিলু চলিয়া যাইবে।......

গত মহাযুদ্ধের পরে একটি ব্যঙ্গ চিত্রের কথা মনে পড়িতেছে। "পাঞ্চ"-এ বাহির হইয়াছিল। দুই জন বৃদ্ধ লর্ড তাঁহাদের মেদবহুল সযত্নলালিত শরীর এক অতি এরিস্ট্রক্রেটিক ক্লাবের পুরুকুশনযুক্ত সোফায় এলায়িত করিয়া বসিয়া আছেন। মুখে চুরুট, টেবিলের উপর বোতল গ্লাস। দুইজন পাল্লা দিয়া গল্প করিয়া চলিয়াছেন—কাহার কয় ছেলে যুদ্ধে মারা গিয়াছে। ছেলের মৃত্যুর জন্য কেহ দুঃখিত নহেন—অপরকে পরাজিত করিতে পারিবার গর্বের কাছে, ছেলের মর্মন্তুদ মৃত্যু একটি অতি গৌণ ঘটনা। অথচ তাঁহাদের গর্বের ভিত্তি ঐ ঘটনার উপর। সে কথা কে ভাবে? আমার গর্বও এইরূপই হাস্যাস্পদ। যাহার উপর পিতার কর্তব্য করি নাই, সেই পুত্রের কৃতকর্মের গৌরবের অংশ লইতে আমার মন কুণ্ঠিত নয়।......আমি যদি এ পথে না আসিতাম তাহা হইলে আজ বিলুর কি এ দশা হইত? আমার বাবা সরকারী চাকরি করিতেন; আমি সরকারী চাকরি করিতাম, আমার ছেলেও অন্যান্য গৃহস্থের ছেলের মতো, পড়াশুনা শেষ করিবার পর, অর্থোপার্জন করিত, স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়া ঘর-সংসার করিত। পাড়ার বৃদ্ধ মিত্তির-মশাই ঠিকই বলিয়াছিলেন। বিবাহ করিবার পর, বিশেষ করিয়া যদি সন্তানাদি থাকে, তাহা হইলে, কাহারও নিজের ইচ্ছামত জীবনের গতি চালিত করিবার অধিকার থাকে না। তখন তাহার জীবনটি কেবল তাহার নিজের নয়, তাহার উপর আরও অনেকের দাবী জন্মিয়া গিয়াছে! আমার তো পয়সাও ছিল না, তার কথাও নাই। যাহাদের পয়সা থাকে, তাহারা হয়তো এইরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীপুত্র-পরিবারের জন্য কিছু ব্যবস্থা পূর্ব হইতে করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেই কি কর্তব্য সম্পন্ন হইল? তাহা হইলে ছেলেপিলেরা হয়তো একটু আরামে থাকিতে পারিবে, কিন্তু আরামে থাকাই কি পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য! গার্হস্থ্য জীবনে যে মধুর সম্বন্ধগুলি পরস্পরের মধ্যে গড়িয়া ওঠে, তাহার কি কোন মূল্য নাই? রাজঐশ্বর্যে

রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, সিদ্ধার্থ কী সন্তান ও স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করিয়াছিলেন?

বিলুকে ইংরাজী কলেজে পড়াই নাই। তাহার মা'র একান্ত অনুরোধে ইংরাজী হাই স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াইয়াছিলাম। যদি আমার ইচ্ছায় কাজ হইত তাহা হইলে হয়তো ইংরাজী স্কুলে এতদূর পড়া হইত না। আমার ইচ্ছা ছিল উহাকে বিহার বিদ্যাপীঠে পাঠাই। বিলু ইংরাজী স্কুলে পড়িত বলিয়া, আমাকে নানাপ্রকার কথা, সহকর্মীদের নিকট হইতে শুনিতে হইয়াছে। মহাত্মাজী যখন আমাদের আশ্রমে পায়ের ধূলা দিয়াছিলেন, তখন জয়সোয়ালজীর ভগ্নী, একথা তাঁহার কানেও তুলিয়াছিলেন। ভদ্রমহিলার একটু পাগলামির ছিট আছে। কিন্তু আমি জানি যে তিনি আপনা হইতেই এই সকল কথা মহাত্মাজীকে বলেন নাই। আমারই কোন শুভাধ্যায়ী সহকর্মীর প্ররোচনায় তিনি এই কাজ করেন। মহাত্মাজী এ বিষয়ে আমাকে সে সময় কিছু বলেন নাই। "সবরকমের ছেলেই তো এত বড় দেশে থাকিবে। আমার ছেলেরাও তো আমাকে দোষ দেয়"—কেবল এই কথা বলিয়া হাসিয়া কথাটি উড়াইয়া দেন। আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া যায়। আর এই মন্তব্যের তীব্রতা বিলু ও বিলুর মা বেশ অনুভব করিয়াছিল। সেই জন্য বিলুর ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর তাহার মা ও সে ঠিক করে যে, তাহার কাশী বিদ্যাপীঠে পড়াই উচিত। ইংরাজী কলেজে যাহা পড়িতে পাইত, তাহা অপেক্ষা কি সেখানে কম শিখিয়াছে? নীলু তো বি. এ. পাশ। সে কি কোনো বিষয়ে বিলু অপেক্ষা ভালো জানে? বিলুর দলের অধিকাংশই কলেজে-পড়া, বি. এ., এম. এ. পাশ-করা ছেলে। তবে তাহারা সকলে বিলুর কাছে পড়িতে যাইত কেন? কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায় যে লোকে বিদ্যাপীঠের 'শাস্ত্রী' উপাধিকে তাচ্ছিল্য করে।—যেদিন বিলুর পাশের খবর আসে, আমি চিঠিখানি হাতে করিয়া বিলুর মাকে বাড়ির ভিতর খবর দিতে গিয়াছিলাম। বলিলাম, "আজ হইতে বিলুর নাম পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী।" আমি ভাবিয়াছিলাম, বিলুর মা'র কত উৎসাহ দেখিব। কিন্তু দেখিলাম আমার কথায় একটুও উত্তর দিল না,—মাথা নীচু করিয়া একমনে বড়ি দিতে লাগিল। তাহার পরও অনেক সময়

দেখিয়াছি, পড়াশুনার কথা উঠিলে বিলুর মা সে কথা চাপা দিবার চেষ্টা করে। এই সব নানা কারণে বিলুর মধ্যে inferiority complex আসিয়া পড়িয়াছে। বিলুর মাও মনে মনে ভাবে যে তাহার ছেলের উচ্চশিক্ষা হয় নাই—ছেলের দোষে নয়, দশচক্রে পড়িয়া; আর মুখ্যত আমারই দোষে। সত্যিই বিলুর মতো বুদ্ধিমান ছেলে যদি সুযোগ সুবিধা পাইত, তাহা হইলে হয়তো বড় প্রোফেসার বা বৈজ্ঞানিক হইত। নূতন নূতন গবেষণায় তাহার জগৎ-জোড়া নাম হইত। আর আমি তাহাকে এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি, সেখান হইতে জেলে আসিলেও বিশ্রাম, আরাম ও শান্তি পাওয়া যায়। এমন পরিবেষ্টনীতে সে মানুষ হইয়াছে, যেখানে ফাঁসির হুকুম সামান্য দুর্ঘটনার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। কিন্তু বিলু মূর্খ নয়, তাহার ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে। বড় হইয়া সে নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইয়াছে। এ ছাড়া আর অন্য কী-ই বা করিত?···

চমকিয়া উঠিয়াছি। এমন করিয়া দরজা ধাক্কা দিতে হয়? দরজা বন্ধ আছে কিনা দেখা—এই তো তোমার কাজ। ইহার জন্য এত জোর দেখানোর প্রয়োজন কী? পাশের সিট হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তোড়ো, তোড় দেও।" আর একটি মশারির ভিতর হইতে কে একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে, "তাহা হইলে তো বাঁচা যায়।"

রাত একটার ওয়ার্ডার তাহা হইলে আসিয়া গেল। ওয়ার্ডার আমাকে দেখিতেছে। বড় বড় পাকা গোঁফ—বেশ সুন্দর চেহারা। চোখাচোখি হইতেই, আমাকে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল। তাহার পর বৈজনাথরা চার জন যেখানে চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল, সেই দিকে ফিরিয়া বলিল, "নমস্তে! বাবু সাহেবলোগ মজেমে হৈঁ ন?"

লছমী চতুর্বেদী বলে, "আরে সিংজী যে! অনেক দিন পরে তোমাকে এখানে ডিউটিতে দেখিতেছি। ব্যাপার কী?"

"এক সপ্ত হের ছুটি লইয়া বাড়ি গিয়াছিলাম। কাল জয়েন করিয়াছি। যুদ্ধের খবর-টবর বলুন।"

"আমরা খবর দেব তোমাকে? আমরা থাকি জেলে। কোথায় তুমি

আমাদের বাইরের খবর দেবে, তা'নয় আমাদের কাছ থেকেই খবর শুনতে চাও।"

"হুজুররা 'অংরেজী অখবার'[১] পড়েন। সেইজন্য জিজ্ঞাসা করছিলাম।" তাহার পর ওয়ার্ডার সাহেব আরম্ভ করে যুদ্ধের, শহরের, নিজের দেশের, মহাত্মাজীর যত সব আজগুবি খবর।—মালগাড়ি বোঝাই করিয়া কত শিয়াল আর শকুন যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইতেছে। মহাত্মাজী যেদিন অনশন আরম্ভ করিয়াছেন সেদিন কী জানি কেন হঠাৎ ফট করিয়া লাট-সাহেবের বাড়ির ছাত ফাটিয়া গিয়াছিল; মহাত্মাজীর সঙ্গে লাগিতে গিয়া সেবার রাজকোটের দেওয়ানের কী হইয়াছিল; আরও কত খবর। এই খবরগুলি বলিবার জন্যই সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রথম দিককার প্রশ্নগুলিই ইহারই অবতরণিকা মাত্র। তাহার পর সে বৈজনাথের জানালার বাহিরে বারান্দার উপর বসিয়া পড়ে, বেশ ভালো ভাবে গল্প জমাইবার জন্য। অন্য দিন নাইট ডিউটির সময় কেহ জাগিয়া থাকে না। তখন বড়ই একলা একলা লাগে। ঢুলিয়া, খয়নি খাইয়া, পাহারাদের জাগাইয়া, আর পায়চারি করিয়াও দুই ঘণ্টা সময় যেন কাটিতে চায় না। তাহাদের গল্পর মধ্যে ওয়ার্ডারটি বসিয়া থাকিবে, একথা বোধহয় বৈজনাথের দলের ভালো লাগে না।

বৈজনাথ বলে, "সিংজী, তোমরা দ্বাপরে কিষুণজীর মাকে আর কিষুণজীকে বন্ধ করেছিলে জেলের মধ্যে। আর এ যুগে মহাত্মাজীকে আর তাঁর শিষ্যদের বন্ধ করছো।" "কর্মের খেলা কি খণ্ডাবার উপায় আছে? কিন্তু কিষুণজীকে আর কদিন আটক রেখেছিলাম। আপনাদের যে বাবু কতদিন থাকতে হবে, তার কি ঠিক আছে? এ ছাই যুদ্ধও কোনো দিন শেষ হবে বলে তো মনে হয় না।"

বৈজনাথের দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। সিংজীকে তাহারা ফাঁদে ফেলিয়াছে। "রাধাকিষুণ" বলিলেই সিংজী চটিয়া যায়। সে বলে, "বোলো সীতারাম।" আজ নিজেই নিজের অজ্ঞাতসারে কিষুণজীর নাম লইয়াছে। লজ্জায় হাসিতে হাসিতে, দুই হাতে একবার তালি দিয়া

১। ইংরাজী খবরের কাগজ

সিপাহীজী দৌড়াইয়া এখান হইতে চলিয়া যায়। বৈজনাথরা ডাকে "শোনো শোনো সিংজী, আমাদের ছাড়া পাবার খবর।" কে উহাদের কথা শোনে—সিংজী ততক্ষণে ওয়ার্ডের অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে। ওয়ার্ডারদের হাতে থাকে একটি করিয়া লণ্ঠন। সিংজী তাহার লণ্ঠনটি জানালার সম্মুখে ফেলিয়া গিয়াছে। কমরেড গিরিধর, গরাদের মধ্য দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার লণ্ঠনের তেলটি একটি চায়ের কাপে ঢালিয়া লইল। তাহার পর কাপটি ভিতরে আনিয়া, তেল নিজেদের লণ্ঠনে ঢালিল। আজকালকার যুদ্ধের বাজারে কেরোসিন তেলের বড়ই অভাব…উহারা সকলে ছাড়া পাইবার গল্প করিতেছে! হোমমেম্বারের স্টেট্‌মেণ্টের সুর, আমেরীসাহেব পার্লামেণ্টে কী বলিয়াছেন, কোন্ কোন্ কংগ্রেসকর্মীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এই সকলের ভিত্তিতে তাহারা জল্পনা-কল্পনা, বাদানুবাদ করিতেছে যে, গভর্নমেণ্টের ভাবের কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি না। জেলে আসিয়া প্রথমটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা যায়—কিন্তু কিছু-দিনের মধ্যেই জেলজীবন বড়ই একঘেয়ে লাগে। তাহার পর আরম্ভ হয়—দিনরাত্রি কেবল ছাড়া পাইবার কথা—খবরের কাগজ হইতে তাহার সমর্থনে ও বিপক্ষে প্রমাণ একত্র করা। ফুদনবাবু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ছাড়া পাইবার সমর্থনের প্রমাণ জড়ো করিবার ঠিকা লইয়াছেন। খবরের কাগজ পড়া হইয়া যাইবার পর তাঁহার চারিদিকে কী ভিড় হয়। বিষুণদেওজী এই বিষয়ের উপর তুলসীদাসের অনুকরণে একটি দোঁহাও তৈয়ারী করিয়াছে। প্রত্যহ যেই মেট খবরের কাগজের বোঝা লইয়া ঢুকে, অমনি কেহ না কেহ এই দোঁহাটি আবৃত্তি করে—

"তুলসী ঢুঁরত জেলমে বহ্‌ বড়হিঁয়া অখবার"
জিস্‌মে চর্‌চা সুলহ কী করতি হো সরকার"

অর্থাৎ তুলসীদাস জেলে সেই সুন্দর খবরের কাগজখানি খুঁজিতেছেন, যাহাতে লেখা আছে যে গভর্নমেণ্ট আমাদের সহিত সন্ধির আলোচনা চালাইতেছে।

আজ ছাড়া না পাক, কোনো না কোনো সময়ে তো সকলেই ছাড়া পাইবে। কিন্তু বিলু? বিলুকে তো সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। আমি

বুড়ো হইয়াছি—আমার মধ্যে এখনও বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা কত। আর বিলুর কীই বা বয়স? সারাজীবনই তো এখনও উহার সম্মুখে পড়িয়া ছিল। আর, আমিই ফিরিয়া যাইব—বিলু নয়; বিলুর বিবাহ দিয়া দিলে হয়তো তাহার গান্ধীজীর মতে বিশ্বাস থাকিত। বিবাহের পর জীবনের উদ্দামতা কমিয়া যায়—দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে। তাহা হইলে বোধ হয় বিলু সাম্যবাদের বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াইত না। "সর্বোদয়ে" কাকা কালেলকার সেই প্রবন্ধটিতে, হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়া মোটামুটি ঠিক কথাই বলিয়াছলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যাহাদের স্ত্রী আছে, তাহাদের স্বভাব বেশ নরম: আর যাহারা অ৷ববাহিত বা বিপত্নীক তাঁহারা একটু মারমূর্তি গোছের। জহরলাল, সুভাষ বোস, বল্লভভাই প্যাটেল কেহই ঠাণ্ডা মেজাজে কোনো জিনিস বিচার করিতে পারেন না। না, সাম্যবাদী দলে যোগদান না করিলেও হয়তো বিলুকে বাঁচাইতে পারিতাম না। এ আন্দোলনে কত লোক মারা গিয়াছে, দৈনন্দিন জীবনে যাহাদের রাজনীতির সহিত কোনো সম্বন্ধই ছিল না। মহাত্মাজীর শিষ্যের মধ্যেও তো কত লোক হিংসাত্মক কার্য করিয়াছে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? জন্ম আর মৃত্যু কাহারও হাতের মুঠার মধ্যের জিনিস নয়।...

......সরস্বতীর সহিত বিলুর বিবাহ দিলে বেশ হইত। দুইজনেই সুখী হইতে পারিত। বেশ মেয়ে সরস্বতী। আগস্ট মাসে পুলিশ তাহাকে ধরে। মাস তিনেক পরে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেয়। আবার ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে জেলে আসিয়াছে। উহার সহিত বিবাহ হইলে দুইজনেই রাজনীতি ক্ষেত্রের কাজের সহিত ঘরসংসারও করিতে পারিত। লেনিনও তো বিবাহ করিয়াছিলেন।......

কপিলদেও ও তাহার মা আমার নিকট প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। উহাদের নিজেদেরই বংশে একটু গোলমাল আছে। তাহা না হইলে কি আর ঐ অল্পশিক্ষিত ভূমিহারব্রাহ্মণ-পরিবার বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে দিতে রাজী হইত। আমার অবশ্য ইহার জন্য কোনো আপত্তি ছিল না। বিলুর মা'র মত হইল না। আর বিলুর মত জিজ্ঞাসাই করা হয় নাই। আজকালিকার ছেলে,—উহার মত আমার আগেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

কিন্তু বিলুর মা'রই যখন মত হইল না, তখন আর জিজ্ঞাসা করিয়া কথা বাড়াই কেন? বিলুর মা-ই আমাকে অনেকদিন পূর্বে বলিয়াছিল, যে বিলুর মতে রাজনৈতিক কর্মীর বিবাহের শখ রাখা উচিত নয়। কিন্তু সরস্বতীর সহিত খাসা মানাইত। আজকালকার মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙ্গালী মেয়ে অপেক্ষা সরস্বতী অনেক বেশী কাজের। স্বাস্থ্যও তাহার অনেক ভালো; দেখিতে-শুনিতেও বেশ। এই তো দেখিতে দেখিতে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। কপিলদেওএর মামলা-মোকদ্দমা সদরে লাগিয়াই আছে। আর এই কোর্টের কাজে আসিয়া সে, আশ্রমেই ওঠে। প্রায় প্রতিবারই সে আসিবার সময় সরস্বতীকে লইয়া আসিত। এই সেদিনও, গোলাপী-রংএর শাড়িপরা ফুটফুটে মেয়েটি, গুলাববাগের মেলা দেখিতে যাইবে বলিয়া, গোরুর গাড়িতে চাপিয়া কপিলদেওয়ের সঙ্গে আশ্রমে আসিয়াছে। আমাদের বাড়ির মেয়েরা হইলে ঐ বয়সে ফ্রক পরিত। রান্নাঘরের দাওয়ায় বিলুর মা উহাকে খাইতে দিয়াছেন। দুধের বাটিতে চুমুক দিয়া মেয়ে কাঁদিয়া আকুল। কিছুতেই বলিবে না কেন কাঁদিতেছে। পরে সহদেও আসিয়া বকিয়া-ঝকিয়া খোসামোদ করিয়া আদর করিয়া, কান্নার কারণ বাহির করিল—"দুধঅ ফিকঅ লগইছে"—অর্থাৎ তাহার মোষের দুধ খাওয়া অভ্যাস; গরুর দুধ পান্‌সে লাগিতেছে বলিয়া খাইতে পারিতেছে না।······বিয়ে না হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে। হইলে তো কেবল আর একটি অভাগিনীর সংখ্যা বাড়িত মাত্র! আমারই বোঝা বাড়িত। আরও জড়াইয়া পড়িতাম। তা ছাড়া আমিই আর কতদিন বাঁচিব। তাহার পর নীলু তো আছে। নীলুর আবার থাকা আর না থাকা! সে থাকিয়াও নাই। তাহার উপর নির্ভর করিতে হইলেই হইয়াছে! যা খামখেয়ালী আর দায়িত্বজ্ঞানহীন! এক বিলুর কাছেই সে একটু ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। সে কি আর কাহাকেও মানুষ বলিয়া মনে করে, না আর কাহারও কথায় কান দেয়? ছোটবেলা হইতেই সে শাসনের বাইরে। বড় হইয়া বরঞ্চ শান্ত ও গম্ভীর হইয়াছে। ছোটবেলায় কী ডানপিটেই না ছিল! প্রত্যহ একটা না একটা দুষ্কর্ম লাগিয়াই আছে।······

······সেবার দুর্গাবাবুর একটি পাতিহাঁস কাটিয়া রাঁধিতেছিল, আশ্রমের

পশ্চিমের বাঁশঝাড়ে। দুর্গাবাবু হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া নালিশ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া নীলুর খোঁজে বাহির হইলাম। দুর্গাবাবুর বড় ছেলে সঙ্গেই ছিল। সেই বাড়িতে খবর দিয়াছিল। বাঁশঝাড়ের মধ্যে আসামী বামাল গ্রেফ্‌তার হইল। সঙ্গে পাড়ার আর কয়েকটি ছেলে—আর সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে দুর্গাবাবুর ছোটছেলে নরুও তাহাদের মধ্যে। নীলুকে হাঁস কাটিবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল, "হ্যাঁ, আমরা সকলে মিলিয়া হাঁস মারিয়াছি।"—সে যেন এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। পরে জেরায় বাহির হইল যে, ছুরি আনিয়াছিল নরু—কাটিয়াছে নীলু। কাটিবার পূর্বে নীলু সকলের নিকট হইতে শর্ত আদায় করিয়া লয় যে, কাটিবার সময় বাকি সকলে তাহাকে ছুঁইয়া থাকিবে। সে কাটিয়াছিল ও তাহার পিছনে নরুরা একের পর এক, ছেলেদের রেলগাড়ি খেলার ন্যায় পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।...এত ফন্দীও উহার মাথায় খেলে।

নীলুর বলিষ্ঠ ঋজুদেহ, ভাবুকতাহীন মুখ, বিলুর পাশে যেন মানায় না। আজকাল নীলুকেই দেখিতে বিলু অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়। সে যাহা মনে করিবে, তাহা সে করিবেই। তাহার অদম্য সাহসের সম্মুখে সকল বাধাবিপত্তিই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। নীলুকে কিছু বলিতে ভয় ভয় করে। উহার মুখে তো কিছু আটকায় না। কিন্তু বিলুকে কিছু বলিবার পূর্বে নিজেই ভাবিয়া লই যে আমার কথা ঐ ভাবপ্রবণ মনে কিছু আঘাত তো দিবে না। বিলু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবে না—কিন্তু হয়তো উহার চোখে জল আসিয়া যাইবে। আর নীলু—নীলুতো আমার প্রাণে আঘাত দিবার সুযোগ পাইলে ছাড়ে না! নীলুর যখন কলেজে পড়ার কথা প্রথম উঠিল, আমি বারণ করি নাই। কারণ আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে নীলুর তো ইচ্ছা আছেই; তাহার উপর বিলুর ও বিলুর মা'রও ইচ্ছা সে ইংরাজী কলেজে পড়ুক—সে কাশী বিদ্যাপীঠে পড়িয়া সন্তুষ্ট হয় নাই আর উহার মা বিদ্যাপীঠে পড়াকে, পড়া বলিয়াই মনে করে না।...সব ঠিকঠাক। ইহার মধ্যে নীলু বলিয়া বসিল যে, সে গান্ধী-সেবাসঙ্ঘের পয়সায় কলেজে পড়িবে না। এত কথাও উহার মাথায় খেলে। চাকরি করিবার সময় যে সামান্য টাকাপয়সা জমাইয়াছিলাম তাহা হইতে পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতে খাইতে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। নিজের

টাকা দিয়া আশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়াছিলাম: ইহাতেও অনেক টাকা খরচ হইয়া যায়। তিনবার জরিমানাতেও প্রায় নয়শত টাকা গিয়াছে। অনেক লোকে কংগ্রেসের নাম করিয়া আমাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলে, তাহাও আমি লইতে অস্বীকার করি। অন্যান্য আশ্রমে যেরূপ চাঁদা প্রভৃতি তোলা হয়, আমার আশ্রমে প্রথম হইতেই সে সব নিষিদ্ধ। চাঁদা লইলে আত্মসম্মান রাখাও যেমন শক্ত, নিষ্পক্ষ ও নির্ভীকভাবে কাজ করাও সেইরূপই অসম্ভব। অর্থাভাবে যখন আমার সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় খবর পাইলাম যে গান্ধী-সেবাসঙ্ঘ হইতে আমাকে পঁচাত্তর টাকা করিয়া মাসহারা দেওয়া হইবে। মহাত্মাজী বোধহয় সবই জানিতে পারেন। এ টাকা না পাইলে আমাকে হয়তো আশ্রমের আয়ের উপরেই নির্ভর করিতে হইত। আশ্রমের আয়ই বা কী? দুইখানি গরুর গাড়ি ভাড়া খাটে; দুইটি তেলের ঘানি, একটি "গ্রামোদ্যোগ"[১] ভাণ্ডার, কাপড় কাচা সাবান তৈয়ারী করা, আর কয়েকখানি দৈনিকপত্রের এজেন্সি, ইহাই আয়ের সূত্র। মৌমাছি পোষা ও গুটীপোকা চাষের কাজে কখনও বিশেষ আর্থিকলাভ আমাদের আশ্রমের হয় না। তবে তরকারির বাগান হইতে আশ্রমের লোকের খাওয়ার মতো শাকসব্জি পাওয়া যায়। কিন্তু এত করিয়াও, আশ্রমের যে আয় হয়, তাহা হইতে আশ্রমের ভলাণ্টিয়ারগুলিরই খাওয়া-পরা চলা শক্ত। তাহার উপর যদি আমার সংসারের খরচ, আশ্রমের উপার্জন হইতে চালাইতে হইত তাহা হইলে কোথায় থাকিত আশ্রমের পাঠাগার, আর কী করিয়া চলিত জেলা কংগ্রেসের সাপ্তাহিক পত্রিকা? জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য খরচের সহিত অবশ্য আশ্রমের কোনো সম্বন্ধই নাই। এত সব দুশ্চিন্তা হইতে আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল, ঐ গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের দেওয়া মাসহারা। এই টাকা লওয়ার মধ্যে যে কিছু অপমানজনক থাকিতে পারে তাহা আমার মনেও হয় নাই। এ টাকা আমাকে যে প্রতিষ্ঠান হইতেই দিক, ইহা যে কোনো ক্রোড়পতির দান হউক না কেন, আমি তো জানি যে ইহা মহাত্মাজীর আশীর্বাদ;—তাঁহার সেবকের অসুবিধা হইতেছে ভাবিয়া তিনি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আর নীলু কিনা

১। গ্রাম বা কুটীর শিল্প।

বলিয়া বসিল যে সে কলেজে পড়িবে না—কারণ তাহা হইলে তাহাকে গান্ধী-সেবাসঙ্ঘের টাকা লইতে হইবে! বাপুজীর সেবারকার জয়সোয়াল-জীর ভগ্নীর সহিত কথাবার্তা, সকলেরই মনে ছিল। কেহ জোরও করিতে পারে না। বিলু ও বিলুর মা-ও দেখি, নীলুর মতেরই সমর্থন করেন। আমার দৃষ্টিকোণ দিয়া কেহই দেখি জিনিসটিকে দেখে না। আমার ও আমার পরিবারের মধ্যের ব্যবধান একস্থানে এত গভীর, তাহা আমি পূর্বে ভাবিতেও পারি নাই। বিলুর মা'র সহ্য করিবার শক্তিকেই আমি উৎসাহ-পূর্ণ সম্মতি বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। ছেলেদের অন্য রাজনৈতিক পথ গ্রহণ করার মূলেও হয়তো রহিয়াছে—এই আন্তরিক দ্বন্দ্ব। তাহার পর দেখিলাম নীলু কলেজেও পড়িল—আমার এক পয়সা নেয়ও নাই। কলেজের খরচ যোগাইয়াছিল বিলু। বিহার আর্থকোয়েক রিলিফের কাজ কংগ্রেস-কর্মীদের উপর পড়িয়াছিল। এই কাজের পূর্ণিয়া জেলার একাউন্টেন্ট ছিল বিলু। তাহাতে সে তিরিশ টাকা করিয়া মাসহারা পায়। এই টাকা সে নীলুর পড়ায় খরচ করে। দাদার নিকট হইতে টাকা লইতে নীলুর আপত্তি হইল না—যত সঙ্কোচ আমার টাকা লইতে। এত বড় নির্মম আঘাত আমার জীবনে আর কাহারও নিকট হইতে পাইয়াছি কিনা সন্দেহ।······ অথচ একথা আমি মনে মনে ঠিক জানি যে পড়াশুনার দিক ছাড়া, নীলুকে যে কোনো ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া যাক না কেন সে সেই ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ স্থানে উঠিবেই। আর বিলু শিক্ষকতার লাইন ছাড়া অন্য কোনো দিকে থাকিলে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারিত না। কত ছাত্র এই হাত দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, আর এটুকু বুঝি না? কিন্তু নীলু, তোমার নিজের দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার মর্ম আমি বুঝিতে পারি নাই। তোমার পার্টি আদেশ করিয়া থাকিলে আমার বলিবার কিছু নাই। মহাত্মাজীর আদেশ হইলে আমিও আমার সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কোনো রাজ-নৈতিক পার্টি কি এরূপ আদেশ দিতে পারে? নীলুর ও বিলুর উভয় দলেরই লক্ষ্য এক—কার্যক্রমে হয়তো একটু পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। ইহার ফল কি এতদূর গড়াইতে পারে! গণমতের উপর যে পার্টি নির্ভর করে, তাহার তো একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত জনতাকে অন্য দলের ভুলের কথা বুঝানো

আর বুঝাইয়া ভ্রান্তপথে চালিত জনতাকে নিজের দিকে করা। নীলু, নিশ্চয়ই আদেশ বুঝিতে তোমার ভুল হইয়াছে; আর এই ভুলের ফসল ভোগ করিতেই হইবে। আমি তোমাদের ফর্মুলায় ফেলা যুক্তি বুঝি না সত্য কিন্তু সাদাবুদ্ধিতে যেটুকু বুঝি, তাহা ঠিক কিনা, সে কথা তোমাদের দলের নেতৃস্থানীয়দের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইও। আর এখন তাহা ঠিক হউক বা বেঠিক হউক তাহাতে কী আসে যায়? অন্যায় ও ক্ষতি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। সারাজীবন উঠিতে বসিতে একথা তোমাকে খোঁচা দিবে। তিলে তিলে অনুতাপের জ্বালা তোমাকে দগ্ধাইবে—তবুও তোমার কৃত-কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। একি, নিজের ছেলেকে অভিসম্পাত দিতেছি নাকি? না নীলু, ভগবান করুন তুমি কোনো দিন যেন তোমার ভুল না বোঝ। তুমি তোমার পার্টির আদেশ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছ তাহাই যেন ঠিক হয়; কেন না উহার উপর ভর দিয়াই তুমি এখনও দাঁড়াইয়া আছ। তোমার মনের জোর যত অধিকই হউক না কেন, তোমার যুক্তির ন্যায্যতা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আসিলেই, তুমি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আমি তো জানি, তোমার কাছে তোমার দাদা কী ছিল।

"মহাশয়জী!"

চোখ তুলিয়া দেখি খেদনলালজী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

"ঘুম আসিতেছে নাকি?"

না বসিলেই ভালো। বসিলেই এখন অনর্গল কথা বলিয়া চলিবে! এত বাজে কথা বলিতে পারে ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের তিন ছেলে—স্বরাজ প্রসাদ, স্বতন্ত্রপ্রসাদ, আর সংগঠনপ্রসাদ। আশ্চর্য নামগুলি! নীলু আর বিলু। আমার ছেলেদের নাম অতি সাধারণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া নামকরণ করা হয় নাই। বাবা বিলুকে ডাকিতেন, বলাই বলিয়া—তাহা হইতেই ক্রমে বিলুতে দাঁড়ায়। নীলুকে বোধ হয় বাবা দেখেন নাই। না, যেবার নীলু হয়, সেই-বারইতো বাবা মারা যান। ভাবিয়া চিন্তিয়া নাম রাখাও আবার এক ফ্যাসাদ। খেদনলালজী তাঁহার মেজ ছেলে স্বতন্ত্র প্রসাদকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠিতে অন্যান্য ছেলেদের নামেরও উল্লেখ ছিল। জেল সি. আই. ডি, সে চিঠি কিছুতেই পাশ করিবেন না। তাহার বিশ্বাস কোডে কোনো খবর

পাঠানো হইতেছে। তাহার পর হইতেই সি. আই. ডি-র সহিত ইহার ঝগড়া চলিতেছে। ভালো কথায় বুঝাইয়া দিলেই হইত! তা নয়, দুই জনেই নিজের জিদ বজায় রাখিবে। ভদ্রলোক ছোট ছেলেকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। জিদাজিদির ফলে পরশু সে চিঠি ফেরত আসিয়াছে। চিঠির এক লাইন ছিল—"তোমরা যে এতদিন আমার চিঠি পাও নাই, তাহার উপর আমার কোনো হাত ছিল না। এ চিঠিখানি কিন্তু কোনো উলুর (পেঁচার) বাবাও আটকাইতে পারিবে না।" সে চিঠিও ফেরত আসিল—সঙ্গে একটুকরা কাগজে লেখা সি. আই. ডির নোট "এই কয়েদী চিঠিতে নিজের বাবার সম্বন্ধে কি সব লিখিয়াছে. সেগুলি সন্দেহাস্পদ বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য এই চিঠি পাশ করা হইল না।"

একি, খেদনলালজী উঠিয়া যাইতেছেন যে! এখনি আমার অনুরোধে কম্বলের উপর বসিলেন, আবার এখনি চলিয়া যাইতেছেন। বোধহয় আমি কথা বলিলাম না বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কী মনে করিলেন ভদ্রলোক? ভদ্রলোক গিয়া বৈজনাথের চেয়ারে বসিলেন। বৈজনাথের দল শুইয়া পড়িয়াছে বুঝি? বসিয়া রহিয়াছে খেদনলালজী, সুরজবল্লী বাবু, হরিহরজী, আর রামশরণজী। বোধহয় ইহারা পালা করিয়া রাত্রি জাগিতেছে। জাগিয়া তো বোধ হয় সকলেই আছে। পালা করিয়া চারজন চারজন করিয়া আমার পাশের সিটে আসিয়া বসিতেছে। এই জন্যই বুঝি বৈজনাথের দল কিছুক্ষণ আগে বসিয়াছিল? সদাশিউ আর বৈজনাথের ভিতর সেই যে প্রাইভেট কথা হইতেছিল, তাহা এই জন্যই,—এতক্ষণে বুঝা গেল। ইহারা আমার উপর নজর রাখিতে চায়। পাহারা দিতেছে, পাছে আবার আমি কিছু করিয়া ফেলি। কে ইহাদের বুঝাইবে যে, আমাকে ইহারা যতটা উতলা মনে করিতেছে আমি ততটা উতলা হই নাই। ছেলের উপর আমার যদি অত টান থাকিবে, তাহা হইলে কি বিলুর আজ এই অবস্থা হয়? সদাশিউ আবার গেল কোথায়? আমারই খাটের উপর তো বসিয়াছিল। ও এইতো দেখিতেছি, আমার বিছানার উপরই শুইয়া পড়িয়াছে। বোধহয় উহার তন্দ্রা আসিতেছে! আহা, মশায় উহাকে একেবারে খাইয়া ফেলিল। উঠিয়া বরঞ্চ মশারিটি ফেলিয়া দিই।

আমাকে উঠিতে দেখিয়া সুরজবল্লীবাবু ও হরিহরজী ছুটিয়া আসিলেন—"কেন কেন কী হইয়াছে? ছাড়ুন আমিই মশারি ফেলিয়া দিতেছি। আপনি বসুন!" চ্যাঁচামেচিতে সদাশিউ উঠিয়া বসিল। বেচারা একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছে—ছি ছি এত গোলমালের কেন্দ্র সেই। আবার আসিয়া কম্বলের উপর বসি।

"বসুন সুরজবল্লীবাবু।"

সুরজবল্লীবাবু আমার পাশে কম্বলে আসিয়া বসিলেন। ভারি ভালো লাগে ভদ্রলোককে। এমনিই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তাহার উপর তাঁহার একমাত্র ছেলে গত আন্দোলনে আগস্ট মাসে বন্দুকের গুলিতে মারা গিয়াছে। দশ বছর বয়সের ছেলে। তাহার বাবাকে যখন গ্রেফ্‌তার করিয়া থানায় লইয়া আসে, তখন দলে দলে লোক প্রোসেসন করিয়া থানার দিকে আসিতে থাকে। সেও ভিড়ের মধ্যে আসিয়াছিল, সদরে পাঠাইবার পূর্বে বাবাকে একবার দেখিতে। বাড়িতে তাহার 'দাদী' [১] কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়াছিলেন। মা জানালার ধারে বসিয়াছিলেন। তাহার কিন্তু বেশ লাগিতেছিল। "জয় সুরজবল্লী জী কী জয়"! অগণিত লোকের মুখেই তাহার বাবার নাম। সকলের মুখে তাহার বাবার প্রশংসা। বোম্বাইয়ে মহাত্মাজীর মিটিং হইয়াছে। আজ সকালেই বাবা সকলকে খবর শুনাইয়াছেন যে মহাত্মাজী গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। তাহার পরই হইল বাবার গ্রেফ্‌তার। মুহূর্তের মধ্যে লোকের মুখে মুখে বাবার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাবা মহাত্মাজীর মতো বড় হইয়া উঠিয়াছেন। পুলিশগুলোর উপর তাহার রাগ হইতেছে। কী জানি এই বুঝি তাহারা বাবাকে কিছু করে। জেলের কথাতেও আগে তাহার ভয় ভয় করিত। কিন্তু গত বৎসর তাহার বাবা সত্যাগ্রহ করিয়া জেলে যাইবায় সময় সে দেখিয়াছে, কত গাঁদা ফুলের মালা বাবার গলায়। দাদী তো তাহার পূর্বে বলিয়াছিলেন যে যেই বাবা "ন এক পাই; ন এক ভাই অংরেজকে লড়াইমে"[২] এই "নারা লাগাইবেন", অমনি পুলিশ লাঠির গুঁতোয় জান্ বাহির করিয়া

১। ঠাকুরমা।

২। "ইংরেজদের যুদ্ধে একটি পয়সা বা লোক দিয়াও সাহায্য করিব না"।

দিবে। কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে সময় সে দেখিয়াছিল যে দারোগাসাহেব—অত বড় একজন হাকিম—বাবাকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। দারোগা সাহেবের স্ত্রী তাহাকেও ডাকিয়া খাবার খাওয়াইয়াছিলেন। বাবা কয়েকমাস পরে জেল হইতে ফিরিবার সময় বাক্সে করিয়া কত জিনিস আনিয়াছিলেন। সাবান, পেন্সিল, রুলটানা খাতা। জেলের দাড়ি কামানোর "বিলেড" দিয়া সে ছুরি তৈরী করিয়াছিল। সেই বাক্সর ভিতর সে "বিলাতী দাঁতোয়ান"[১] দেখিয়াছে। নানা[২] মাথা নেড়া করিবার দশ বার দিন পরে, তাঁহার চুলগুলি যে রকম হয়, বিলায়তী দাঁতোয়ানের সাদা রেঁায়াগুলিও ঠিক সেইরূপ দেখিতে। উহার উপর ক্ষীরের মতো দাওয়াই রাখিয়া দাঁতোয়ান করিতে হয়। ছোট বোন ধনখনিয়া এত বোকা যে তাহার গালে ঐ দাঁতোয়ান একটু ঘষিয়া দিলেই সে কাঁদিয়া ওঠে। ছোটবেলায় নানাও তাহাকে ঐ রকম করিয়া দাড়ি ঘষিয়া দিবার ভয় দেখাইতেন·····থানার তারের বেড়ার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। থানার ছাদ দেখাই শক্ত, তো বাবাকে দেখা যাইবে! বেড়া ভাঙ্গিয়া জনসমুদ্র থানার "হাতা"[৩]তে ঢুকিল। ভিড়ের চাপে সে ক্রমেই আগাইয়া যাইতেছে। সুরজবল্লী জী কী জয়! সকলে থানার দিকে দৌড়াইতেছে কেন? তাহার পর।······

তাহার পরের দিন রাত্রে সুরজবল্লীবাবুকে 'লকআপ' এর পর দরজা খুলিয়া জেলের বাহিরে লইয়া গেল। শুনিলাম সদর হাসপাতালে লইয়া যাইতেছে। উহাদের অসীম করুণা—শেষ মুহূর্তে দেখা করাইয়া দিয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার জন্য শ্মশানঘাটেও থাকিতে দিয়াছিল। ছেলেটির বাঁ পা-খানা হাঁটুর উপর হইতে কাটিয়া ফেলিতে হয়, আর তাহার পরই সিভিলসার্জন বুঝিতে পারেন যে সে বাঁচিবে না।······পরের দিন সন্ধ্যায় যখন আবার সুরজবল্লীবাবু আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে যাইতেই সঙ্কোচ হইতেছিল। সেই নির্বাক গম্ভীর ভদ্রলোককে কী বলিয়া প্রবোধ দিব? সেদিন আমিও এইরূপ তাঁহার পাশে গিয়া বসিয়াছিলাম। "বসুন"। অনেকক্ষণ পর কেবল একটি কথা বলিয়াছিলেন—"অল্পক্ষণের

১। Tooth brush ২। দাদামশায় ৩। Compound

জন্য জ্ঞান হয়। তখন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'উঃ, কী গরম জোরে আসে, না বাবুজী?' তাহার পর দুই ঘণ্টার মধ্যেই তো সব শেষ। একি! আমার চোখের কোণে জল আসিয়া গেল দেখিতেছি। না, এ জল আসিয়াছে সুরজবল্লীবাবুর প্রতি সহানুভূতিতে; বিলুর কথা ভাবিয়া নয়। সুরজবল্লীবাবুর চোখেও জল দেখিতেছি। একজনকে কাঁদিতে দেখিলে নিকটস্থ লোকের পক্ষে চোখের জল চাপা বড় শক্ত। ছি ছি, আমার এতটুকু নিজেকে সংযত করিবার ক্ষমতা নাই! এতটুকু সহ্য করিবার শক্তি নাই! মহাত্মাজী, আমার মনে বল দাও। একমাত্র সুরজবল্লীবাবুই আমার মনের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার সহানুভূতি......

বারান্দার উপর দিয়া দৌড়াইয়া কে এই দিকে আসিতেছে? ওয়ার্ডার সিংজী হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া জানালার সম্মুখ হইতে লণ্ঠনটি উঠাইয়া লইল। তাহার পর ধীর পদক্ষেপে গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চলিয়া গেল। দুই এক মিনিট পরে গরাদের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জাফর সাহেব—অ্যাসিস্টেণ্ট-জেলর। আমাদের সকলকে হাসিয়া আদাব করিলেন; তাহার পর আর অন্য কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইনি আসিয়াছিলেন রাত্রের রাউণ্ডে। এক একদিন এক একজন অ্যাসিস্টেণ্ট জেলরের ডিউটি থাকে। এইজন্য ওয়ার্ডার আসিয়া লণ্ঠন লইয়া গেল।......

আচ্ছা, সুরজবল্লীবাবুকে দাহকার্যের জন্য যেরূপ শ্মশানে যাইতে দিয়াছিল আমাকেও কি সেইরূপ যাইতে দিবে? বোধ হয় দিবে না। দিলে আমাকে নিশ্চয়ই পূর্বেই খবর দিত। দিলে, বিলুর মুখখানি একবার শেষবারের মতো দেখিয়া লইতে পারিতাম। দেখিবারই বা কী আছে? হয়তো সেদিকে তাকাতেই পারিব না। না না, বিলুর যে সুন্দর ঢলঢলে মুখ আমার মনে গাঁথা আছে, সেই মুখই ভালো। সেই স্বাভাবিক পরিচিত মুখই আমার হৃদয়ে থাকুক। আবার কী না কী দেখিব! তবে কাল একবার বাহিরে যাইতে পারিলে, নীলুর সহিত দেখা হইত। উহার সহিত দেখা হওয়া এখন একান্ত দরকার। তাহার মনের এখন যা অবস্থা! শেষকালে কী করিতে কী করিয়া বসে এই আমার ভয়। একজন তো

গিয়াছে। আর একজনের ভাগ্যে কী আছে, ভগবান তুমিই জান। আমার তো যাহা হইবার হইল—ভাবনা বিলুর মাকে লইয়াই। সে তো নিশ্চয়ই নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। জেলের ভিতর কোনো খবর পৌঁছাইতে কি দেরী লাগে! সব খবরই সে পাইয়াছে। নীলুর সাক্ষ্য দিবার কথাও হয়তো সে জানে। সে কী করিয়া এ আঘাত সহ্য করিবে? রাজনীতির বন্ধুর ক্ষেত্র সে ইচ্ছা করিয়া বাছিয়া লয় নাই। বানভাসির মতো ভাসিয়া আসিয়াছে মাত্র। তাহার স্বাভাবিক ক্ষেত্র একটি ঘরকন্যার সংসার, নিবিড় সুখে ভরা, অতি দরদের সহিত নিজহাতে গড়িয়া তোলা। যে গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বাহিরের কোনো বাত্যাবিক্ষোভ পৌঁছায় না, যে গৃহ-প্রাচীর বিরাট অনুপলব্ধ জগতকে সীমায়িত, প্রত্যক্ষ ও নিশ্চিত করিয়া দিয়াছে, তাহাই ছিল উহার কাম্য। সেখান হইতে একরকম জোর করিয়াই, আমি উহাকে এক অস্পষ্ট লক্ষ্যের কণ্টকময় পথে লইয়া আসিয়াছি। মুখ ফুটিয়া না বলিলেও সে ইহা সহ্য করিতে পারিবে কেন? বিলুর মা অনেক সহ্য করিয়াছে; কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। উহাকে কি কাল দাহকার্যের সময় যাইতে দিবে? না যাইতে দিলেই ভালো। কর্তৃপক্ষ হয়তো কাহাকেও যাইতে দিবে না। হয়তো মিলিটারি লরিতে করিয়া শবদেহ লইয়া যাইবে। আর বোধ হয় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বিশেষ খাতির করিয়া ব্রাহ্মণ ওয়ার্ডারদের দিয়া দাহকার্য করাইবে। জেলের চারিদিকে আজ কি সশস্ত্র পুলিশের পাহারা পড়িয়াছে? তাহারা বোধহয় এতক্ষণ প্রাচীরের চতুর্দিকে টহল দিতেছে। বৃথাই পরিশ্রম করিতেছে। এত সতর্কতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বাহিরের আবহাওয়া কিরূপ জানি না; জেলের ভিতরে তো বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ ও কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। সবই অন্য দিনের মতো চলিয়াছে।...... সকালে হয়তো জেলগেটে খুব ভিড় হইবে। হুকুম অমান্য করিয়াও বোধ হয় কেহ কেহ শোকসভা করিবে। হয়তো শহরে হরতাল হইবে। কিন্তু আমার ক্ষতির তো তাহাতে কিছু পূর্তি হইবে না। বিলুর মাকে পর্যন্ত সান্ত্বনা দিবার লোক কেহ নাই। তাহার ছোট বোন থাকে বৃন্দাবনে। সে তো সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। বোনপোদের সহিত ভালো করিয়া

পরিচয় পর্যন্ত তাহার নাই। আর বিলুর মামা সরকারী কর্মচারী; এমনিই তো একটু ছাড়াছাড়া ভাব। ৺বিজয়া দশমীর প্রণামী চিঠিটি পর্যন্ত আসে না। তাহার উপর আবার এই কাণ্ড। ইহার পর তো সে চাকরির খাতিরে আমাদের সহিত আত্মীয়তার কথা স্বীকার করিবে না।...নীলু বিলু কেহই মামার বাড়ি যাইতে চায় না। বড় হইয়া একবার গিয়াছিল। হঠাৎ একদিন দেখি চলিয়া আসিয়াছে। কেন চলিয়া আসিল কিছুই বুঝা গেল না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম। উহাদের মামা, আমার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আমি একজন 'পারফেক্ট ভ্যাগাবণ্ড'। উহারা আমার সেই অপমান সহ্য করিতে পারে নাই। সত্যই তো—তাহার দৃষ্টিতে আমি ভ্যাগাবণ্ড ছাড়া আর কী? সংসার সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞান আমার নাই, অর্থোপার্জন করি না, আর হৈ-হৈ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই। হিসেবী লোক ইহাকে ভ্যাগাবণ্ড বলিবে না তো, ভ্যাগাবণ্ড আর কাহাকে বলে? সাধারণতঃ উহারা আমাদের জানে পাগল বলিয়া। যখন একটু প্রশংসা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে, তখনই বলে ভ্যাগাবণ্ড। বিলাতে আগেকার কালে যে সব 'ভ্যাগ্রান্সি' আইন ছিল, তাহার মধ্যে আমরা ঠিকই পড়িতাম। এখানে এখনও অনায়াসে আমাদের নামে বি. এল. কেস চলিতে পারে। ১৯২১—২২ সালে অনেক বড় বড় কংগ্রেস নেতার বি. এল. কেসে সাজা হয়।...ছেলে-পিলেরা এত ভাবপ্রবণ হয়! আমি হইলে তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। আর নীলুর কথাই বলি—নিজে তো বাবাকে যা সমীহ করিয়া কথা বল তাহা বাড়ির সকলেই জানে। অন্য লোকে কিছু বেফাঁস বলিয়াছে, আর কি রক্ষা আছে? তবে হ্যাঁ, একথা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিব যে, এখনও আমার সম্মুখে সে কিছু বলে না। আমার মুখের উপর জবাব আজ পর্যন্ত সে কোনোদিন দেয় নাই।

যাই একটু মুখে জল দিয়া আসি। বসিয়া বসিয়া পিঠে কোমরে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছে। নিজের শরীরের কথা কি লোকে ইচ্ছা করিয়া মনে করে—উহা যে মনে করাইয়া দেয়। উঠিতেই সুরজবল্লীবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "কী, কোথায় চললেন?"

বলিলাম, "ড্রামে, একটু মুখ হাত ধুয়ে আসি।"

একটি এরোপ্লেনের শব্দ কানে আসিতেছে। ইহাদের যাতায়াতের আর বিরাম নাই। যাহাদের শত শত লোক যুদ্ধে মরিতেছে, তাহারা একটা প্রাণের মূল্য কী বুঝিবে! আমার চোখে, বিলু আমার ছেলে, কিন্তু উহাদের চোখে? যুদ্ধকালে কি অন্য সময়ের বিচারের সাধারণ মান বজায় রাখা চলে? আজ সাধারণ নাগরিক, রক্তমাংসে গড়া বিচারবুদ্ধিশীল মানুষ নয়,—আজ তো তাহার পরিচয় আইডেনটিটি কার্ডএ, রেশন টিকিটের নম্বরে। যুদ্ধরত সৈনিকদের কথা ছাড়িয়া দাও। সর্বত্রই স্বাভাবিক জীবন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। পূর্বে দুই একখানা এরোপ্লেন চলিয়া যাইলে লোকে চোখ তুলিয়া দেখিত, এখন তিন ডজন বোমার একত্র গেলেও কেহ তাকাইয়া দেখে না। যখন বোমা পড়িতেছিল তখন কলিকাতার লোকেরা কি এইরূপ উদাসীনতার সহিত ব্যাপারটিকে লইয়াছিল? তাহারা কি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই? লোকদের এখন বিলুর কথা ভাবিবার অবকাশ কোথায়? লোকেরাই যদি না ভাবিল, তাহা হইলে গভর্নমেণ্টের কী মাথা ব্যথা পড়িয়াছে? বিলুদের দল ঠিকই বলে—কাহার হৃদয় পরিবর্তন করিবে? হৃদয় থাকিলে তো তাহা পরিবর্তিত হইবে! কিন্তু একথা তো ঠিক যে, হিংসা যত বাড়াইবে, অপরপক্ষের দমনও ততই বাড়িবে। অতটা দমন সহ্য করিবার শক্তি কি দেশের লোকের আছে? লক্ষ্যে পৌছিবার আকাঙ্ক্ষা কতটা তীব্র, তাহার মাপকাঠি হইতেছে যে তাহার জন্য কতটা ত্যাগ করিতে দেশ প্রস্তুত আছে। এই সোজা কথাটা বিলুরা বোঝে না। ঝাঁপাইয়া পড়িবার আগে, নিজেদের সামর্থ্যও তো বিচার করিতে হয়।

মুখহাত ধুইয়া, গামছা দিয়া মুখ মুছি। একি, দাসজী উঠিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি! আমার মুখহাত ধুইবার ও কুলকুচার শব্দে উহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলাম না তো? না, বোধহয় তিনটা বাজিয়া গেল। ভদ্রলোক প্রত্যহ রাত তিনটায় ওঠে। তাহার পর কি শীত কি গ্রীষ্ম আধঘণ্টা টবে বসিয়া থাকিবে। অনেক খরচ করাইয়া জেল ফ্যাক্টরি হইতে জলচিকিৎসার টব তৈয়ারী করাইয়াছে। কতকটা ইজি-চেয়ারের মতো দেখিতে। তাহার মধ্যে গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া বসিবে, আর মুখ দিয়া একটি শব্দ করিবে। গাড়ুর নল দিয়া জল ঢালিবার সময় যেরূপ শব্দ হয়, আওয়াজটি সেই

ধরনের। বিছানার চাদর টাঙাইয়া টবের চারিদিকে একটা পর্দা করিয়া লইয়াছে। বাথ লওয়া শেষ হইলে, তাহার পর করিবে শীর্ষাসন। আধ ঘণ্টার উপর মাথা নীচের দিকে, পা উপর দিকে করিয়া, নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া থাকিবে; আমার ভয়ই করে, কোনদিন আবার নাক মুখ দিয়া রক্ত না বাহির হইয়া যায়।

নিজের সিটে ফিরিয়া আসিলাম। স্থরজবল্লীবাবু বসিয়া আছেন। বিলু এখন কী করিতেছে? বোধহয় ভয়ে চিন্তায় জর্জরিত হইয়া সেলের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। আমার কথা কি উহার একবার মনে পড়িবে? আমার সম্বন্ধে বিলু শেষ মুহূর্তে কি ভাবিয়া গেল, তাহা যদি জানিতে পারিতাম! নীলুকে সে দোষ দিবে না; তাহাকে সে ক্ষমা করিবে, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। এখন তাহার মনের অবস্থা যে কী হইতেছে তাহা ভগবানই জানেন। হয়তো পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে। উস্কোখুস্কো চুলগুলি হয়তো দুই হাত দিয়া ছিঁড়িতেছে। হয়তো গরাদের উপর মাথা ঠুকিতেছে। হয়তো ছেলেমানুষের মতো ওয়ার্ডারকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। না না, বিলু কি কখনও এমন করিতে পারে? দুঃসহ মর্মবেদনায় তাহার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও তাহার মুখে সে ভাব প্রকাশ পাইবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহার আদর্শের যোগ্য সম্মান যাহাতে বজায় রাখিতে পারে, তাহার চেষ্টা সে করিবে। স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখাইবার জন্য, সে জোর করিয়া শেষ মুহূর্তে মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিবে; জেলরকে হয়তো কৌতুক করিয়া কিছু বলিবে; সিঁড়ি দিয়া মঞ্চে চড়িবার সময়, হয়তো অফিসারদিগকে ধন্যবাদ দিয়া যাইবে, এমন সুন্দর প্রত্যূষে শুকতারাটিকে সাক্ষী রাখিবে তাহাকে ফাঁসি দিবার জন্য; কিন্তু সে কিছুতেই দুর্বলতা দেখাইয়া তাহার নাম কলঙ্কিত হইতে দিবে না। আমার ছেলে, আমার বড় ছেলে, তাহাকে আর আমি চিনি না! সাধে কি আর সবাই বিলুকে ভালবাসে? হরদার দুবে দুবেইন 'বিলু' বলিতে অজ্ঞান, সহদেওএর মা 'বিলু' বলিতে পাগল, আর জিতেনের মা বৌঠাকুরুনের তো কথাই নাই; বিলুও স্নেহের কাঙাল কম নয়। জিতেনের মা বৌঠাকরুনতো বাড়ির লোকের মতো। অন্য অল্প পরিচিত স্থানেও

যেখানেই স্নেহবর্ষণের ইঙ্গিত পাইয়াছে, সেখানেই বিলু সেই ধারাকে স্থায়ী করিতে ও বজায় রাখিতে সচেষ্ট। কোথাও হোলির পর প্রণাম করিতে যাইবে। কোথাও আশ্রম হইতে লেবু পাঠাইয়া দিবে। কাহারও বা ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এ ধরনের কাজের তাহার অন্ত নাই। এসব স্নেহের দায়িত্ব নাই, কোনো দাবি নাই. বন্ধনও সর্বত্র সেরূপ দৃঢ় নয়। ইহা কেবল স্নেহ আদায় করার নেশা। বাড়িতে মায়ের স্নেহের উপর এগুলি উপরি পাওনা—সেইজন্য ইহার আমেজ এত মধুর। নীলুর কিন্তু এসবের বালাই নাই। স্নেহের দাবি জন্মাইবার মতো, মিষ্টি করিয়া কি সে কথা বলিতে জানে? নিজের খেয়ালেই সে উন্মত্ত। নিজের মত ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করিয়া, তাহা জোরের সহিত ব্যক্ত করিতেই সে ব্যস্ত। স্নেহের ঋণ শোধ দিবার জন্য, যে সকল ছোট ছোট কর্তব্যগুলি সর্বদাই করিতে হয়, তাহাতে সময় নষ্ট কি নীলু করিতে পারে? ততক্ষণ তাহাদের সমালোচনা করিতে পারিলে, তাহার আনন্দ বেশী হইবে। আর বিলু যেন লোককে যাহু করিতে পারে। বাবাকেও করিয়াছিল। বলিতে নাই, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, বাবার চিরকালই রাগটা একটু বেশী। কতদিন দেখিয়াছি,—খাইতে বসিয়াছেন: রান্না পছন্দ হইতেছে না; প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করিলেন, তাহার পর 'রেচেড ডায়েট' এই কথাটি বলিয়া ঠক করিয়া জলের গ্লাসটি ঠুকিয়া উঠিয়া পড়িলেন। না খাইয়া আফিসে চলিয়া গেলেন। এদিকে বাড়িতে মাকেও সারাদিন না খাইয়া থাকিতে হইল।…চা খারাপ হইয়াছে, আর বাবা "যত সব!" এই কথাটি বলিয়া, কাপ সসার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। এরূপ কত দিনের কথা মনে আছে। বৃদ্ধ বয়সে রাগ আরও বাড়িয়াছিল। শেষকালে অল্প অল্প পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। পা দুইখানি ধীরে ধীরে অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছিল। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কাশী ছাড়িয়া পূর্ণিয়া আসিয়া থাকিতে হয়। দেহ যতই অপটু হইতেছিল, ক্রোধও ততই বাড়িতেছিল। এই সময় আসে বিলু। দিনরাত ঐ একরত্তি ছেলেকে লইয়াই আছেন। চলাফেরা করিতে পারেন না, ইজিচেয়ারে শুইয়া থাকেন, কিন্তু 'বলাই'কে (বিলুকে) চোখের আড়াল করিবেন না। অন্য কোনো বাড়ির মেয়েরা বেড়াইতে আসিলেই বলিতেন, উহারা ডাইনী—

বলাইকে যাদু করিবার জন্য আসিয়াছে। বিলুর মাকে ইহার জন্য কত গালাগালি দিতেন। শেষকালে যখন শয্যা লইলেন তখন মাথা বেশ খারাপ হইয়া গিয়াছে। খাটের চারিদিকে কাঠের ফ্রেম করিয়া দিলাম, যাহাতে গড়াইয়া নীচে না পড়িয়া যান। কথা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। চোখ বুঁজিয়া থাকেন। বোধশক্তিও বেশ কম হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও রাগ কমে নাই। বিলুর মাকে ও আমাকে আঁচড়াইয়া খামচাইয়া অস্থির করিয়া দিতেন। ভাত খাওয়াইয়া দিবার সময় আঙুল কামড়াইয়া ধরিতেন। কিন্তু তখনও বিলুকে তাঁহার কাছে বসাইয়া দিলেই সব ক্রোধ নিমেষে কোথায় চলিয়া যাইত! খুব রাগে বিছানায় ছেলেমানুষের মতো গড়াগড়ি দিতেছেন, বিলুর কচি হাত দুখানি যেই তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া দিতাম, অমনি মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেন। হয়তো চোখ বুঁজিয়া আছেন; আমরা কত ডাকাডাকি করিতেছি; কিছুতেই চোখ খুলিবেন না। যত বলিতেছি, ততই যেন দুষ্টু ছেলের মতো তাঁহার জিদ বাড়িতেছে। আমরা বিলুকে বলিয়া দিলাম, 'বিলু, দাদুকে ডাক-তো'। আশ্চর্য, এই অর্ধচৈতন্য অবস্থার মধ্যেও ঠিক বুঝিয়াছেন যে বিলু ডাকিতেছে। অমনি হাত দিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন, বিলু কোথায়। তাহার পর চোখ খুলিয়া তাকাইলেন। যেদিন বাবার সব শেষ হইয়া গেল, সেদিন শেষ মুহূর্তেও বাবার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিয়াছি, "বাবা! বলাই ডাকছে বলাই, বলাই।" তখনও মনে ক্ষীণ আশা যে যদি বিলুর নাম শুনিলে সাড়া দেন। কিন্তু তখন তিনি কোনো ডাক কানে পৌঁছিবার বাহিরে। আশ্চর্য বুদ্ধি ছিল বিলুর। কতই বা তখন বয়স। সে ছাড়া আর কেহ যে দাদুকে বশ করিতে পারে না, একথা অতটুকু ছেলে ঠিক বুঝিয়াছিল। তাহার দাদুকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বা খাওয়াইবার জন্য যে তাহার উপস্থিতির প্রয়োজন, একথা সে তাহাকে ডাকিবার স্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিত। তখন যেন একটু ঔদাসীন্য ও নকল গাম্ভীর্য দেখাইত। বোধ হইত যেন সে চায় যে তাহার মা একটু তাহার খোশামোদ করুক।...বিলু কি তাহার দাদুকে আবার দেখিতে পাইবে? বাবা, আদরের বলাইকে কি শেষকালে এমনি করিয়াই নিজের কাছে টানিয়া লইলে?...

মন বড়ই অস্থির লাগিতেছে। ঘরের মধ্যে এত লোক। সকলে জাগিয়া রহিয়াছে। ঘরের বাহিরে ওয়ার্ডার। ঘরের গল্পগুজবের শব্দ ক্ষীণ হইয়া আসিলেও একেবারে বন্ধ হয় নাই। দাসজীর স্নানের সময়ের শব্দ কানে আসিতেছে। ঘর একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। বাহিরে কুকুরের ডাক শুনা যাইতেছে। তবুও কেন যেন থমথমে ভাব আকাশে বাতাসে চারিদিকে।

গরাদের ভিতর দিয়া আলো বাহিরের বারান্দায় গিয়া পড়িয়াছে। শাড়ি পরা—ও কে? না ও কতকগুলি জ্বালানী কাঠ জড়ো করা রহিয়াছে; তাহার উপর আলো পড়িয়া ঐরূপ দেখাইতেছিল। বিষুণদেওজী মেসের জ্বালানী কাঠ পর্যন্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। জেলের সকলেরই দেখি এই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। ছেঁড়া জামা, পুরানো খড়ম, সব জমানো চাই। জেলে থাকিলেই এইরূপ মনোবৃত্তি হয়। কাঠের বোঝা দেখিয়া হঠাৎ এরূপ দৃষ্টিবিভ্রম হইল কেন?···আশ্রমের রান্নাঘরের বারান্দায় চেলা কাঠ আর ঘুঁটের স্তূপ। ঘরের ভিতর বিলুর মা রাঁধিতেছে। বিলু কোথায় যেন যাইবে। তাই সে খাইতে বসিয়াছে। এত তাড়াতাড়ি খায়, কিছুতেই চিবাইবে না।···উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুল। জেলের আধময়লা নীল ডোরা কাটা গঞ্জি ও জাঙ্গিয়া পরা। রোগা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে······

ভগবান! গান্ধীজি। তোমাদের নাম লইয়াও তো মনে বল পাইতেছি না। আবার চরকাটি লইয়া বসি। ইহাই আমার শেষ সম্বল, অন্ধের যষ্টি, আমার জপের মালা।···তিব্বতে 'যারবেদা চক্রের'[১] ন্যায় একটি জিনিস ঘুরাইয়া লোকে নাম জপ করে। সুরজবল্লীবাবুর দিকে হঠাৎ চোখ পড়িল। ভদ্রলোক চিন্তান্বিতভাবে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। আমার মুখে চোখে ব্যবহারে নিশ্চয়ই কোনো বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। এত খারাপ পাঁজগুলি—সূতা কেবল কাটিয়া কাটিয়া যাইতেছে।··বিদেশে একটু অসুখে পড়িলে লোক ব্যস্ত হইয়া উঠে; আত্মীয় পরিজনকে দেখিতে ইচ্ছা করে; বাড়ির লোকের দরদভরা সেবার জন্য মন ব্যাকুল হয়। আর আজকের মতো দিনে বিলু বাড়ির লোককে কাছে পাইল না। হয়তো কত কিছু তাহার বলিবার ছিল। ছেলেদের সামান্য অসুখে, বিলুর মার স্নানাহার বন্ধ হইয়া

১। এক প্রকারের চরকা, সুটকেসের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়।

যায়। সারা দিনরাত রোগীর বিছানার পাশেই কাটে। পাখা করিবার বিরাম নাই। আরোগ্যের পথে আসিলে, পথ্যাপথ্যের কত বিচার! জ্বর ছাড়িবার পরের দিন কেবল একটু শুক্‌তো; তাহার পরের দিন দুধ পাঁউরুটি; তাহার পরের দিন আটার রুটি; তাহার পরের দিন ভাত। নীলু বিলু জানে যে জ্বর হইলে ইহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। কিন্তু আজ আমি ইহাদের এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি যে অন্তিম মুহূর্তে বিলুর মা বিলুকে নিজের কাছে পাইবে না।...অনেক জানোয়ার নিজের সন্তান খাইয়া ফেলে। আমি কি তাহাদেরই দলে? আবার সূতা কাটিয়া গেল। বোধহয় খুব মিহি সূতা কাটিতেছি বলিয়া বার-বার ছিঁড়িয়া যাইতেছে। না, ইহা অপেক্ষা মোটা সূতা কাটিলে তো প্রায় সতরঞ্চি বোনার সূতা হইয়া যাইবে।......

নেপালে শুনিয়াছি, একজনের বদলে আর একজন রাজদণ্ড ভোগ করিতে পারে। সত্য কিনা জানি না, তবে শুনিয়াছি বড় লোকেরা চাকর-বাকরদের নিজেদের পরিবর্তে জেলে পাঠাইয়া দেন। এখানে যদি এমন একটি নিয়ম থাকিত, যাহাতে বিলুর বদলে আমার গেলেও তো......।

কত গল্প শুনিয়াছি যে একজন আর একজনের রোগ নিজের উপর লইয়াছে। হুমায়ুনের মৃত্যুশয্যায় বাবর এইরূপ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় যে হোস্টেজ রাখে, তাহা একটি প্রাণের পরিবর্তে আর একটি প্রাণ দাবি করা ব্যতীত আর কী?

আবার সূতা ছিঁড়িল। তুলাটাই বোধহয় পুরানো। এতবার সূতা ছিঁড়িলে কি চরখা কাটা যায়? এই পাঁজ দিয়া পূর্বেও সূতা কাটিয়াছি, তখন তো ছেঁড়ে নাই। না, আমার হাত-পা কাঁপিতেছে। পাঁজটি ঠিক ধরিতে ও ইচ্ছামতো টানিতে পারিতেছি না। চোখের মণিও নাচিতেছে। সূতা ঝাপ্‌সা হইয়া যাইতেছে, লণ্ঠনটার তেল বোধহয় ফুরাইয়া আসিতেছে। চোখের দৃষ্টিই বা আর কতকাল থাকিবে, বয়সের কি আর গাছ-পালা আছে? না বৃথাই নিজেকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমার এখনকার মানসিক অবস্থায়, চরখা কাটা অসম্ভব।...সোরাব রুস্তমের কাহিনীর মূলে কোনো ঐতিহাসিক সত্যই নাই,—উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পিতা-পুত্রে কি কখনও ঐরূপ হইতে পারে? হইবে না কেন, পৃথিবীতে

সবই সম্ভব। সিংহাসন লইয়া পিতা-পুত্রের যুদ্ধ ইহাই তো ইতিহাসের সাধারণ ধারা!···কিন্তু আমার আর কী শাস্তি হইতেছে! শাস্তি হইয়াছিল, শিখগুরু বান্দার। নিজের হাতে বুকের দুলালকে হত্যা করিতে হইয়াছিল। "উঃ, কী রক্ত! ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়েছিল বুকের ভেতর থেকে!"

সুরজবল্লীবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "কিছু বললেন নাকি?"

অপ্রস্তুত হইয়া বলি, "না, কিছু বলিনি তো।" বুঝি যে শেষের কথাগুলি অন্যমনস্কভাবে জোরে বলিয়া ফেলিয়াছি। সুরজবল্লীবাবু আমতা আমতা করিয়া বলেন, "চরখা কাটতে একটু উ—একটু যদি-ই ইয়ে হয়, তাহলে এখন থাক না কেন।"

বলি, "না না বেশ তো হচ্চে।"

মনে হইতেছে যেন অন্যায় কাজ করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছি। কথার উত্তর দিতে গিয়া কথা জড়াইয়া আসিতেছিল, কোন রকমে ঐ ছোট কথাটা শেষ করিয়া, সূতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলে যেন বাঁচি। পাঁজের যেখান হইতে সূতা বাহির হইতেছে, জোর করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া আছি—যাহাতে কাহারও সহিত চোখাচোখি না হইয়া যায়। চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে। নিশ্চয়ই রাত্রি জাগিয়াছি বলিয়া; আর অন্য কোনো কারণে নয়। রাত জাগিলেই চোখ জালা করে। মহাত্মাজী, আমার মনে বল দাও। সংযমের বাঁধ আর বুঝি থাকে না। আর তো নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিতেছি না।···

সুরজবল্লীবাবু বলেন, "মাস্টার সাহাব! মাস্টার সাহাব! ও মাস্টার সাহাব!"

যেন বহু দূর হইতে এই শব্দ কানে ভাসিয়া আসিতেছে। তন্দ্রার ঘোরে দূর হইতে রেলগাড়ির শব্দ যেমন লাগে সেইরূপ। বুঝিতেছি, সুরজবল্লীবাবু ডাকিতেছেন। কিন্তু সাড়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে না। সুরজবল্লীবাবু পিঠে হাত দিয়াছেন—দরদী হাতের স্পর্শ লাগিতেই আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারি না—"বিলু! বিলু!" চরখা পাঁজ ফেলিয়া সুরজবল্লীবাবুর হাত চাপিয়া ধরি। দুইজনেই নির্বাক। ভদ্রলোকের চক্ষু হইতেও অশ্রুর ধারা বহিতেছে। চেয়ার ছাড়িয়া ও' চারজনও আসিয়া পড়িল। ছি, একি

করিলাম! লোক জড়ো হইয়া গেল যে! তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিই। আবার চরখায় বসিবার চেষ্টা করি। বৃথা চেষ্টা। সদাশিউ আবার দেখি পাখা করিতে আরম্ভ করিল। ও তো বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আবার উঠিল কখন? সুস্থ লোককে আবার পাখা করার কী দরকার? উহারা কি ভাবিতেছে যে আমি এখনই অজ্ঞান হইয়া যাইব?

সদাশিউকে বলি, "বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া হচ্ছে। আর পাখা করবার দরকার নেই।"

কে কাহার কথা শোনে।

কিছুক্ষণ পর সুরজবল্লীবাবু খুব আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু গীতা পড়বো, শুনবেন?"

এমন দরদভরা মিষ্টি কথা; অনুরোধ এড়াইবার জো নাই। বলি, "পড়ুন"।

আবার চরখা কাটিতে বসি। উনি গীতা পাঠ আরম্ভ করেন। আমি বুঝিয়াছি কেন উনি আমার সম্মুখে গীতা পাঠ করিতে চান। আবার মনে বল আনিবার জন্য নয়, সহানুভূতিতে নয়, নিজেদের দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য নয়—শবদেহবাহী মিলিটারি লরির শব্দ আর ম্যাজিস্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের মোটরকারের শব্দ যাহাতে আমার কানে না পৌঁছায় সেইজন্য। ইহার পূর্বে যতগুলি ফাঁসি হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির বেলায়ই আমরা ভীতিমিশ্রিত উৎকণ্ঠার সহিত এই শব্দের জন্য অপেক্ষা করিয়াছি। মোটর হর্নের তীব্র-ধ্বনি তখন আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে যেন হঠাৎ আলোড়িত করিয়া দিয়াছে। তাহার পর আসিয়াছে ওয়ার্ড জুড়িয়া এমন নিস্তব্ধতার রাজ্য যে নিজের বুকের ধড়ফড়ানির শব্দও যেন শোনা যায়। তখন সময় যেন কাটিতেই চায় না—সকাল যেন আর হয় না। আবার মোটর লরির শব্দ হইতে লোক বুঝিতে পারে লাশ বাহিরে গিয়াছে। তাহার পর নয়টা ঘণ্টা পড়ে, কয়েদীদের জাগাইবার জন্য। ফাঁসির দিন সকলে জাগিয়াই থাকে—তথাপি নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। ইহার পর শোনা যায় দুইটি ঘণ্টা—সকালের "গিনতী মিলানের"। সে ধ্বনি সকলকে জানাইয়া দেয় যে রাত্রে যতগুলি কয়েদী বন্ধ করা হইয়াছিল, প্রাতঃকালেও ঠিক ততগুলিই আছে—একটিও বাড়ে নাই, একটিও কমে নাই। সব

ওয়ার্ডের ওয়ার্ডাররা নিজের নিজের ওয়ার্ডের কয়েদীর সংখ্যা জানাইয়া দেয় গুমটিতে। এগুলির 'টোটাল' রাত্রের সংখ্যার সহিত মিলিয়া গেলেই, এই অভাবনীয় সংবাদ চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দেওয়া হয়, দুইটি ঘণ্টার শব্দে। জেলর সাহেব চাবি দিয়া দেন জমাদারের কাছে, আর সব ওয়ার্ডের দরজা খোলা হয়। পিঁপড়ার সারির ন্যায় লাইন বাঁধিয়া বাহির হয় কয়েদীরা। "জোড়া ফাইল!" "জোড়া ফাইল!" মেয়াদের একটি দিন তাহার কমিয়া গিয়াছে। নূতন উদ্যমে, দুর্বহ, দুরতিক্রম্য আর একটি দিন মুছিয়া ফেলিবার জন্য সে সচেষ্ট হয়। প্রতিটি ঘণ্টা তাহাকে মনে করাইয়া দেয় যে চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন হয়—এক দিন কাটিয়া গেল—আর এখনও এতদিন বাকি থাকিল।...

আমাকে ইহারা ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এখন কি বিলুর কথা ভুলিতে পারা যায়? এখন কি চেষ্টা করিলে অন্যমনস্ক হওয়া যায়? হইতে পারিলে তো বাঁচিয়া যাইতাম।...ভগবানের অশেষ করুণা যে এক সঙ্গে একই মুহূর্তে একটির বেশী বিষয় ভাবা যায় না। বিলু যদি শেষের কিছুক্ষণ, নিজের মৃত্যুর কথা ব্যতীত অন্য কোনো কথা ভাবিতে পারে, তাহা হইলে সে মানসিক অশান্তি ও আতঙ্ক হইতে বাঁচিতে পারে। হয়তো ব্যথা বুঝিতেও পারিবে না। ভগবান, তোমার নিকট হইতে কখনও কোনো জিনিস চাহি নাই। আজ এই কঠিন বিপদের সময় আমার সকল সিদ্ধান্ত জলাঞ্জলি দিয়া, তোমাকে আমার ইচ্ছা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ভগবান, বিলুকে শেষ মুহূর্তে অন্য কথা মনে পড়াইয়া দিও, অন্যকথা ভাবিবার ক্ষমতা দিও। অন্তিম মুহূর্তের পূর্ব হইতেই, মৃত্যুভয়ে তিলে তিলে যেন তাহাকে না মরিতে হয়। টেলিপ্যাথি কি সত্য! আমার মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কি বিলুর কাছে পৌঁছিতেছে? বিলু দেখো, তোমার বাবা তোমার জন্য নিজের কাছে, ভগবানের কাছে আজ ছোট হইয়া গেল!...

সুরজবল্লীবাবু গীতা পাঠ কারতেছেন। অতি পরিচিত গীতার শ্লোকগুলি যেন শুনিয়াও শুনিতে পাইতেছি না, শুনিতে পাইয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। শব্দতরঙ্গ কানে পৌঁছিতেছে, কিন্তু মনে ও মস্তিষ্কে সাড়া

জাগাইতে পারিতেছে না।—বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গীতার বাণী শোনা দ্বাপর যুগেই সম্ভব হইয়াছিল; আমি তো আর অর্জুন নই। আমরা আর গীতার মর্ম কী বুঝিয়াছি? যে নাস্তিক বিলু গীতা ফেরত দিয়াছিল, সেই কিন্তু কর্মযোগের মূলমন্ত্র বুঝিয়াছে, কাজের মধ্যে নিজেকে লীন করিয়া দিয়াছে। আর নীলু, সেই বা কম কিসে? তাহার কঠোর কর্তব্যজ্ঞানের সম্মুখে স্নেহ, ভালোবাসা, আত্মীয়তার দাবী, জনমত, অত আদরের দাদা—সব তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ইহাদেরই আবার আমি ভাবি নাস্তিক! ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের মনে বল আনে; আর ঈশ্বরে অবিশ্বাস ইহাদের মনে দুর্বলতা আনে নাই। যে জিনিসে অপরের পতন, তান্ত্রিক সাধকের হয় তাহাতেই সিদ্ধি।...

"অ্যাঁ!" চমকিয়া উঠিয়াছি। হাত হইতে পাঁজ পড়িয়া গেল। চরখার ঘর্ঘর আর গীতা পাঠের একঘেয়ে সুর ভেদ করিয়া, অন্য সকল শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, শোনা গেল মোটর লরির হর্ন—তাহার পর মোটর থামিবার শব্দ। আমার বুকের উপর দিয়াই যেন লরিখানা চালয়া গেল—টানিয়া যদি ধরিয়া রাখিতে পারিতাম—গায়ের জোরে, যত শক্তি আছে আমার শরীরে —কাঁকরভরা রাস্তার উপর দিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—লরির চাকা থামাই, এত জোর কি আমার কাছে—লরি থামিল—আমার হৃৎস্পন্দনের সহিত সুর মিলাইয়া মোটর ইঞ্জিনের শব্দ হইতেছে—ক্রুদ্ধ হিংস্র জন্তুর নির্ঘোষের মতো। সদাশিউ পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে। চারিদিকে সকলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ গাড়ি চাপা পড়িলে সেই স্থানে যেইরূপ ভিড় হয় সেইরূপ।...

সদাশিউ বলে, "আসুন, সকলে মিলে একটু 'প্রার্থনা' করা যাক।" সকলে সেইখানে বসিল। বৈজনাথের দল, ফরওয়ার্ড ব্লকের দল, কিষাণ সভার ছেলেটি, কম্যুনিস্ট পাটির ছেলেটি আর বাকী সকলে তো আছেই। মেহেরচন্দজী "রাষ্ট্রগনকী দিব্বিয় জিয়োতি"...আরম্ভ করিলেন। আজ কাহারও প্রার্থনায় আপত্তি নাই; ইহাকে ব্যঙ্গ করিয়া চুটকি গান নাই। মেহেরচন্দজীর যে কলিটি মনে থাকে না, সেটি আগে হইতেই সকলে গাহিয়া দিল। পকেট হইতে কাগজখানি আর তাঁহাকে বাহির করিতে হইল না।

সকলেই প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। এত চীৎকারের মধ্যে আর ম্যাজিস্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের মোটরকারের শব্দ শোনা যাইবে না। সেই মতলবেই ইহারা প্রার্থনায় বসিয়াছে। যেই মেহেরচন্দজীর শেষ হইল, অমনি সদাশিউ আরম্ভ করিল, "রঘুপতি রাঘব রাজারাম..."

মহাত্মাজীর প্রিয় ভজনটি। কী মধুর চির নূতন সুর ভজনটির। বিলুর দলের আজ ভজন গানেও আপত্তি নাই। আগের গানটি না হয় ছিল 'জাতীয় পতাকা'র বিষয় লইয়া, কিন্তু এ ভজনটি তো আর তা নয়। বিলুর অন্তিম মুহূর্তে তাহার আত্মার শুভ কামনায়, আর বিলুর বাবাকে একটু অন্যমনস্ক রাখিবার প্রয়াসে, উহারা নিজেদের মতবাদ একটু নমনীয় করিয়া লইয়াছে। বিলুর দল—ইহারা এটুকুও কি করিবে না? হইত নীলু— তাহা হইলে সে কি ভজনে যোগদান করিত? কখনই নয়। সে ভাঙ্গিবে কিন্তু মচকাইবে না। নীলু বিলু আগে আশ্রমে এই ভজনটি কেমন সুন্দর গাহিত। মহাত্মাজীর সম্মুখেও গাহিয়াছিল। মানসিক উদ্বেগ চাপিবার জন্য ইহারা অস্বাভাবিক জোরে গাহিতেছে। ঠিক করিয়াছে যে এখন আর শেষ করিবে না—যতক্ষণ পারে প্রাণপণে গাহিয়া চলিবে...মঞ্চের সিঁড়ির উপর দিয়া বিলু উঠিতেছে—আহা, খালি পায়ে ঠোকর খাইল— কী রোগা হইয়া গিয়াছে—গলাটি পাখীর গলার মতো সরু—নাকটি খাঁড়ার মতো হইয়া উঠিয়াছে; নীচে অন্ধকার—দড়িতে হেঁচকা টান পড়িল—বিলু —বিলু যাইলে কী হইবে? আমার এতগুলি বিলুকে সে রাখিয়া গিয়াছে। ভগবান! মহাত্মাজী! বিলুর মাকে আঘাত সহ্য করিবার শক্তি দাও, নীলুর মনে বল দাও, বিলুর আত্মাকে শান্তি দাও। ভজন চলিয়াছে—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম।
জয় রঘুনন্দন জয় ঘনশ্যাম, জানকী বল্লভ সীতারাম।

জোরে, আরও জোরে!

আওরং কিতা

(মা)

সরস্বতী চলে গেল। তাহলে দরজা বন্ধ হওয়ার সময় বুঝি হল। হ্যাঁ, তাইতো—ঐ তো কথা শোনা যাচ্ছে লুসী জমাদারনীর[১]। সরস্বতী একটু মাথা টিপে দিচ্ছিল, বেশ লাগছিল। ভারি নরম ওর আঙ্গুলগুলো। দুই রগের উপর চেপে ধরে, তারপর আস্তে আস্তে আঙ্গুলগুলো নিয়ে আসে, ভুরুর উপর দিয়ে নাকের ডগায়। রগের দবদবানি সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। আর মাথার মধ্যে কী যেন জমে আছে, চাপ বেঁধে,—সেটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় গলে হালকা হয়ে গেল। জমাদারনী কি ওকে এক মিনিটও বেশী বসতে দেবে। আমাদের তো তবু একটু সমীহ ক'রে কথা বলে—কিন্তু সরস্বতী যে 'সি' কেলাসী। ওদের ওয়ার্ড যে আলাদা। ওকে এতক্ষণ এই ওয়ার্ডে থাকতে দিয়েছে সেই যথেষ্ট। আহা-রে, ও যে আবার জেলে ফিরে এল কেন, সে তো আমি বুঝি। আমার কাছ থেকে কি তা লুকোতে পারে? আগে যদি এটা বুঝতাম, তাহলে সহদেওএর মা যখন আমার কাছে কথাটা পেড়েছিল, তখনই রাজী হয়ে যেতাম। তাহলে হয়তো বিলুর আমার, এদশা হতো না। তা রাজী হব কেন? ভগবান আমায় এমনি করেই সৃষ্টি করেছেন! তাহলে রাজ্যসুদ্ধু সবাইকে নিজের পেটে পুরে বসে থাকবো কী করে? "অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।" আমার হয়েছে তাই। সরস্বতীর কপাল এমনিও পুড়েছে, আর বিয়ে হলেও হয়তো পুড়তো। আমি বিলুর মত পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নি। মেয়ে মোটে ছাত্রবৃত্তি পড়া। আজকালের ছেলেরা কখনও তা পছন্দ করে? একথা সহদেওএর মাকে একটু আভাসও দিয়েছিলাম। সহদেওএর মা তো আমার কাছে কোনো জবাব দেয় নি। কেবল সে সময় অবাক হয়ে ড্যাবড্যাব করে

১। Female warder

তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। কিন্তু এর জবাব পরে সহদেও আমাকে শুনিয়ে দিতে ছাড়ে নি। সহদেও বলেছিল, "আমরা চাষা-ভূষো মানুষ। আমাদের বোন মিডিল্ পাস করা হবে না তো কি সরোজিনী নাইডু আর বিজয়লাক্সমী পণ্ডিতের মতো বিদুষী হবে ? তাছাড়া বিলুবাবুই এমন কী একটা লেখা-পড়া করেছে ? বিদ্যাপীঠের শাস্ত্রী বইতো নয়।" সহদেও মিটমিটে দেখতে ; থাকে চুপচাপ গরুচোরের মতো। কিন্তু কথা যখন শোনায় তখন একেবারে বিঁধিয়ে বলে। আমার ছেলের বিয়ে—আমি যেখানে ইচ্ছে দেবো, যেখানে ইচ্ছে দেবো না ; এ নিয়ে আবার সাতমুখ করা কী ? আমি রাজী হই নি, দুজনকে মানায় না ভালো বলে। হিন্দুস্থানী আর বাঙ্গালীতে কি মানায় ? যেখানকার যা সেখানকার তা। একগাছের বাকল আর একগাছে এঁটে দিলে তা কি কখনও জোড়া লাগে ! আমি বলবো সরস্বতী, তো ওরা বলবে সরসোয়াতী। সরস্বতী কি শুকতো রাঁধতে জানে ? গোকুলপিঠের নাম শুনেছে? বিলু অড়রের ডাল পছন্দ করে না, আর ওরা অড়রের ডাল ছাড়া আর অন্য কোনো ডাল ভালোবাসে না। ওরা মুসুরীর ডাল খায় কেবল যখন ছেলেপিলে হওয়ার পর মেয়েরা আঁতুড়ে থাকে তখন।...একদিন বহুরিয়াজীকে ডাঁটা-চচ্চরি রেঁধে দিয়েছিলাম। সে বললো, "হ'মি ড্যাঁটা খেতে খুব পসন করে !" ডাঁটা-গুলো মুখে দেয় আর চুষে চুষে ফেলে দেয়, চিবোতে হয় তা জানে না। আবার বাংলা বলার শখ কত ? এরা কি একটা ভালো মিষ্টি তোয়ের করতে জানে ? জেলে দেখছি তো। আর ওদের দেশেই তো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম—কিছু জানতে তো আর বাকী নেই। মিষ্টির মধ্যে ঐ এক 'পুয়া'—সব পূজায়-আচ্চায়, ঝোলে-ঝালে, অম্বলে সর্বঘটে আছে। জলে একটু আটা গুলে নিয়ে, তাতে একটু গুড় দিয়ে কোনোরকমে ভেজে ফেলতে পারলেই হয়ে গেল 'পুয়া'। না আছে রসে ফেলা, না আছে কিছু। দুটো জিনিস মিলিয়ে তরকারি রাঁধো, ওরা আঁতকে উঠবে। আর তারই সঙ্গে আমি আমার বিলুর বিয়ে দিতাম ! এতো আর একদিন দুদিনের কথা নয়। সারা জীবন রসুন আর গোলমরিচ খেয়ে কি আর বাঙ্গালীর ছেলে বাঁচতে পারে ? তাহলেও ভারি ভালো লাগে আমার সরস্বতীকে। নিজের

ছেলের বৌ করতে চাই নি বলে যে ওকে দুচক্ষে দেখতে পারি না, তাতো আর নয়। ওকে বলে ছোটবেলা থেকে দেখছি। কপিলদেওএর সঙ্গে এসে, কতবার কতদিন থেকে গিয়েছে আশ্রমে। বিলু নীলুর মতো সহদেও আর সরস্বতী তো, আমার নিজের হাতে করে গড়ে তোলা বললেও হয়। কী-ই বা বয়স? সেদিনও তো ও মেয়ে একরত্তি ছিল।

...আমার রান্নাঘরের বারান্দায় শিউলি ফুলের বোঁটা দিয়ে রাঙানো খদ্দরের বৃন্দাবনী শাড়ি পরে, দুষ্টু মেয়েটি, বাঁশ ধরে ঘুরপাক খাচ্চে। কোথায় চুল, কোথায় খোঁপা, কোথায় আঁচল,—বাঁই-বাঁই করে ঘুরেই চলেছে। আমি বলি থাম্, আবার মাথাটাথা ঘুরে পড়ে যাবি, গা বমি বমি করবে—কে কার কথা শোনে! "সরসোয়াতী কি ইস্কুল; ভেরি ব্যাড ভেরি ব্যাড টিচার কুল"[1] এই পদ্য বলে চ্যাচাতে চ্যাচাতে বিলু এসে রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়ালো। তবু কি মেয়ের ঘুরুনি থামে! ঐ ঘুরতে ঘুরতেই বিলুর কথার পাল্টা জবাব দেওয়া হল—

"ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও কু;[2]
বিল্লি ভাইয়া থ্যাঙ্কু।"

বিলু তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে—"মুরগী ভাইয়া কা ঠ্যাং খাও?"

তখন মেয়ের ঘুরপাক খাওয়া থামে। মেয়ে হেসে তখন বারান্দার উপর লুটোপুটি লুটোপুটি!...

খাসা গড়নপিটন মেয়েটার। কাজ চালিয়ে নিতে পারতো কিন্তু। বাঙ্গালী গেরস্থ বাড়ির মেয়ে এসে কি আর কংগ্রেস আশ্রমের সংসার চালাতে পারে? আশ্রম তো নয়—একটা হোটেল। মামলাবাজ লোকেরা সদরে মোকদ্দমার তদ্বিরে আসবে, আর এসে উঠবে আশ্রমে। মিটিং তো লেগেই আছে! সময় নেই অসময় নেই, রাত নেই বিরাত নেই, লোক আসার কি আর বিরাম আছে? আমি বলেই সামলাতে পেরেছি,—অন্য কেউ হলে কেঁদে মরতো।—সরস্বতীর হাতে খেয়ে কিন্তু বিলুর একদিনও

১। কুল—সকলে, সমূহ।

২। গ্রাম্য বালকবালিকারা কাণামাছি খেলার মতো একটি খেলা করে। তাহাতে ছেলে-মেয়েরা এই কথাটি বলিয়া চোখ-বাঁধা লোকটিকে সাড়া দেয়।

পেট ভরতো না। বিলু আমার তরকারি খেতে ভারি ভালবাসে। বসে বসে টুকটুক করে খাবে, যতটা ভাত প্রায় ততটি তরকারি। তাই খেয়েই তো কোনো রকমে হাড় কখানি টিকে আছে—তা না হলে ভাত খাওয়ার যা ছিরি! পাখির মতো ঠোকর মেরে এই তো চারটি ভাত খাওয়া। আর ঐ সরস্বতীদের—ওদের আবার তরকারি খাওয়ার অভ্যাস আছে নাকি? ওদের মধ্যে যে লাখপতি তার গর্ব যে, সে ভাতের সঙ্গে দু-তিন রকমের তরকারি খায়। পাড়ার সবাই সে কথা নিয়ে আলোচনা করে। আর সাধারণ গেরস্থ বাড়িতে কাঁধা-উঁচু পিতলের থালায়, লাল চালের ভাতের মধ্যে গর্ত করে এক নাদ অড়রের ডাল, আর থালার কোণের দিকে নম' নম' করে চন্ননের ফোঁটার মতো এতটুকু তরকারি। সোনামুখ করে তাই খেয়ে উঠে, কপিলদেও আর সহদেও এক এক ঘটি জল খায়।...

এ কে? আমার পা নিয়ে আবার টানাটানি কেন? কে রে? মন্‌চনিয়া? পায়ে তেল লাগাতে কে বলেছে? নিশ্চয়ই বহুরিয়াজী![১] নিজেরা গিয়ে রামায়ণে বসেছেন, আর একে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে বিরক্ত করতে! রামায়ণ পাঠতো বেশ জমে এসেছে দেখছি। বহুরিয়াজী পড়ে, আর বাকী সতরো জন তার সঙ্গে স্থর মেলায়। একেবারে কান ঝালাপালা। আমাদের কেমন একজন রামায়ণ কী মহাভারত পড়ে, আর বাকী সকলে বসে শোনে। বড় জোর একটু আধটু আহা উহু করে। এদের সবই অদ্ভুত।..."হ্যাঁ রে মন্‌চনিয়া, আমার পায়ে তেল দিয়ে দিতে কে বল্‌লেরে?"

"সরসোয়াতীজী যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল যে কদিন থেকে পিত্তি পড়ে পড়ে, মাইজীর হাত পা জ্বালা করছে। হাতের তেলোয় আর পায়ে একটু তেল জল লাগিয়ে দিস। আপনি মাইজী, বিরক্ত হবেন মনে ক'রে আমি তো এতক্ষণ দিই নি। আমি বসে ছিলাম দোরগোড়ায়। এখন জমাদারনী এসে আবার শাসিয়ে গেল। বলে যে 'এখন থেকেই ঘুমানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। মাইজীর সেবার জন্য তোমার আর গলকটির ডিউটি পড়েছে,—এখনই এসে দোরগোড়ায় বসলে কী? অর্ধেক রাত তুমি জাগবে, আর বাকী অর্ধেক জাগবে গলকটি।' এই বলে সে তো ফড়্‌ফড়িয়ে চলে

১। বৌ

গেল। সরকার জেলে পুরেছে, এখানে তোমরা যা বল তাই করবো। অনেক পাপ করেছি, না হলে কি আর বামুনের মেয়ে হয়ে অন্য লোকের পা টেপার কাজ করতে হয়? আবার ওদের হুকুম মতো তোমার পা টিপতে এলাম—তো আবার তুমি মাইজী, নারাজ।..."

বছর তিরিশেক বয়স হবে মন্‌চনিয়ার। সে 'সি' ক্লাস সাধারণ কয়েদী। বেশ সুশ্রী চেহারা। ব্রাহ্মণের ঘরের বাল-বিধবা। কিছু দিন আগে একটি ছেলে হয়। সদ্যজন্মানো ছেলেটির মৃতদেহ পাওয়া যায়, বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটি হাঁড়িতে। ছেলেটির গলায় আঙ্গুলের দাগ। আহা, ননীর মতো নরম গলায় রক্ত জমে নীল হয়ে গিয়েছে। ঐ তো একরত্তি রক্তের দলা! তাইতেই মন্‌চনিয়ার সাজা হয়েছে দশ বছর, আর মন্‌চনিয়ার মার দু-বছর। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। তুই হলি মা। নিজের পেটে ধরেছিস্ ছেলে। ও ছেলে তখনও ভাল করে কাঁদতে পর্যন্ত শেখে নি। সেই ছেলেকে কি না মা হয়ে এমনি করলি! তোর মতো মাকে তো হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটা দিয়ে, তুষের আগুনে দগ্ধে মারতে হয়। না, ও কখনই নিজে একাজ করে নি! ও হয়তো তখন অজ্ঞান অচৈতন্য। করেছে ওর মা। সে মাগী ভারি দজ্জাল। আর তারই সাজা হল কিনা দু-বছর। এদের আইন এজলাসের কি আর কিছু ঠিক ঠিকানা আছে! তা থাকলে কি আর বিলুর আমার এমন সাজা হয়? না ও কাউকে খুন করেছে, না ও কাউকে মারতে গিয়েছে। কংগ্রেসের কাজ করেছে। তার জন্য জেল দাও জরিমানা করো। তার জন্য ফাঁসি! ভগবান, এত অবিচার কি সইবে?...

"মাইজী হাতের তেলোয় তাহলে একটু তেলজল লাগিয়ে দি!" আহা আর জালাস না তো। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। আমি বলে মরি নিজের জ্বালায়। আর এরা সবাই মিলে আমার রাশে লেগেছে। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি করিস না একটু শান্তিতে নিরিবিলি থাকতে দে। চব্বিশ ঘণ্টা ছত্রিশ জন লোক, আমাকে ঘিরে মেলা করে বসে আছে, যেন আমাকে তুলসীতলায় নামানো হয়েছে। রামায়ণ পাঠ আরম্ভ হতে দেখে, কোথায় ভাবলাম যে যাক্, খানিক্ষণের জন্য নিশ্চিন্দি,—তা নয় এ আবার এসে আরম্ভ করল ভ্যাজর্ ভ্যাজর্ । মন্‌চনিয়া বলে চলে, "মাইজী, আজ সকালে আপনি

যখন বেহুস হয়ে গিয়েছিলেন না, তখন ডাক্তার সাহেব এসেছিল। বলে গিয়েছে যে তিন দিন আপনার উপোস হয়ে গেল ; কালকে যদি কিছু না খান, তাহলে জোর করে খাওয়াবে। 'সুই' (ইনজেকশন) দেবে আর নাকের মধ্যে দিয়ে নল চালিয়ে মুর্গীর ডিম খাইয়ে দেবে।"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমার এখন খাওয়াই বড় হল। আরে আমি না খেলে কার সাধ্যি আমাকে খাওয়ায় ?"

"আপনি জানেন না বুড়ী মাইজী এদের। নর্মদাবেনের বিছানা বাঁধবার থলি আছে না? খাটিয়ার সঙ্গে ঐরকম চামড়া দিয়ে বাঁধবার ব্যবস্থা এদের আছে। জোর করে কজন জমাদারনী মিলে আপনাকে ঐ খাটিয়ায় শুইয়ে দেবে। তারপর বিছানা বাঁধবার মতো করে আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবে, ঐ 'গদ্দিদার' খাটিয়ার সঙ্গে।"

"আরে আমি না গিললে তো আর গিলিয়ে দিতে পারবে না। যা আর বেশী বকিস না তো।"

ভবী ভোলবার নয়। মন্‌চনিয়া আপন মনে বকে যায়—"ঐ যে হারীন মঘাইয়া ডোমিন[১] আছে,—তার নাকের মধ্যে ঘা আছে জানেন মাইজী। যখন তখন রক্ত পড়ে। ও গত বৎসর, আপনারা আসবার আগে 'অন্‌সন' করেছিল, ওকে পায়খানার 'সাফাইয়া' কমাণ্ডে কাজ দেওয়া হয়েছিল ব'লে। ও বলে যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশের লোক ওরা ; নিজের জাতের মধ্যে ওদের কত "বোল বলা" (খ্যাতি), ওকি কখনও ময়লা সাফ করতে পারে? ওদের জাত 'মুর্দা' ছোঁয় না, আর যারা নালী সাফ করে, তাদের সঙ্গে বসে তো ওরা খায় না। ও একথাও বলেছিল যে এ জেলে চিরকাল 'সাফাইয়া'র কাজ করে 'সান্তালীন'রা[২]। তারপর কতদিন ধরে ওকে মুর্গীর আণ্ডার শরবত খাইয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দিলে কি হবে—ওর সংস্কার ভালো। মুর্গীর আণ্ডার কথা ডাক্তাররা না বলে দিলেও. ওর বমি হয়ে যেতে আরম্ভ করলো। তারপর সরকারকে হার মানতে হলো। সাহেব হুকুম দিল ওকে পায়খানা কম্যাণ্ড থেকে সরিয়ে নেওয়ার। মহাত্মাজী সরকারের

১। মঘাইয়া ডোমের স্ত্রী। ডোমেরা বেদেদের মতো একটি যাযাবর জাতি। বিহারে ইহারা Criminal tribes এর অন্তর্ভুক্ত। ২। সাঁওতালনীরা।

সঙ্গে পারেন না। ও কিন্তু সরকারকে কদিনের মধ্যে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিল। 'কলস্টর' সাহেব এসে 'সুপরিটন' সাহেবকে কী বকুনি! চমাইন[১] জমাদারনী একদিন আমার কাছে গল্প করেছিল। এক বালাই তো গেল, কিন্তু সেই থেকে ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।"

ফাঁসিতে ঝুলবার সময় নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয় নাকি? মন্‌চনিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে হয়; সে গলাটা যখন টিপে ধরেছিল, তখন কচি ছেলেটার নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল নাকি? না, মা হয়ে মা'র কাছে এসব কথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়?—ও যদি নিজের হাতে এ পাপ কাজ করে থাকে, তা হলে কি সে সময় সেইকচি মুখটির দিকে তাকাতে পেরেছে?

…দুর্গার সেই ছোট ছেলেটার কী হল। আমারই কোলের মধ্যে তার সব শেষ হয়ে গেল। জ্বরে ভুগে ভুগে তার চেহারা হয়ে গিয়েছিল হাড় জিল্‌জিলে, পেট ডিগ্‌ডিগে!…হঠাৎ দুর্গার মা ডেকে পাঠালো, আমি তরকারির কড়া নামিয়ে রেখে ছুটলাম তাদের বাড়ি। দুর্গার মা আবার যা আটাশে, সব তাতে ভয়েই মরে। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কেঁদেকেটে পাড়াসুদ্ধ সরগরম করে তুলছে। কিন্তু যে খুদে ছেলেটার তখন ভগবানের ডাক পড়েছে, তার কাছে দুদণ্ড নিশ্চিন্দি হয়ে বোস্‌।—তা না—বলে, সে আমি পারি না দিদি, আমার বড্ডো ভয় করে। গিয়ে দেখি, দুর্গা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পাশে বসে রয়েছে ছেলেটার। সেটার তখন, এখন-তখন অবস্থা। গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বসলাম। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। চোখের মণির সাদাটা দেখা যাচ্ছে। প্রাণপণে বাছা নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। কষ্টে মুখ, হাতপা নীল হয়ে গিয়েছে। অতটুকু ছেলেটার বাঁচবার কী চেষ্টা! তারপর আমার কোলের মধ্যেই তার সব চেষ্টা শেষ হয়ে গেল। ওষুধ তো দূরের কথা, এক ফোঁটা জলও তার গলা দিয়ে নামলো না। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য যে শেষকাল-টায় নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়ে আমার কাপড়-চোপড় একেবারে ভেসে গেল। অমন আর কখনও দেখি নি। দুর্গার মা তখন কেঁদেকেটে বাড়ি মাথায়

১। চামারের স্ত্রী।

করেছে। দুর্গা কাঠ হয়ে বসে আছে—আর তাকে টেপীর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, "হ্যাঁরে দুর্গা, খোকা সকাল বেলা পেঁপে আর তালমিছরিটুকু খেয়েছিল তো?"......

....বিলু যখন হয় তখন দিব্যি মোটাসোটা ছিল—এত বড় কোলজোড়া ছেলে। আঁতুড়ে হেডপণ্ডিতজীর স্ত্রী দেখতে এসেছেন। রুক্‌মিনী দাই এক ধাবড়া কাজল ছেলের গালে লাগিয়ে দিল। সে বলে যে তুমি জান না এই পণ্ডিতাইনদের—এরা ডাইনীর বাড়া। এদের বিষের নজর যেদিকে পড়ে, একেবারে জলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। গালে কালি না লাগালে ছেলে দেখবে দিনে দিনে শুকিয়ে দড়ি হয়ে উঠবে। বুড়ি দাই আমাকে তখন চব্বিশ ঘণ্টা শাসনে রাখে—এটা করো তো ওটা করো না; উঠতে বসতে আমাকে সাবধান করে। আচ্ছা বাবা যা বল তাই। বিলু হয়েছিল ৺বিজয়া দশমীর দিন। হেডপণ্ডিতজীর স্ত্রী এলেন পূজোর ছুটীর পর। তিনি আগে দেশেই থাকতেন। সেইবারই হেডপণ্ডিতজী প্রথম পরিবার নিয়ে এলেন। পণ্ডিতজীর স্ত্রী বিশ্বাসই করবে না যে বিলুর বয়স তখন কুড়ি দিন। বিলুর কোঁদা কোঁদা হাত পা'র দিকে তাকায়, আর রুকমিনী গজ্‌গজ করতে করতে কাঁথা দিয়ে ঢেকে দেয়।···

তারপর বিলুটার শরীর ভেঙ্গে গেল সেবার ডবল নিমোনিয়া হওয়ার পর থেকে। তখন ওর বয়স হবে বছর আড়াই। 'ঠাকুর' তখন শয্যাগত, পায়ের দিকটা আস্তে আস্তে তাঁর অবশ হয়ে আসছে। তখনই বিলুরও অসুখ করলো।···কার্তিকে কার্তিকে দু'বছর, অঘ্রাণ, পৌষ. মাঘ, ফাল্গুন, চোৎ—দুবছর পাঁচ মাস—বিলুর বয়স তখন দু'বছর পাঁচ মাস।···অত ছাই মাস দিনের হিসেব আমার মনেও থাকে না, তার কথাও নেই। থাকতো টেপীর মা, তাহলে আমার হিসেবে নিশ্চয়ই দিত ভুল বের করে। তার সামনে কি কোনো কথা বলার জো আছে—একটা কথাও পড়তে পায় না।... প্রথম দিন বিলুর কপালটা ছ্যাক্‌-ছ্যাক্ করতে দেখেই, আমার মনটা অস্থির অস্থির করতে লাগলো। সারারাত ছেলের কী কান্না আর ছটফটানি! আর 'ঠাকুরে'র পাশের ঘর থেকে কী রাগারাগি আর কী বকুনি। ছেলেকে কিছুতেই সামলানো যায় না। উনি বলেন কাল সকালে হরিগোবিন্দ

ডাক্তারকে দেখালেই হবে। বিলুর ঠাকুরদাদা চটেমটে অস্থির। তাঁর বকুনির চোটে শেষকালে ডাক্তারকে খবর পাঠানো হলো। ডাক্তারবাবু বলে পাঠালেন যে রাত্রে আসতে পারবেন না। 'ঠাকুরে'র তাই শুনে কী রাগ! বললেন যে গভর্নমেণ্টে রিপোর্ট করে ওর ডাক্তারি করা আমি ঘুচিয়ে দেবো। রাত একটা পর্যন্ত সীতাপতির দোকানে পাশা খেলবে, আর রুগী মরলেও রাতে রুগী দেখতে আসবে না। এখন শীতও নয়—বর্ষাও নয়। এরা সব খুনে। ডাক্তার নয় ডাকাত, বাটপাড়। 'ঠাকুর' তো তখনো বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। তাঁর কাছে রিপোর্ট লিখবার জন্য লণ্ঠন, চশমা, কাগজ কলম রেখে, তাঁকে চুপ করিয়ে আসি। স্কুলের দারোয়ান ননকুকে আবার পাঠাই ডাক্তারের কাছে। আলিবকসের খ্যাম্পনি, ননকু ঐ রাতে নিজে চালিয়ে ডাক্তার বাবুকে নিয়ে আসে!…এখনও লাঠির উপর ভর দিয়ে ননকু মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসে মাইজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।…হরিগোবিন্দ ডাক্তারের মুখ বাঁকানো দেখেই আমি বুঝেছি যে ছেলের আমার অসুখ বেশ ব্যাঁকা!…তারপর ক'দিন ধরে চলল যমে-মানুষে লড়াই। একদিন তো হয়েই গিয়েছিল। সেই প্রথম দেখলাম মৃগনাভির গুণ। হাত পা গিয়েছিল একেবারে হিম হয়ে। হরিগোবিন্দ ডাক্তার নাড়ি টিপে মুখ বেজার করে বসে রয়েছে। কী ধক্ ওষুধের! দেখতে দেখতে বিনকুরি বিনকুরি ঘামে হাত পা ভিজে গেল। বিছানা বালিশ ভিজে জবজবে। ঐ নেতিয়ে পড়া একরত্তি ছেলেকে কী মুছিয়ে ওঠা যায়! তার বুকে পিঠে পুলটিসের বোঝা। সকাল বেলা ডাক্তার বাবু আমাকে বলে গেলেন,—'আপনার ছেলেকে নতুন জীবন দিলাম'। কথাটার মধ্যে একটুও বাড়াবাড়ি নেই। ধন্যি ধন্বন্তরী ডাক্তার হরিগোবিন্দ বাবু! কিন্তু ঐ কস্তুরী খাওয়ার পরে, একমাস ছেলের গায়ের জ্বলুনি যায় না—দিনরাত ছটফট করে। সারারাত টানাপাখা টানানোর ব্যবস্থা হল। তারপর আস্তে আস্তে ছেলে তো সেরে উঠলেন। কিন্তু সেই যে গেল শরীর পটকে, আর কী কখনও ঠিক করে সামলে উঠতে পারল? গায়ে আর মাংস লাগল না, নিত্য অসুখ লেগেই আছে। বড়লোকের বাড়ি হতো তো বাক্সে আঙুর রাখার মতো আদর-যত্নে মানুষ হতে পারতো। কিন্তু যে কপাল করে এসেছিল, তেমন আদর-যত্নে খাওয়া-

পরা তো একদিনের জন্যও বাছার জুটলো না! হরিগোবিন্দবাবু কেন তখন ওকে বাঁচিয়েছিলেন, কেন এত বড়টা হতে দিয়েছিলেন? ভগবান, যদি ওকে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল তা হলে তখন নিলে না কেন? কেন আমার লোভ বাড়িয়ে দিলে? এমন রাক্ষুসে নেওয়া ঠিক করলে কেন? কত পাপই না আমি করেছি! ভগবান, আমার পাপের জন্য আমাকে যে কোনো শাস্তি দিতে পারতে কিন্তু আমার পাপের জন্য তাকে শাস্তি দিলে কেন? তখন গেলে হয়তো, নীলুকে কোলে পেয়ে আমি এতদিনে ওকে ভুলতে পারতাম। এক এক ছেলে তো নয়, তার হাজার রকমের রূপ। তার লক্ষ রকমের হাবভাব কথাবার্তা মনের মধ্যে আসে! এক ছেলে হাজার ছেলের সমান। কত স্মৃতি, ছোটখাট কত ঘটনা, কত আদর আবদার হাসি-কান্নার ছবি চোখের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা ভেসে বেড়াচ্ছে, তার কি হিসেব আছে? ইচ্ছে করে যে এই সব মনেপড়াগুলোকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকি। পারি তো বুকের মধ্যেই ঢুকিয়ে রেখে দি। মনে হয় বিলুকেই যেন আমি বুকের মধ্যে পেয়েছি, তাকে ছুঁয়ে আছি, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি,—জড়িয়ে ধরে আছি—কিছুতেই ছাড়বো না, কার সাধ্যি মার বুক থেকে ছেলেকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।…

বিরাট চীৎকার করে এরা রামায়ণের আরতি আরম্ভ করল। এইবার তাহলে রামায়ণ পাঠ শেষ হবে। এরা আরতি বলবে না, বলবে আর্তি।… এ সময়টা কী চীৎকারই করে! জেলে আসার পর থেকে নিত্যি তিরিশ দিন শুনে একেবারে বিরক্ত হয়ে গিয়েছে মন।…

আরতিগান চলছে, সব কথা বোঝা যায় না।…

আরত শ্রীরামায়ণ-অ জী কি
কীরতি-কলিত-ললিত-অ সিয় পী কি ॥…
গাওয়ত -অ-ব্রহ্মা দিক্-অ মুনি নারদ-অ
বাল্মীক বিজ্ঞান বিসারদ-অ
শুকা সনকাদি শেষু অরু সারদ-অ
বরনি পবন-সুতা কীরতিনি-ই-ই কি ॥
কীরতিনীকি রামা কীরতিনী-ই-ই কি ॥

গাওয়ত-অ বেদ-অ পুরাণ-অ অষ্টাদশ-ও
ছয়ো শাস্ত্র-অ সব-অ গ্রন্থ-অ নহকো রস-অ
মুনিজন-অ ধন-অ সন্তনহকো সরবস-অ
সার-অ অংস-অ সম্মতি সবহী-ই কী-ই ॥
সাম্মাতি সাবহী কী রামা, সাম্মাতি সাবহী-ই কী-ই ॥
আরত-অ শ্রীরামায়ণ অ-জী কি কীরতি কলিত-অ
ললিত-অ সিয় পী কী ॥

গাওয়ত-অ সন্তত-অ সম্ভু ভবা-আ-নী
অরুবহ-অ সন্ধ-অ-ব-অ মুনি বিজ্ঞা-নী-ই
ব্যা-য়া-স-অ অ আ-আ-দি কবি বর্জ বখা-আ-নী
কাগা ভূখণ্ডি গরুড়াকে হী-ইকী-ই ॥
আরত-অ শ্রীরামায়ণ অ জী-কি কীর-অ-তি
কলিত-অ ললিত-অ সিয় পী কী।

তারপর নতুন করে সুরে আরম্ভ হলো—

আজ-অ কথা-আ ইৎনী ভই, সুনহু বীর-আ-হনুমান।
রাম-আ লক্ষণ-আ সিয়া জানকী—সদা-আ করহু কল্যাণ ॥

এইবার ঘর ফাটিয়ে চীৎকার আরম্ভ হল বলে—
"অযোধিয়া রামালাল্লা কী জ্যা! বৃন্দাবনবিহারীলাল কী জ্যা!
উমাপতি মহাদেব কী জ্যা! রমাপতি রামাচন্দ্রা জী কি জ্যা!
প্যাবানা সুতা হনুমান কী জ্যা! মহাত্মা গান্ধী কী জ্যা!
সর্ব-অ সন্তান-কী জ্যা! জ্যায় জ্যায় হো ও-ও-ও-ও!"

সকলে একবার দুইহাতে তালির শব্দ করে প্রণাম করে। এইবার সবাই উঠে পড়লো। লুসী জমাদারনী, চমইন জমাদারনী সবাই যেখানে রামায়ণ পাঠ হয় তার বাইরে বারান্দায় জানালার কাছে হাত জোড় করে বসে থাকে।

লুসী সাঁওতাল খ্রীস্টান: কিন্তু ভগবানের নামের আবার জাতবিচার আছে নাকি? খুব ভক্তি তার। 'আরত শ্রীরামায়ণ জী কি, কীরতি কলিত

ললিত সিয় পীকি', এই ধুয়োটা তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। 'জয়' দেওয়ার সময় আর ঐ ধুয়োটা যখন গাওয়া হয় তখন সেও বাইরে থেকে চীৎকার করতে ছাড়ে না।…গলা হচ্ছে গরুড়জীর। তাঁর আসল নাম সন্ধ্যা দেবী। রামায়ণের সময় তাঁর গলা, আর সকলের স্বরকে ছাপিয়ে ওঠে। আরতির যেখানে "গরুড়কে হি কী' কথাগুলি আছে, সেই জায়গাটিতে এলেই তাঁর সুর সপ্তমে চড়ে। তার উপর তাঁর নাকটাও গরুড়ের ঠোঁটের মতো। সেই-জন্য সকলে ঠাট্টা করে তাঁকে গরুড়জী বলে ডাকতে আরম্ভ করে। এখন এমন হয়েছে, যে সকলে তাঁর আসল নাম ভুলে গিয়েছে। জমাদারনীরা পর্যন্ত তাঁকে গরুড়জী বলে ডাকে। প্রথম প্রথম তিনি রাগ করতেন, এখন সয়ে গিয়েছে।…সেই একদিন লুসী জমাদারনী 'কাপড়া গুদাম' থেকে, গরুড়জীর নামে শাড়ি নিয়ে এসেছিল—সেদিন কী কাণ্ড! যে খাতায় জেলের জিনিসপত্তর পাওয়ার পর নাম দস্তখত করতে হয়, সে খাতা তুলেই দেখে লেখা—গরুড়জী—একখানা শাড়ি। আর যাবে কোথায়! ভদ্রমহিলা কেঁদে-কেটে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে বসে থাকলেন। জমাদারনী তাঁকে অপমান করেছে এই বলে জেলর সাহেবকে চিঠি লিখে পাঠালেন। আরও লিখেছিলেন যে লুসী অন্য মেয়ে কয়েদীদের কাছে, বিড়ি আর খয়নি বেচে। লুসী তো অপ্রস্তুতের একশেষ। জেলর সাহেব এসে লুসীকে ক্ষমা চাওয়ালেন গরুড়জীর কাছে। তারপর তাঁর রাগ পড়লো। কিন্তু তার নাম আর বদলালো না…

বিলু ছোটবেলায় আমাদের কত রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছে। মর্নিং স্কুলের সময়, আর গরমের ছুটির সময়, দুপুর রোদে পুড়তে পুড়তে টেপীর মা, দুর্গার মা, আর জিতেনের মা—দিদি, আসতেন আশ্রমে—বিলুর রামায়ণ মহাভারত শোনার জন্য। বিলুর রামায়ণ পড়তে ভালো লাগত না। ও চায় মহাভারত পড়তে। কিন্তু জিতেনের মা—দিদি, এসেই আরম্ভ করবে—"ওরে বারিন্দিরের ব্যাটা, তোকে বলেছি না যে আমরা পুণ্যবান না, আমরা কাশীরাম দাস শুনতে চাই না। নিয়ে আয় রামায়ণখানা। রামায়ণ হল এক জিনিস, আর এ হলো এক জিনিস।" বিলু বলে, "থাম না জ্যাঠাইমা, এইখানটা একটু শেষ করে নি।" মাথা আর শরীর দুলিয়ে

তুলিয়ে বিলু পড়ে চলে—"কাঁদে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনি, নয়নের-অ নীর-অ ঝরে···" বিলুর চোখে জল এসে গিয়েছে। যখনই এখানটা পড়বে তখনই ওর চোখে জল আসবে। আর অমনি টেপীর মা বলবে, "আহা ৺বিজয়াদশমীতে জন্মেছিল কি না—তাই হয়েছে ওর বর্ষার ধাত।" সত্যিই পড়তে পড়তে কত জায়গায় যে ওর চোখে জল আসতো তার ঠিক নেই। আমরা বুড়ো মাগী, ছেলের মা; ষষ্ঠী-মঙ্গলবার করি; ধর্ম-কর্মের বই পড়ে কোথায় আমাদের চোখের জলে বুক ভেসে যাওয়ার কথা। তা না এ পোড়া চোখে কি জল আসতো? বিলু লুকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, চোখের জল মুছে ফেলবার চেষ্টা করতো। নীলু খানিক দূরে উবুড় হয়ে শুয়ে সব দেখতো, আর চেঁচিয়ে উঠতো, "মা ছাখো দাদা কী করছে।" জিতেনের মা—দিদি তাকে তাড়া দিয়ে থামিয়ে দেন। বলেন, "ঘরের কোণের ভাঙ্গা হাঁড়ি, বলে আমি সব জানি। আপনি থামুন তো।" কিন্তু নীলুকে থামানো যায়? সে হেসে, চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করে। মহাভারতখানা ননকু বাঁধিয়ে এনে দিয়েছিল স্কুলের দপ্তরীর কাছ থেকে। তার প্রথম পাতায়, বিলুর হাতে লেখা দু-লাইন "খোদ-ই মালেক—মা। বকলম বিলু।" যত মেলেচ্ছ পণ্ডিতী ফলানো হয়েছিল মহাভারতখানার উপর! দুর্গার মা বলতো, "এবার বিলুর একটা টিকি রেখে দাও। মহাভারত পড়ার সময় বেশ টিকিটা নাচবে। ওরে সংক্রান্তি-বামুন, খুব দুলে দুলে পড়িস, বুঝলি।" লজ্জায় বিলু তাঁদের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। নীলু এদিকে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে—'টিকি ধরে মারবো টান উড়ে যাবি বর্ধমান'। জিতেনের মা দিদিও বলে, "হ্যাঁ ভাই, এবার নীলুর পৈতেটা দিয়ে ফেল।"···

হ্যাঁ, বিলুর এত ঠাকুর দেবতায় ভক্তি, হঠাৎ যেন বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মতো উড়ে গেল। বিলুর তাই, নীলুরও তাই। কিছুদিন এমন হল যে, পৈতে না হলে জীবনটাই যেন বৃথা হয়ে যাচ্ছে। সময়ে অসময়ে বিলু সেই কথাটা পাড়ে, আর বলে—'তোমাদের পৈতে না দেওয়ার মতলব। পৈতে তো ন'বছর বয়সেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এ বছরে একটি মাত্র তো দিন আছে।" পৈতের পরেও দেখেছি, নিয়মিত সন্ধ্যা, গায়ত্রী, পূজো

একাদশী। কতদিন পর্যন্ত খাওয়ার সময় কথা বলত না, বাজারের খাবার খেত না, কোথাও ভোজেভাজে খেতে যেত না। কত নিষ্ঠা! কত বিচার-আচার! ছোটোবেলা থেকেই ওর পূজোআচ্চায় ঝোঁক। কত শ্লোক, স্তোত্তর ওর মুখস্থ ছিল। চার বছর বয়সের সময়, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আর "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে" গড়গড় করে বলে যেতে পারতো। এইতো বড় হয়েও—পৈতের আগের বছর—আমি রয়েছি রান্না-ঘরে, ওরা দুভাই শোবার ঘরে বিছানা চটকাচ্ছে, আর পাশ বালিশ নিয়ে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করছে। এরই মধ্যে হঠাৎ বিলুর চীৎকার শুনলাম। "মা, মা, শীগ্‌গির এসো।" কী আবার হল? হাত-পা ভাঙলো নাকি? সাপ বিছে নয়তো? ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করে মরি। উনুনের তরকারি উনুনেই থাকলো। পড়ি কি মরি, গিয়ে দেখি—নীলু স্থির হয়ে বিছানার উপর বসে রয়েছে—নাপিতের সামনে মাথা ন্যাড়া করার সময় লোকে যেমন করে বসে থাকে তেমনি করে। বিলু নীলুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। দুজনেই ভয়ে আড়ষ্ট। বিলু এক হাত মুঠো করে কনুই-এর উপর কী যেন চেপে ধরে রয়েছে। আমি যেতেই দেখালো নীলুর হাতে বাঁধা ছিল মা পূর্ণেশ্বরীর মাদুলি একটা রুদ্রাক্ষ, আর চাকা করে কাটা এক টুকরো হরতুকি। সুতোটা ছিঁড়ে গিয়েছে। ওরা জানতো মাদুলি হাতে বাঁধা না থাকলে, আর এক পাও চলতে নেই, চললেই নীলুর অমঙ্গল হবে। বললো, "মা শীগগির একটা সুতো ঠিক ক'রে নিয়ে এসো।" মাদুলি আবার হাতে বাঁধা হল। তারপর দুই মহারথী বিছানা থেকে নামলেন।

সেবার মহাত্মাজীর টুরের সময়, ঠিক মানসাহী পুলের উপর যেই আমাদের মোটরখানা উঠেছে, সম্মুখেই দেখি ধুলো-কাদা মাখা ল্যাংটা ছেলে। হঠাৎ মোটরকার দেখে ভয় পেয়েছে। কী করবে ঠিক না করতে পেরে, এদিক-ওদিক একটু দৌড়বার চেষ্টা করলো। তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে রাস্তার মধ্যিখানে শুয়ে পড়লো। ভগবানের দয়ায় তারা রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু যখন মোটর থেকে নেমে তাদের ওঠাতে গেলাম, দেখি তারা ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই চোখ খুলে চাইবে না।

বিলু নীলু দুটি ভাইয়ের কথা মনে করে, তখন আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মনটা একটু শান্ত হল। কী কাণ্ডই আর একটু হলে হয়ে যেত! এর পর যখনই বিলু নীলুর কথা এক সঙ্গে মনে পড়েছে, তখনই চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে, ঐ অসহায় ধুলোমাখা ছেলে দুটোর সেই রূপ।...

ভগবান, তোমার উপর বিলু নীলুর এত বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস কেন কেড়ে নিলে?...বিলু যেদিন প্রথম আশ্রমে সন্ধ্যার কীর্তনে গেল না, আমি ভাবলাম বুঝি মাথা-টাথা ধরেছে। জিজ্ঞাসা করি, তো বলে যে শরীর ভালো আছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বর-জারিও না—তবে হল কী? পরে যখন বুঝলাম তখন বুক চাপড়ে মরি। বিলুর যখন এমন হল, তখন পৃথিবীতে সবই সম্ভব। এত আর নীলুর পৈতে ফেলার মতো উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। নীলু হল গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে—ও নিজের খেয়ালেই থাকে। ওর মাথা গরম দেখলে, আমি মনে মনে হাসি, উনি এসেছেন তম্বি দেখাতে। আরে আমি তো আর তোর পেটে জন্মাই নি, তুই আমার পেটে জন্মেছিস। তোর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানবো না তো আর কে জানবে? আজকে চটেছিস, কাল সকালেই তোর রাগ পড়ে যাবে। ছোটবেলা থেকে তোর গোঁয়ারতুমি দেখে আসছি। সেই ছোটবেলায়, মুদীখানার ফেলে দেওয়া কাগজের ঠোঙ্গাতে পা লাগলেও নীলু প্রণাম করতো। ভুলে পঞ্জিকা ডিঙিয়ে ফেলে, মুখ কাঁচুমাচু করে, আমার কাছে এসে তার পাপের কথা বলতো—আমার কাছ থেকে বলিয়ে নিতে চাইতো যে অজান্তে করলে পাপ হয় না। একদিন আমি রান্নাবাড়ির কাজ শেষ ক'রে রাত্রে সোডা দিয়ে এণ্ডির কোকুন সেদ্ধ করছি, এমন সময় বিলু ডাকলো,—"মা দেখো নীলুর কাণ্ড!" ছেলেদের পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গিয়েছে, পড়াশুনোর বালাই নেই। ভাবলাম একটা নতুন কোন ফন্দি আবার হয়তো নীলুর মাথায় ঢুকেছে। গিয়ে দেখি ফ্রেমে বাঁধানো মা সরস্বতীর ছবিখানাকে নীচে রেখে তার উপর নীলু চাপা দিয়েছে বাড়ির সব কখানা জুতো। আমি তো অবাক! নীলু কখনও একাজ করতে পারে? ও যে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় প্রত্যহ আমাকে প্রণাম করার

আগে সরস্বতীর ছবিখানাকে প্রণাম করে। এই পটখানায় যে প্রতি বছর সরস্বতী পূজোর দিন পূজো হয়। এখনও চন্দনের দাগ লেগে রয়েছে। ওরে ডাকাত পিচেশ, তোর এ দুর্মতি হল কেন? বিলু বলল যে অঙ্কে ফেল করেছে বলে, রাগে নীলু এই কাণ্ড করেছে। কী বদরাগী ছেলে বাবা! অঙ্কে ফেল করেছিস, তা এ কাণ্ড করার দরকার কী? পড়িসনি-শুনিসনি, সারা বছর খেলে বেড়িয়েছিস, তা অঙ্কে ফেল করবি না? কতদিন বলেছি না যে, ওঁর কাছে বসে একটু অঙ্ক-টঙ্ক দেখিয়ে নিস! জবাবে ছেলে বলে কিনা, "যদি পড়েই পাস করবো, তবে মা সরস্বতীর খোশামোদ করতে যাব কেন? না পড়া ছেলেকেই যদি পাস করাতে না পারে তবে আবার ঠাকুর কিসের?" বলে, ছেলে গোঁজ হয়ে কোণের দিকে বসে থাকলো। বিলু তখন জুতো-টুতো সরিয়ে গঙ্গাজল ছুঁইয়ে পটখানিকে আবার দেওয়ালে টাঙিয়ে দিল। আমি পাঁচটা পয়সা মা সরস্বতীর ছবিখানায় ঠেকিয়ে তুলে রেখে দিলাম, যে ঐ গোঁয়ার গোবিন্দর রাগ পড়লে, তাকে দিয়ে পূজো দেওয়াবো বলে। নীলুর এসব খামখেয়ালী কাণ্ড ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু বিলুর কীর্তনে না যাওয়া, দেবে দ্বিজে ভক্তি মন থেকে মুছে ফেলা, আমাকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছিল। বিলুর আমার ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস ছিল। ছোটোবেলায় লক্ষ্মী পূজোর দিন, তার লাটিম আর মার্বেলের উপর আমাকে দিয়ে মা লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা আঁকিয়ে নিত। না হলে অনেক লাটিম আর অনেক মার্বেল হবে কী করে? সেই বিলু এমন হয়ে গেল—আর আমারই চোখের সমুখে! আমি চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের কাছে বলি, ভগবান, বিলুর তুমি একি করলে? ওদের বাবার কানে যাতে এ কথা না পৌছায় তার জন্য কত চেষ্টা করি। কিন্তু ও ছেলে কীর্তনে যাবে না—একথা আর কদিন চেপে রাখা যায়? আমি লুকিয়ে বিলুর খাওয়ার জলের সঙ্গে পূর্ণেশ্বরীর খাঁড়া ধোয়া জল আর চরণামৃত মিশিয়ে দিই, আর বলি, মা পূর্ণেশ্বরী, আমার ছেলের দোষ নিও না।…আর সে মানুষই বা কী? তুমি হলে ওদের বাবা। ওদের ভুল ভ্রান্তি হয়, ওদের একটু বুঝিয়ে দিলেই পারো। তোমার বোঝানোর কাছে তো ওদের জারিজুরি চলবে না। কিন্তু

উনি মুখ খুলে কিছু বলবেন না। ছেলেদের ভালমন্দর ঠিকে যেন আমারই একার। ঐ এক ধরনের মানুষ!……

……এইরে, আবার সব এল জ্বালাতন করতে। এখন লোক দেখলে আমার গা জ্বালা করে, একথা এদের বলিই বা কী করে বোঝাই-ই বা কী করে।……

কাম্‌লা দেবী এসে আমার নাড়ীটা টিপে ধরলেন।…কতই না নাড়ী দেখতে জানো! সে তো আর আমার জানতে বাকী নেই। স্বামী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তার, কাজেকাজেই উনি ভাব দেখান যে উনিও কিছু ডাক্তারি জানেন। মিছে এ গুমোর কেন? উনিও তো মাস্টার ছিলেন। আমি তো একদিনের জন্যও মনে করি নি যে তাঁর পরিবার বলে, আমিও পণ্ডিত হয়ে গিয়েছি। উনি কংগ্রেসের কত বোঝেন—তাই বলে কি আমিও বলবো যে আমিও বুঝি।

কাম্‌লা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কেমন আছেন?" রাগে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে যায়। আমার জন্যে তোমরা যা ব্যস্ত তা তো বুঝি—তবে আবার এ ঢং কেন? রাগের জ্বালায় জবাব দিই, "যা ভাবছেন, তার এখনও অনেক দেরি আছে। তেমন বরাত করে কি আর পৃথিবীতে এসেছি, যে সবাইকে ফেলে থুয়ে, ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং করতে করতে স্বর্গে চলে যাবো। তাহলে তো হয়েই ছিল। গুষ্টিসুদ্ধু না খেয়ে তো আর আমি পৃথিবী থেকে নড়ছি না।"

কাম্‌লা দেবীর নাড়ী টেপা মাথায় চড়ে গেল। তার হাত আলগা হয়ে এল। টপ করে আমার হাতখান বিছনায় পড়লো। হাতে ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছে। উঃ গেছি গেছি! কী ব্যথা লাগে হাতে! মাথার বাঁ কানের পিছনে, মাথার ভিতরটা, মনে হয় যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। বালিশ থেকে মাথা তুললে বাঁ দিকটা যেন টাল খেয়ে ধপ করে আবার বালিশের উপর পড়ে যায়। কানের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত শব্দ অষ্টপ্রহর চলেছে।…আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি কাম্‌লা দেবীকে। ওসব মোড়লি ফলিও ঐ রামায়ণের দলের মধ্যে যারা তোমার সব কথা শুধু শোনে না, হাঁ করে গেলে। ওদের মধ্যে গোটা কয়েক তো না কিছু বোঝে,

না কিছু জানে। অনসূয়াজীকে সেদিন দিয়েছিলাম চা করে। বললো, "সর্দি হয়েছে; একটু আদা নুন দিয়ে 'চাহা' করে দেবেন?" নিলো তো নিজেরই ঘটিতে করে চা-টুকু। তারপর যেমন করে ঘটি থেকে আলগোছে জল খায়, অমনি করে হড়হড় করে মুখে আলগোছে ঢেলে দিয়েছে চা-টুকু। আর যাবে কোথায়? মুখ জিভ পুড়ে-টুড়ে একাক্কার। তৈরি করা চা-টুকু ঠিক করে খেতে জানে না, তার আবার বিদ্যের বড়াই। ও দলের সব সমান। আর একজন ঐ যে সারলা দেবী, সেটারও যদি একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে। তার বাপের বাড়ি রূপৌলী থানার বুড়হিয়াধনকট্টা গ্রামে। গ্রামটি নাকি খুব বড়। কত বড় তাই বোঝাতে গিয়ে সেদিন বললো কি না—গ্রামে হাকিম-হুকুম, দারোগা পুলিশ, হৈজার ডাক্তার[১] (কলেরার), এরা অহরহ যাতায়াত করে। এত বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে গাঁয়ের কুকুরগুলোর পর্যন্ত এসব দেখে দেখে সয়ে গিয়েছে—হাফপ্যাণ্ট পরা লোক দেখলে তারা আর ডাকে না পর্যন্ত।" ধন্যি দেশ তোমাদের, আর ধন্যি তোমার বুদ্ধি। এইগুলো নিয়ে আবার কাম্‌লা দেবী মোড়লি করে, দল পাকায়। কাম্‌লা দেবী এসেম্বলির মেম্বার কিনা। ইংরিজী জানে না। কি করে যে হাততোলা ছাড়া, সেখানকার অন্য কাজ চালায়, তা তো বুঝি না। নর্মদাবেন সেদিন আমায় বলছিলেন যে কাম্‌লা দেবী চায় না যে বিহারে কোনো লেখাপড়া জানা মেয়ে কংগ্রেসে আসুক। তাহলে ওর কদর কমে যাবে কিনা। সেইজন্য ও এই বোকাগুলোকে নিয়ে জটলা করে। কথাটা হয়তো ঠিকই। ও টিনের বিলাতী দুধকে বলে 'মেমিয়াকে দুধ' (মেমের দুধ)। টিনের মাখন এখানে কাউকে খেতে দেবে না। বলে যে ওতে ডিম মেশানো আছে। তা না হলে মাখন কখনো হলদে রংএর হয়! কে ওর সঙ্গে বাজে তর্ক করবে-···

...একি কাম্‌লা দেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! ছি ছি আমি কী কাণ্ডই করলাম। উঠে বসে কাম্‌লা দেবীর হাত চেপে ধরি।···

"কাম্‌লা, আমি তোমার মার বয়সী। দোষ হয়ে গিয়েছে, কিছু মনে করো না, আমি কী আর এখন আমি আছি? এখন আমার মাথার ঠিক

১। Sanitary Inspector.

নেই, কী বলতে কী বলে ফেলেছি।” তার মাথায় হাত বুলিয়ে দি। সে চোখের জল মুছে, মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে।

জিজ্ঞাসা করি, “আমায় ক্ষমা করেছো তো?”

“কি যে বলেন। এখন শুয়ে পড়ুন।”

বলে জোর করে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আমার উপর সহানুভূতি আর দরদ তার মুখে-চোখে ফুটে বেরুচ্ছে। ঠিক যেন মেয়ে মায়ের সেবা করছে। আমার তো আর মেয়ে নেই—আমার যা কিছু ঐ বিলু আর নীলু। একটি যদি মেয়ে থাকতো! মেয়ের সাধ কি আর ছেলেতে মিটোতে পারে? যখনই মেয়ের কথা মনে হয়, তখনই মনে হয় বিলু আমার মেয়ে, নীলু আমার ছেলে। বিলুর স্বভাব মেয়েরই মতো নরম; ওর ব্যবহার সেই রকমই দরদভরা; মেয়ের মতো ওর সহ্য করবার ক্ষমতা, আর সেই রকমই ওর চোখে একটুতে জল আসে। এই দেখ না কেন, কাম্‌লা দেবীকে এত কড়া কথা বললাম; তা কি সে একটুও রাগ করলো? ওতো আমাকে পাল্টা শুনিয়েও দিতে পারতো। মুখ তো ওর কম নয়। সেদিন রসদ গুদামের অ্যাসিস্টাণ্ট জেলরকে তো কাঁদিয়ে ছেড়েছিল।·· এ ঘরের সবাই আমাকে কত ভালবাসে, আমার জন্য কত ভাবে, কত সেবা করে। আর আমি কি না ওদের মুখনাড়া দিই, ভালো মন্দ কথা শোনাই। এমন তো আমি ছিলাম না। আমার সঙ্গে জীবনে কখনও কারও ঝগড়া হয় নি। জেলের মধ্যে যেন আমার স্বভাব বদলে গিয়েছে। এখন আর আমার মুখের আর মনের উপর একটুও বাঁধন নেই।…কাম্‌লা আমাকে পাখা করছে।

সে বলে, “মিছরির শরবত একটু খান না কেন—অল্প একটু দিই।” “না”—একটু মিষ্টি কথা বলেছি কিনা, আবার মাথায় চড়ে বসেছে। এদের নিয়ে কী করি ভেবেও তো পাই না। আর খিদে পেলে নিজেই গিলবো; তখন আর কারও খোশামোদের দরকার হবে না। লুসী জমাদারনী বলছিল যে পরশু ডাক্তার বলে গিয়েছে যে চব্বিশ ঘণ্টা যেন আমার বিছানার পাশে, কিছু না কিছু খাবার জিনিস রেখে দেওয়া হয়; কখন খেতে ইচ্ছে হয় বলা তো যায় না। এদের হাবভাব দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। এ যেন

হারিন মঘাইয়া-ডোমিন-এর 'অন্‌সন' কি না। আমরা বামুনের ঘরের বারব্রত করা মেয়ে। দু-এক দিনের উপোস তো আমাদের গা-সওয়া।

ঢং ঢং ঢং করে ওয়ার্ডের ঘণ্টা বাজছে। এত রাত্রে আবার কে এল? ঘরের তালা বন্ধ করে, জমাদারনী দেওয়াল টপকে চাবিটা জমা দেয় জেলর সাহেবের কাছে। আর আমাদের ওয়ার্ডের বাইরের ফটক চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকে, ভিতর থেকে। কারও কিছু বলার হলে, বাইরে থেকে দড়ি টানে, আর ভিতরে ঘণ্টা বাজে। ঐ তো লুসী কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। আবার কিছু কাণ্ড-টাণ্ড হল নাকি? লুসীটা নিজেও কি কম নাকি? সারাদিন টো-টো করে বাইরে বাইরে ঘুরবে, রাজ্যের ওয়ার্ডারদের সঙ্গে আলাপ করবে; আর যেই আমি বললাম যে তোকে একটু তরকারি রেঁধে দি, বিলুকে দিয়ে আসতে পারবি সেলে? অমনি চোখ মুখ বড় করে বলবে, এ'মা, সে কী করে হবে? সেলে কি কোনো জিনিস পৌছুনোর জো আছে নাকি? সেখানে যে চব্বিশ ঘণ্টা কড়া পাহারার ব্যবস্থা। সেখানে গেলে কি আর আমার চাকরি থাকবে! ওরে আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! সাতকাল গেল ছেলে খেয়ে, এখন বলে ডান! তুমি তো ওয়ার্ডারের ভয়ে একেবারে জড়সড় কি না। দিনরাত ওদের সঙ্গে হাসি মস্করা চলছে। আর যেই একটা কাজের কথা বললাম, অমনি আশিটা ছুতো। আরে তুইও তো ছেলের মা। তুই-ই যদি আমার কথা না বুঝলি, তবে অন্য কেউ না বুঝলে তাকে দোষ দিই কেমন করে! ভগবান করুন, তোর যেন আমার বরাত কোনো দিন না হয়—কিন্তু হতো যদি, তো বুঝতিস। পরশু আবার বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে আমার কাছে এসে বলা হল, আপনার ছেলেকে আজ আলাদা করে রেঁধে, আলুর তরকারি খেতে দিয়েছে। একটা খবরের মতো খবর বটে। কী মহামূল্য জিনিসই দিয়েছে! সরকার একেবারে ভাণ্ডার উজার করে দানছত্তর খুলে দিয়েছে! সেই খবর দিতে এসে আবার উনি আনন্দে গলে পড়লেন।...

দরজার বাইরে থেকে লুসী চেঁচাচ্ছে—"কাম্‌লা দেবী"। "কিরে, কে এসেছিল রে?"

"রাতের ডাক্তারবাবু। জিজ্ঞাসা করে গেল যে বাঙ্গালী মাইজী কেমন

আছে। বেশী বাড়াবাড়ি-টাড়াবাড়ি হলে হাসপাতালে তার কাছে খবর দিতে। আর বেহুঁস হয়ে গেলে সবুজ শিশিটা শুঁকোতে। মন্‌চনিয়া আর গলকট্টি শুনে রাখ্। দুটোতে মিলে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে বুঝি?"

দরদ তো কত! যেমন ডাক্তারবাবুর, তেমনি লুসী জমাদারনীর। তোমাদের আর আমি চিনি না। তোমাদের সকলকে আমি এক এক করে হাড়ে হাড়ে চিনি। তোমাদের মুখে এক, আর মনে এক। উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সব সমান। দারোগা সাহেবকেই গ্যাখো না। যেদিন বিলুর বাবাকে গ্রেফতার করলো, সেদিন জেলা কংগ্রেস আফিসেও তালা লাগিয়ে দিয়ে গেল। আর আমাকে বলে গেল, "মা, আপনি আপনাদের বাড়িতে থাকতে পারেন। ওটা গভর্নমেণ্ট দখল করে নি, 'জপতো' হয়েছে কেবল জেলা কংগ্রেস অফিস।" ওমা, তিন চার দিন পরে এসে, আমাকে গ্রেফতার করে তো থানায় নিয়ে এল। বলল যে মাস্টার সাহেবের মতো আপনাকেও আটকবন্দী রাখা হবে। থানায় এনে কত খাতির! দারোগা-বাবুর কোয়ার্টারে দারোগাবাবুর স্ত্রী আমার জপ ও সন্ধ্যার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই মা, মা করে অস্থির। খাসা বৌটি: খোকাটাকে কোলে দিয়ে বললে—"আপনারা আশীর্বাদ করুন আমার এই খোকা যেন বেঁচে-বর্তে থাকে। যেমন চাকরি, রাজ্যের লোকের শাপমুন্যি কুড়ানো! আপনি মা প্রাণ খুলে একটু আশীর্বাদ করুন। পর পর দুটো কোল খালি করে চলে গিয়েছে।" আমি বলি, 'ষাট্ ষাট্ বালাই আমার! আমার কি ছেলেপিলে নেই। ভালো মানুষে কি শাপমুন্যি করে। এ ছেলে তোমার বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। এখানকার বরহমথান জানো তো,—পূর্ণেশ্বরীর মন্দিরের কাছে—ভারি জাগ্রত। সেই গাছে তোমার নাম করে একখানা ইট বেঁধে দিও।"—যাক্, সে পর্ব তো শেষ হলো। জেলে আসবার পর শুনি যে দারোগা রিপোর্ট করেছে যে, সরকারের 'জপতী' জেলা কংগ্রেস অফিস থেকে গভর্নমেণ্টকে বেদখল করে, আমি সেখানে অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম। সেইজন্য আমার উপর নাকি মোকদ্দমা চালানো হবে। আচ্ছা গ্যাখো! কী কাণ্ড বলতো। আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকতে এতবড় মিছে কথা? দারোগাবাবু নিজেই আমাকে বললো, যে আমাদের নিজেদের ঘরে থাকলে

কোনো ক্ষতি নেই—ওদিকটা গভর্নমেন্ট দখল করে নি! আবার দেখ নিজেই সাতখান করে লাগিয়েছে।...

জেলের ডাক্তারও ঐ দারোগারই মতো। কয়েদীকে লাল নীল জল দিয়ে ভাল করা, পরে তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানোর জন্য। ঠিক যেন মিয়ার মুর্গী পোষা। আবার মা বলে ডাকতে আসে। কেউ মা বলে ডাকলে তখন এমন মনটা গলে যায়, যে দুটো হক্ কথা শুনিয়ে যে গায়ের ঝাল মেটাবো, তার পর্যন্ত উপায় থাকে না। আমি রাজ্যসুদ্ধ লোকের মা; জেলার সব কংগ্রেসকর্মীর মা; আমার তো বিশ্বজোড়া ছেলে। কিন্তু মন যে বিলু নীলুর উপর পড়ে থাকে। এদের ছাড়া অন্য কোনো ছেলের মা হতে আমি চাই নি। এদের দুজনকেই বলে আমি প্রাণভরে ভালবাসতে পারিনি—তা না হলে কি আমার বিলু, এত ভালোবাসার কাঙাল! না হলে কি সে, জিতেনের মা দিদিকে 'মা' বলে? না হলে কি নীলুরা জ্যাঠাইমা বলতে অজ্ঞান। আমি চাই বিলু নীলুকে একেবারে আমার নিজের করে রাখতে, যাতে ওদের উপর আর কারও দাবি-দাওয়া না থাকে। কিন্তু আমি ওদের আঁকড়ে ধরে থাকলে কী হবে, রাজ্যের লোকে যে ওদের চায়। সকলেরই টান যে ওদের উপর। আমি কি ওদের ধরে রাখতে পারি? এমনিই তো বিলু যা অভিমানী ছেলে। 'তুই' না বলে 'তুমি' বললেই অভিমানে তার চোখ দিয়ে জল আসে। সেই উনি একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় বলেছিলেন—"বড়বাবুকে বাড়িতে দেখছি না। এখনও ফেরেন নি বুঝি?" বিলু ছিল ঘরের মধ্যে। একথা শুনে সে কেঁদেকেটে অস্থির। নীলু হলে তো হৈ চৈ করে বাড়ি ফাটাতো। দিদি, তোমার তো জিতেন, ধীরেন, হেবলু, বেলা, বৌ'রা নাতি নাতনী সবাই রয়েছে। তোমার বাড়-বাড়ন্ত লক্ষ্মীর সংসার। কোনো কিছুর অভাব নেই। কেন তুমি বিলুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে? কেন পর করে দেবে? আমার ছেলের একটুও ভাগ আমি কাউকে দেবো না। আমার তো সংসারে নীলু বিলু ছাড়া আর কিছুই নেই। চাল নেই, চুলো নেই, মাথা গুঁজবার একটু জায়গা নেই। না আছে টাকাকড়ি, না আছে ধনদৌলত। আমি তো ছেলেদের মুখের দিকে চেয়েই সব দুঃখ-কষ্ট ভুলেছি। তাও

ভগবান তোমার সইল না। ছেলে ভুলানো মন্তর দিয়ে সবাই আমার ছেলেকে পর করে দিল।...জিতেনের মা দিদিকে ঐ দেখতে ভালোমানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু মনটা যেন একেবারে জিলিপীর প্যাঁচ। অন্য বাড়ির কেউ একটা নতুন গয়না গড়াক না—সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তার সাত রকম বিন্যেস করবে। সব খবরে তার দরকার,--সোনাটা মরা সোনার মতো লাগছে—কত পান দিয়েছে--কাকে দিয়ে গড়ালে—কত ভরি ওজন—বানি কম দিয়েছো তো গড়ন ভালো হবে কি করে? বিলু নীলুর কাছ থেকে আমার সংসারের সব খবর জেনে নেওয়া চাই; তোর মা তেল দিয়ে ফোড়ন দেয় না ঘি দিয়ে—তোর মা ছাঁকা তেলে বেগুন ভাজে, না অল্প একটু তেল দিয়ে বেগুন সাঁতলে নেয়, এসব কথা জিজ্ঞাসা করতো ছোটবেলায় নীলুদের। আচ্ছা বলো! এসব খবরে দরকার কী? বিলু তো যা চাপা, কোনদিন কিছু বলে না; কিন্তু নীলু আবার আমার কাছে এসে ঐসব কথা নকল করে বলে। একেবারে হুবহু দিদির মত স্বর, দিদির মতো হাবভাব। শুনে হেসে বাঁচি না। কিন্তু দিদির কি এটা উচিত? আমার হলো অভাবের সংসার। তোমরা আপনার জন। এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করার দরকার কী? এদিকে দিদি আমাদের করেও খুব, সেকথা আমি অস্বীকার করি না। অসুখে-বিসুখে দেখাশুনা করা, ছুতোয়-নাতায় খাওয়ানো-দাওয়ানো, এসবের তো কথাই নেই। নীলু তো এখনও সেইখানেই থাকে। প্রাণ দিয়ে করবে—কিন্তু খুব করছি একথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়বে না—দিদির স্বভাবই ঐরকম। আর একটুও গম্ভীর না—বড় হলহল গলগল ভাব। বিলুকে বলবে "বারিন্দিরের ব্যাটা", নীলুকে বলবে 'মাছপাতরী', আর ওদের বাবার নাম দিয়েছে 'দাড়ি'। এসব ফষ্টিনষ্টি না করে সাদা ভাষায় নামটা ধরে ডাকলে কী হয়?...মানুষের মুখওয়ালা একরকম ডিবের বাটি আমাদের সময় ছিল—অবিকল সেই রকম মুখ। ঝিঙের বিচির মতো কাল দাঁত। এক গাদা জর্দা মুখে দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা প্যাচ প্যাচ করে থুতু ফেলা হচ্ছে। ছিলেন তো বামুন পুরুতের মেয়ে। নৈবিদ্যির চাল আর কাঁচকলা খেয়ে তো মানুষ হয়েছিলে ছেলেবেলায়। পুরুতের পাওয়া লালপেড়ে কাপড় ছাড়া, অন্য কোনো কাপড় পর নি বার বছর বয়স পর্যন্ত। বড়লোকের

বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল বলে তরে গেল। তা না, এখন আর ঠেকারে মাটিতে পা পড়ে না—একেবারে যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছেন। তোমায় ভগবান দিয়েছেন, তোমার আছে। তাই বলে যাদের নেই তাদেরও একটু মানুষ বলে ভেবো! আমিও এমন হাভাতের ঘরের মেয়ে ছিলাম না—আর হাভাতের হাতে পড়িও নি। কিন্তু অমার কর্মফল—সোনামুঠো নিলে ধুলোমুঠো হয়ে যায়। ···আচ্ছা, দিদি, বিলু তোমাকে জ্যাঠাইমা বলতো তাতে তোমার মন ভরে নি কেন? না দিদি সত্যি কথা বলি, তোমার উপর আমার একটুও রাগ নেই। তোমরা ছিলে বলে নীলু বিলু তাদের জীবনের একটু-আধটু শখ-আহ্লাদ মেটাতে পেরেছে। যখন উনি জেলে, ওদের দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না, তখন তো তুমিই ওদের থাকবার জায়গা দিয়েছো। বিলু গেলে, তোমার দুঃখ কি আমার থেকে কম হবে। তা কি আর আমি জানি না। অন্তরের থেকে যদি বিলুকে তোমায় দিয়ে দিতে পারতাম তাহলে কি দিদি বিলুকে তুমি বাঁচাতে পারতে? বিলু আমার বাঁচুক দিদি, আর তাকে তোমার হাতে দিতে আমি কিপ্টেপানা করবো না। এখন তোমারও সম্বল থাকলো কতকগুলো বিলুর স্মৃতি আর আমারও তাই। তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করেই এখন জীবনভোর কাটাতে হবে। না দিদি তোমার দয়া তোমার টান আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না। আমার ছেলেরা মাছ খেতে এত ভালোবাসে, কিন্তু আশ্রমে তো আর মাছ রান্নার উপায় নেই। আমরা বুড়ো মানুষ—গান্ধীজির কথামতো বিশ বছর থেকে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু ছেলেপিলেদের উপর জোর করি কী করে? তুমি তো দিদি আমার মনের কথা বুঝেছিলে। নিত্যি বিলু নীলুকে ডেকে মাছ খাওয়ানো; আমাকে তোমাদের বাড়িতে মাছ খাওয়ার জন্য কত জোর করে ধরা,—দিদি তোমার প্রাণের টান আমি ঠিক বুঝি। তোমার কাছে আমি জন্মে জন্মে ঋণী। তোমার নিন্দে করলে আমার জিভ খসে পড়ে যাবে না? তোমার নিন্দের কথা ভাবলেও আমার পাপ। আজ আমার মনের ঠিক নেই দিদি। বিশ্বসংসার তেতো বিষ হয়ে গিয়েছে আমার কাছে। ভাল কথা মনে আসবে কী করে? তুমিও তো বিলুর মা—তোমাকে তো নতুন করে আমার মনের অবস্থা বুঝিয়ে দিতে হবে না। বিলু

তোমাকে কত ভালবাসে, কত ভক্তি করে। বিলু যাকে একবার মা বলেছে আজকের দিনে আমি কি তার উপর রাগ করতে পারি? বিলুর মা বলে ডাকার মর্ম আমি তো বুঝি। ডাক তো নয়, ডাক শুনে সমস্ত মন ছুটে চলে যায় তার দিকে। ছেলে তো নয় এক একটি শত্রু। ছেলেদের কথা যত ভেবেছি তার অর্ধেকও যদি ভগবানের কথা ভাবতাম তা হলে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাওয়া যেত। কিন্তু যতই আঁকড়ে ধর, পিছলে বেরিয়ে যাবে। বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো। না হলে—ঐ ছেলে বিলু বারান্দায় পাটি পেতে বসে পড়ছে, আমি যদি ওর পিছন দিয়েও পা টিপে টিপে নিঃশব্দে চলে যাই, তা হলেও ও বুঝতে পারে। বলবে "মা মা গন্ধ পাচ্ছি"। আর সত্যি করেই গন্ধ পায়। যখন ছোট ছিল—আমি স্নান করে এলেই আমাকে জড়িয়ে ধরতো। বলতো, "তুমি স্নান করে এলেই তোমার গায়ে মার গন্ধ পাই।" আমি বলি, "ওরে দুষ্টু ছেলে, তোর বাসটে জামা-কাপড় পরে আমাকে ছুঁস্ না, ঠাকুর ঘরে হেঁসেলে আমার ছিষ্টি কাজ পড়ে রয়েছে।" তা কি ছেলে শুনবে—বলবে, "মট্‌কার কাপড় কি ছুঁলে নষ্ট হয় নাকি? আর নীলুটা এত বড় শয়তান, ও কতদিনের কত কথা জমিয়ে জমিয়ে রেখেছে, সেই সব কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমার পিছনে লাগবে, আর বলবে, মা তুমি দাদাকে আমার চাইতে বেশী ভালবাস। আরে পাগল তা কি হয়? মা কি কখনো এক ছেলেকে বেশী এক ছেলেকে কম ভালবাসে। ভগবানের নিয়মই যে সেরকম না। অমনি নীলু বলবে—"আচ্ছা মা মনে করো পূর্ণিয়াতে বকরাক্ষস এসেছে। সে কেবল ছেলের মাংস খাবে। আর কোন মাংস সে খায় না। প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটা করে ছেলে, তাকে যোগান দিতে হবেই হবে। আজকে তোমার বাড়ির পালা। বল, এই রকম অবস্থায় তুমি বকরাক্ষসের কাছে কাকে পাঠাবে—দাদাকে না আমাকে?" "যা যা, বকিস না তো। এতও বাজে কথা বলতে পারে। এত কথা তোর মাথায় আসে কোথা থেকে, আমি তো বুঝতেই পারি না। কাকে আবার দেবো, কাউকেই দেবো না।" অমনি নীলু 'বুঝেছি' 'বুঝেছি' বলে বাড়ি মাৎ করবে। —বুঝেছো তো ছাই। তোমরা যদি মার মনের কথা বুঝতে তাহলে আর আমার দুঃখ কিসের? না হলে কি আর নীলু আমাকে একদিন বুঝিয়েছিল,

যে মা'র ভালোবাসা স্বার্থের খাতিরে। সে কথা বোঝাতে ও গল্প বলেছিল, "একটা বিড়াল আর তার বাচ্চাকে একটা কড়ার উপর বসিয়ে, নীচে থেকে উনুনে আঁচ দেওয়া হল। আর এমন ব্যবস্থা করা হল যাতে বিড়াল পালিয়ে যেতে না পারে। যখন কড়াইটা খুব গরম হয়ে উঠলো, তখন বিড়ালটা, আস্তে আস্তে গিয়ে বাচ্চাটার পিঠের উপর বসলো।" সব মা'ই নাকি এই রকম ধরনের ; যতক্ষণ নিজের গায়ে আঁচ না লাগে, ততক্ষণই মা ছেলে ছেলে করে মরে। কোথা থেকে আজকালকার ছেলেরা যে এসব শেখে তা বুঝিও না কিছুই। আজকালকার কলেজে এই সব পড়ায় নাকি? বিলু তো কখনো এমন কথা বলে না। একথা শোনবার পর নীলুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করতেও ঘেন্না লাগে।—কিন্তু নীলুর এই কথাটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। আর একদিন ও আরও একটা কথা বলেছিল—সে কথাও কোনো দিন ভুলবো না। সেও মার স্বার্থপরতা সম্বন্ধেরই কথা। বড় ভূমিকম্পের পর অনেকদিন একটু-আধটু ছোটোখাট ভূমিকম্প হত। একদিন রাত্রে যেই একটা ঝাঁকি মেরেছে, জিতেনের বৌ ঘুমের ঘোরে, কোলের ছেলেটাকে ঘরে ফেলে, দৌড়ে বাইরে চলে এসেছে। আর যাবে কোথায়! তাই নিয়ে বাড়িসুদ্ধ লোক তো বেচারীকে ছিঁড়ে খায় আর কী! আর নীলুর পুঁজিতেও একটা গল্প জমা হ'লো, আমাকে শোনানোর। হ্যাঁ বাপু, মায়েরা স্বার্থপর, হাজাররার স্বার্থপর আর ছেলেদের ভালবাসা একেবারে নিঃস্বার্থ—একটুও ভেজাল নেই। হল তো? এই শুনলেই যদি খুশী হও তো তাই। ছোটবেলা থেকে নীলুটা কি কম জ্বালাতন করেছে আমাকে? বিলু নীলু দুভাই একই সঙ্গে মানুষ, কিন্তু নীলুটা কোথা থেকে যে এত দুষ্টুমি শিখেছিল, তাই ভাবি। কত সময় একেবারে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। দুপুরে হয়তো আমার একটু তন্দ্রা এসেছে। কোথা থেকে লক্ষ্মী ছেলে, একরাশ দোপাটি ফুলের পাকা ফলগুলো এনে, আমার নাকের সম্মুখে ফাটাতে আরম্ভ করলো। সব বীচিগুলো ছিটকে নাকে কানে ঢুকে যায়। হাঁই-মাই করে তো উঠি! আর বকলে তা গায়েও মাখে না ; ফ্যাক্-ফ্যাক্ করে হাসে। লঘুগুরুর জ্ঞান ওর একটুও নেই। নিজের খেয়ালেই উন্মত্ত। একদিন করেছে কি, এই বড় হয়ে—ছারপোকা মেরে মেরে তার

রক্ত দিয়ে, সাইনবোর্ডের মতো লিখেছে—"অহিংসা পরমোধর্ম"। আমি তো বুঝি কাকে ঠেস্ দিয়ে এ লেখা। আবার তাঁর কানে যাবে, এই মনে করে আমি ভাব দেখালাম যেন লেখাটা দেখি নি। ওরে নীলু, একদিন যখন মা বাবা থাকবে না, তখন বুঝবি যে মা বাবা কী জিনিস। দাঁত থাকতে কি দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায়? ওর বাবার মনে দুঃখ দেওয়ার জন্য নীলু করবে কী, ঠিক আশ্রমের জমির সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে, ইঞ্চি মেপে সেই-খানটায়, মাংস রেঁধে খাবে। আর বলবে, "আশ্রমের জমিতে ছাগল খাওয়া বারণ, এখানে তো আর নয়।" ওরে নীলু, মহাত্মাজী ছাগলের দুধ খান বলেই কি, আশ্রমে মাংস খাওয়া নিষেধ? আশ্রমে কেন আমিষ খাওয়া বারণ তা তুইও জানিস, আমিও জানি; তবে কেন ওঁকে খোঁচা দিয়ে এমন কথা বলবি? তুই মাংস খেতে ভালোবাসিস, আর তোদের রেঁধে খাওয়াতে পারি না, একি আমার কম দুঃখের কথা নাকি? কিন্তু আশ্রমের নিয়ম যে, কী করি? কতদিন দিদির বাড়ি গিয়ে বসে বসে বিলু নীলুর মাছ খাওয়া দেখেছি। নীলু মাছ যে কী ভালবাসে—'রেওয়া' মাছের কাঁটাখানি পর্যন্ত চিবিয়ে খায়। বিলু কিন্তু কতদিন বলেছে যে এবার মাছ ছেড়ে দেবো; আমি আর দিদিই বলে বলে ওকে ছাড়তে দিই নি। এমনিই তো যা চেহারা।...দিদির বাড়িতে তাও তো দু-চার দিন একটু-আধটু মাছ পেটে পড়ে। ছোটবেলায় আমাদের দেশে, আমরা ভাবতেও পারতাম না, বিনা মাছে লোকে কী করে একবেলাও ভাত খেতে পারে। আমার ছেলেদের এ অবস্থায় তো আমরাই নিয়ে গিয়েছি। তারা বাংলা দেশে থাকলোও না, সেখানকার কথা, আচার-ব্যাভার কিছু জানলোও না। এরা সাঁতার কাটতে জানে না; বয়া, হিজল, গাব এসব গাছের নাম শোনে নি। একদিন ছেলেদের কাছে দেশের 'ঢপ-কীর্তনের' কথা বলেছিলাম। নীলু তো 'ঢপ' নাম শুনে হেসেই আকুল। বলে এমন বেঢপ নামও তো কখনও শুনি নি। বিলুকে একদিন বলেছিলাম 'তিজেল'টা ওঘর থেকে এনে দিতে। জিজ্ঞাসা করলো 'তিজেল' কী মা? আমাদের দেশের কচি ছেলেটা পর্যন্ত যে কথাটা জানে, এরা কখনও সেকথা জানে না। বারো মাসে তেরো পার্বণ কী এরা জানে? বিলু আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসব জিজ্ঞাসা করে। ওর সব জিনিস

জেনে নেওয়া চাই। মা, 'দেল' কোন পূজোকে বলে? চড়কের দিন ছোটবেলায় তোমরা কী করতে? গাজন গানের সুর কেমন? তোমাদের গাঁয়ে বৈরাগী ছিল? রাজ্যের খবর তার দরকার। কবে মনেও নেই বিলু তখন ছোট, ওর কাছে গল্প করেছিলাম যে আমাদের গাঁয়ের নিখিল চৌধুরী পিচাশসিদ্ধ হতে গিয়ে শ্মশানে মারা গিয়েছিল। সেদিনও দেখি ও সেই কথা গল্প করলো। বিলুকে যদি জিজ্ঞাসা করি, ওরে কি করবি এত সব গল্প শুনে, তো বলবে—"তোমার ছোটবেলা মুখস্থ করবো।" আমার ছোটবেলা মুখস্থ করবি কিরে? এমন মিষ্টি করে ছেলে কথা বলতে পারে। শুনলেই মনটা আনন্দে ভরে যায়। নীলুর কিন্তু এসবের বালাই নেই। তার এত সব খবর শুনবার সময় আর ধৈর্য কোথায়? দিনরাত টো-টো করে বেড়াবে; মধ্যে মধ্যে এক একবার হুড়মুড় করে ঢুকবে বাড়িতে। টান মেরে ফেললে জামাটাকে। হুকুম হল, মা গেঞ্জিটায় সাবান দিয়ে দিও। মাথায় এক খাবলা তেল দিয়ে, দুঘটি জল গায়ে পড়লো কি না পড়লো, এলেন রান্নাঘরে। "এখনও ভাত বাড় নি।" কখন থেকে রেঁধেবেড়ে আমি আর বিলু ভাত আগলে ওর জন্যে বসে রয়েছি, সেকথা ছেলের খেয়ালই নেই।·· আর বিলু নিজের কাপড় জামা তো কাচেই, কতদিন ওরও কাপড় জামা সাবান দিয়ে কেচে দেয়। কার সঙ্গে কার তুলনা!

"এখন কেমন আছেন?" আঙ্গুল দিয়ে এক ঠেলা দিয়ে নৈনা দেবী আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

এরা কি আমাকে নিশ্বাস ফেলার ছুটি দেবে না? দুদণ্ড নিরিবিলিতে বিলুর কথা ভেবে তাকে একটু কাছে পাওয়ার চেষ্টা করবো, তার কি উপায় আছে? কী আমার হিতৈষী রে! এখনই পর পর সাতটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে—কলের গানের রেকর্ডের মতো। একটা প্রশ্ন শেষ হবে আবার তৈরী হতে হবে পরের প্রশ্নটার জন্য। সে সময় যদি ঘরটাতে আগুন পর্যন্ত লেগে যায়, তাহলেও নৈনা দেবী ওর সেই বাঁধা প্রশ্নগুলো করতে ছাড়বে না; দরদ দেখে মরে যাই! জবাব দিই, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ। খুব ভালো আছি, গা-বমি বমিটা নেই, মাথাধরা কমে গিয়েছে, গরম লাগছে না, পেটের মধ্যে জ্বালা করছে না, মুখের তেতো ভাবটা কমে গিয়েছে।

কম্বল বিছানা ঝেড়ে দেওয়ার দরকার নেই। হয়েছে তো? আর আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। এখন গুটিগুটি গিয়ে নিজের বিছানায় ঠাণ্ডা হয়ে শোও।" নৈনা দেবী আমার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গিয়েছে। বোধহয় ভাবছে যে মাথা খারাপ হল নাকি? একটাও কথা না বলে ও নিজের বিছানার দিকে চলে গেল। ও কারও মুখঝাম্‌টা চুপ করে সইবার পাত্তর নয়। ও আমার কথা নিয়ে একটা জটলা করবেই করবে—তা সে আজই হোক আর কালই হোক। এইতো দিন কয়েক আগে ওর মা 'ইন্‌টারভিউ'-এ এসেছিল। ও করেছে কি—সাবান, পেন্সিল, খাতা, মাখন, কিস্‌মিস্‌, আরও কত জেল থেকে পাওয়া টুকিটাকি জিনিস, সব সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে জেলগেটে—মার সঙ্গে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে বলে। সেখানে সি আই ডি আর জমাদার চেপে ধরেছে—প্রথমটা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। বলেছে যে এসব আমার নিজের জিনিস। কেন বাইরে পাঠাতে দেবে না? তখন সি আই ডি বলেছে যে আমার সঙ্গে আইন ফলাতে আসেন তো, এসব জিনিস নিয়ে যেতে দোবো না। আর যদি নরম হয়ে আমাকে অনুরোধ করেন, আর বলেন এসব জিনিস আপনার বাড়ির জন্যে দরকার, তাহলে আপনার মাকে এগুলো নিয়ে যেতে দিতে পারি। তখন নৈনা দেবী তাতেই রাজী। গেটের জমাদারকে কিসমিসও খাওয়ানো হল। ছাখো দেখি কী অপমানটা হতে হলো! আর অপমানটা কি ওর একার? এতে তো আমাদের সকলকার মুখেই চুনকালি পড়লো। জমাদারনী এসে সব কথা আমাদের ওয়ার্ডে বলে দিল। বহুরিয়াজী একটু মুখফোঁড় গোছের লোক। তিনি যেই না একটু নৈনা দেবীকে বলতে গিয়েছেন, আর যাবে কোথায়! একেবারে আগুন লেগে গেল। সে কী হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! বহুরিয়াজীকে এই মারে তো এই মারে! এখানে নরম মাটি পেয়েছে কিনা। সি আই ডি-র সম্মুখে এসব তেজ ছিল কোথায়? তারপর দিন পনরো ধরে চললো, ওতে আর বহুরিয়াজীর দলে কুকুর-কুণ্ডলী। ও তো একাই একশো। কথায় কী বিষ, কী ঝাঁঝ্। সেই বলে না—'মোষের সিং ব্যাঁকা; যোঝার সময় একা'। ও একাই সকলকে ঝগড়া করে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। কী জানি আবার আমার পিছনে লেগে, কী

করবে। করবে তো করবে। যা মনে হয় করুক গিয়ে, মরার বাড়া আবার গাল আছে নাকি? ভগবান আমাকে যে দুঃখ দিলেন, তার চেয়ে বেশী ও আমার কী করবে। সব জিনিসের সীমা আছে, আর লোকের দুঃখের কি আর সীমা নেই?...এমনি তো বিলুর কথা ভেবে আমার রক্ত জল হয়ে আসে,—তার উপর চমইন জমাদারনী একদিন আমাকে বললো, "বাঙ্গালী মাইজী, তোমার ছেলের সাজা নাকি, সরকার বাহাদুর নিজে ইচ্ছে করে দেয় নি। তোমারই আর এক ছেলে নাকি সাক্ষী দিয়ে এই সাজা করিয়েছে।" বলে কী এ? আমি শুনে ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে মরি। জিজ্ঞাসা করলাম, "কে বলল তোকে?" সে জবাব দিল, "নৈনা দেবী একদিন আমাকে বলেছিল যে, এই রকম একটা কথা শুনছি। বাইরের ওয়ার্ডারদের কাছে জিজ্ঞাসা করে ঠিক ব্যাপারটা কী জেনে নিস তো। বাইরে জিজ্ঞাসা করে আমি জানতে পারলাম নৈনা দেবী যা বলেছিলেন তা সত্যি। নৈনা দেবীরা তোমার কাছে বলতে বারণ করেছিল, মাইজী। কিন্তু আমি ভাবলাম যে তোমার বাড়ির কথা। সকলে জানবে, সকলে বলাবলি করবে, আর তুমি জানবে না। তা কি হয়? আমারও তো ধরম আছে। আচ্ছা মাইজী, তোমার ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া আছে নাকি? আমার দু' ভাইও একবার একটা কাঁঠাল গাছ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করেছিল। তাই নিয়ে কত থানা পুলিশ। মুঠো মুঠো টাকা খরচ হয়েছিল। সতের টাকা নিয়ে, তারপর দারোগাসাহেব মোকদ্দমা তুলে নেন। তোমাদের কি মাইজী অনেক জোতজমি মবেশী[1] আছে নাকি? সে ছেলে গান্ধীজিতে নাম লেখায় নি বুঝি? কার পেটে যে ভগবান কী সন্তান দেন—কেউ বলতে পারে না।"—শুনে তো আমার বুক শুকিয়ে গেল। বললাম, "যত সব মিথ্যা রটাচ্ছিস। তোর নামে আমি রিপোর্ট করবো।" সে বলে, "মাইজী আমি তো ভালো ভেবেই তোমাকে বলেছিলাম। হতেও পারে মিথ্যে। আমি তো যা শুনেছি, তাই বলেছি—একটা কথাও আমার মনগড়া নয়। রিপোর্ট কোরো না মাইজী তুমি। আমার পুরুখ[2] তিন বছর থেকে পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে আছে—আমার রোজগার থেকেই ছেলেপিলেরা

১। গোরু মহিষ প্রভৃতি। ২। স্বামী।

হ' মুঠো খেতে পায়।" আমি তাকে বলি, "আচ্ছা হয়েছে, যা, যা। আর খবদ্দার এমন কথা আমার কাছে বলিস না।" সে তো চলে গেল। কিন্তু তারপর থেকে, আমার মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে। এত মিথ্যাও লোকে বলতে পারে।...

ইজের পরা দাদা বিলু, ছোট্টটো নীলুকে গাল টিপে টিপে আদর করছে, নীলু-নিল্লু—পিলু-পিল্লু।...

সেই নীলু দেবে বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষী। এ তো আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারি না। নীলু গোঁয়ার, নীলু অবুঝ, নীলু খামখেয়ালী সব ঠিক,—কিন্তু সে যে দাদা-অন্ত প্রাণ! নীলু কি কখন এমন করতে পারে? সেইদিন থেকে যখনই কথাটা ভাবি আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। যদি খবরটা সত্যি হয়। জেলগেটে সেদিন ওঁর সঙ্গে ইনটারভিউ ছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মধ্যে মধ্যে খাতির করে আমাদের দেখাশুনো করতে দেয়। সেদিন ভাবলাম যে তাঁর কাছে একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করে দেখি তিনি কিছু জানেন কী না। তারপর মনে হল থাক—একথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? তিনি যদি বলেন 'নীলুর রিরুদ্ধে এমন কথা তুমিও বিশ্বাস কর?' আর ধর, যদি কথাটা সত্যি হয়। এমনিই তো তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম যে তাঁর মনের মধ্যে দিয়ে কী ঝড় বয়ে চলেছে। আমার মনে কী চলেছে, তা তো আমি জানি। তাই দিয়ে তো তাঁর মনের অবস্থাটা কিছু আঁচ করতে পারি। তার উপর লক্ষ্য করলাম যে উনি আমার মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। শেষকালে সাত-পাঁচ ভেবে আর কথাটা জিজ্ঞাসা করা হ'লা না। মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। সি আই ডি বললো, "এবার তাহলে উঠুন, সময় হয়ে গিয়েছে।"...ঘুরেফিরে কেবল এই কথাটা মনে পড়ে। নীলু কি কখন এমন কাজ করতে পারে? ও যে দাদা বলতে অজ্ঞান। ছোটবেলা থেকেই দাদা যা করবে তা ওরও করা চাই। নীলুকে যে আমি বিলু থেকে আলাদা করে ভাবতেই পারি না। নীলু বদরাগী। কখন বাইরে কী কাণ্ড করে বসে তাই ভেবে তো আমি তটস্থ হয়ে থাকি। কিন্তু সব সময় মনের মধ্যে ভরসা থাকে যে, ওর দাদা আছে ওকে সামলে নেবে।...ও যখন জেলে গিয়েছিল, তখনও মনের মধ্যে ঐ

ভরসাই ছিল। ছোটবেলায় কেউ নীলুকে কিছু বললেই, ও দাদার কাছে নালিশ করতো, "ও জাজা, ছাখো না।"...

সেই ছোটবেলায় নীলু আর বিলু হেডমাস্টারের কোয়ার্টারের আমগাছটার নীচে খেলা করছে—হামিদ দফ্তরী গেটের মধ্যে ঢুকলো। ঢুকেই দূর থেকে কুর্নিশ করার মতো করে আদাব করলো, আর বলল, "আদাব নিল্লুবাবু, একটা বুড়হিয়া মেমের সঙ্গে তোমার সাদি দেব। কাল আমাকে একটা বুড়হিয়া মেম বলছিল যে সে নিল্লুবাবুকে ছাড়া আর কারও সঙ্গে সাদি করবে না।"

"দাদা ছাখোনা আমাকে কী সব বলছে।"

বিলু নিলুকে বোঝাল, "সত্যি তো আর নয়, ও তো ক্ষ্যাপাচ্ছে। বুড়ি মেম আবার বিয়ে করে নাকি?"

নীলু বলে, "না। ও বলবে কেন?"

দফ্তরী বলে চলে—"বুড়হিয়া মেমটার অল্প অল্প গোঁফ আছে। আমাকেই বলেছিল প্রথমে সাদি করবে। তা আমি বললাম, যার দাড়ি নেই তাকে আমি বিয়ে করি না। তখন সে বললো যে, তাহলে আমাকে নিল্লুবাবুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও।"

"দাদা! ছাখো না।"

নীলু কান্নাকাটি আরম্ভ করলো। বিলু তাকে বোঝাতে বোঝাতে আমার কাছে নিয়ে এল। "বোকা ছেলে কোথাকার, ক্ষ্যাপালে বুঝি কাঁদতে হয়। তাহলে যতো কাঁদবে ততো ও ক্ষ্যাপাবে।" তারপর বিলু আমার কাছে গল্প করে—"নীলুটা একটুও বোঝে না। আমি যতো বোঝাই ততো কাঁদতে আরম্ভ করে।' যেই বিলুকে বলি, "তুমি হলে ওর দাদা, তুমি না বোঝালে ওকে আর কে বোঝাবে বল", অমনি বিলু ভারি খুশী। দাদাগিরির দায়িত্ব তো কম নয়।...

বিলু নীলুকে চোখে চোখে রাখতো। দিন কতক নীলুর শখ হল কল্কে ফুলের বীচি নিয়ে খেলার; তাকে এদেশে 'নল' কনৈ কী খেলা যেন বলে। বিলুকে বলি—"বিলু দেখিস তো বাবা, নীলুর উপর নজর রাখিস। আমার বড় ভয় করে, নীলু আবার কোনো দিন কল্কে ফুলের বীচি-টিচি না খেয়ে

ফেলে। ও বীচি বিষ জানিস তো?" বিলু পণ্ডিতের মতো বলে—"সে আর বলতে হবে না আমাকে। এই তো সেদিন নীলুরা ভেরেণ্ডার বীচি জড়ো করেছিল খাবে বলে। ওরা বলছিল যে ঐ বীচিগুলোর নাম হিন্দুস্থানী বাদাম। আমিই তো ওদের খেতে দিই নি।"……সত্যিই ছোটবেলায় বিলু নীলুকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতো না। ও তখন কত ছোট—নীলুর জামার বোতাম লাগিয়ে দেওয়া, জুতোর ফিতে বেঁধে দেওয়া, সব নিজ হাতে করেছে। সেই নীলু কখনও বিলুর বিরুদ্ধে যেতে পারে! আর যদি গিয়েও থাকে তাহলে স্বেচ্ছায় কখনই যায় নি। পুলিশের জুলুমে হয়তো গিয়েছে। ও দারোগা সব করতে পারে। হয়তো কত অত্যাচার করেছে নীলুর উপর; হয়তো জজসাহেবের সম্মুখে বিলুর বিরুদ্ধে বলার সময় ওর বুক ফেটে গিয়েছে, চোখে জল এসে গিয়েছে। কিন্তু বোধহয় না বলে উপায় ছিল না। না, নীলুর সাক্ষী দেওয়া, একি একটা বিশ্বাসের মতো কথা! কিসের থেকে কী শুনেছে চমাইন জমাদারনী,—আর তাই সাতখান করে এসে লাগিয়েছে। নীলু যদি তাই করে থাকে তাহলে ও ছেলের আর আমি মুখ দেখবো? যেখানে দুচোখ যায় সেখানে চলে যাব। আমার মন বলছে যে এমন হতেই পারে না। আর মায়ের মন কি কখনও ভুল বলে?…

সেই কপিলদেওএর বিয়ের সময় বিলু নীলু গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। আমার ইচ্ছে নয়, যে ওরা যায় সেখানে। তখন তো ওরা ছোট। আবার গিয়ে অসুখ-বিসুখে পড়বে; ওদের বাড়ির আচার-ব্যাভার জানা নেই, কী করতে কী করে বসবে; কিন্তু যেদিন থেকে দহিভাত গ্রামের নাপিত, হলুদ মাখানো সুপারি ওদের হাতে দিয়ে গিয়েছে, সেদিন থেকেই ওরা বায়না ধরলো যে ওরা বিয়েতে যাবে। কপিলদেওএর বাবা তখন বেঁচে। তিনি একদিন এসে গরুর গাড়ি করে ছেলেদের নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে আট দশ দিনের বেশী ছিল না। কিন্তু কী যে শিক্ষা সে দেশের, ঐ কদিনের মধ্যে যা তা সব গান শিখে এসেছিল।…উঠানের একদিকে বসেছে নীলু—আর একদিকে বিলু। দুজনেরই সম্মুখে একটা করে পুরানো বিস্কুটের টিন, আর হাতে একটা করে কাঠি। তাই দিয়ে টিনটা বাজাচ্ছে।

নীলু বলল, "এবার কিন্তু দাদা, 'বকড়ীকে পাঁচ টেং'টা আর বাজাব না। 'তকাই-কে তাকা-তুম মকই-কে লাওয়া'[1]-টাও না। এবার বিয়ের সময়ের গানটা হবে।" দুজনে বাজাতে লাগল। বিলু গাইছে "কপিলদেওকে পাঁচ বিয়া, ছঠ্মা[2] চুমৌনা[3]।" বিলু বরপক্ষ। আর উঠোনের অন্য কোণ থেকে কন্যাপক্ষ নীলু পাল্টা জবাব দিচ্ছে, "বাজাতে যাও ধাঁই ধাঁই—কপিলদেওকে বহুকে ছঠ্মা সাঁই[4]।" খুব বকলাম ওদের। এই সব ছাইভস্ম ছোটলোকদের গান ভদ্দরলোকের ছেলেরা গায় নাকি? বিলু একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। নীলু বলে, "দহিভাতে তো সহদেওদের বাড়ির সব ছেলে মেয়েরা গায় এই গান। তারা ভদ্দরলোক না বুঝি।" আমি জানি যে নীলুকে যে কাজ যত বারণ করবে, ও ছেলে সে কাজ ততো বেশী করে করবে। বিলু তো আমার কথা বুঝেছে। এখন ও থেমে গেলে একা নীলু আর কতক্ষণ চালাবে? ওর তো আছে কেবল নকলনবিশী। বিলু থামবার পর নীলু খানিকটা বাড়াবাড়ি করে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গাইতে লাগল, "তকাইকে তাকাতুম্ মকইকে লাওয়া"; তারপর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পরে ঘর থেকে শুনছি যে সে দাদার কাছে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করছে, "দাদা, গানটা সত্যিই খারাপ নাকি?" দাদা বলে দেবে খারাপ, তবে খারাপ হবে! দাদার কথাই বেদবাক্যি, আর আমি যে এতক্ষণ বোঝালাম, মানা করলাম, চীৎকার করে মরলাম—সে কথা কথাই না…

…আজকাল বড় হওয়ার পর কতদিন দেখেছি—দু'ভাই ঘরে বসে গল্প করছে। আমি হয়তো একটা কিছু বলবার জন্য কিংবা গল্প করবার জন্য গিয়েছি। অমনি নীলু ক্যাট-ল্যাট করে ইংরাজীতে দাদার কাছে কী যেন সব বলবে। বলে হো-হো করে হেসে উঠবে। আমি বুঝি যে আমার সম্বন্ধে একটা কী যেন বলা হল—কিছু ঠাট্টা-ঠাট্টা হবে বোধহয়। আর ইংরেজী করে গুরুজনের নামে কিছু বললে তো দোষ হয় না! কী শিক্ষাই

১। ভুট্টার খই। ২। ষষ্ঠ। ৩। এই অঞ্চলে প্রচলিত নিকার মতো একপ্রকার বিবাহপ্রথা, ইহাতে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর ভিতরে বিধবাদের, এই প্রথায় বিবাহ হয়। উচ্চতর সমাজে এই বিবাহ ভালো বলিয়া গণ্য হয় না। ৪। স্বামী।

সব হয়েছে! বিলু বলে, "মা রাগ করো না। নীলু রাগের কথা কিছু বলে নি। কেন নীলু মিছিমিছি মাকে চটাস ?"

আমি আর তোদের কাছে কী চাই? দুটো মিষ্টি কথা বলেও উপ্‌গার করতে পারিস না? দিনের মধ্যে কত গল্পইবা নীলু তুই আমার সঙ্গে করিস? তাও কি ঐ ঠ্যাঙ্গা-মারা ঠ্যাঙ্গা-মারা কথা না বললেই নয়? আবার হাসছিস, লজ্জা করে না! ছোটবেলা থেকেই একই রকম থেকে গেলি। 'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনশ্চ ন মুঞ্চতি।' নীলু আবার হেসে ওঠে ; ভুল বলেছি বুঝি।

"জমাদারীন! জমাদারীন! এ মন্‌চনিয়া! বাঙ্গালী মাইজী ঘুমচ্চে নাকি?"

কোথায় জমাদারীন, কোথায় মন্‌চনিয়া। জমাদারীন বারাণ্ডার উপর ঘুমিয়ে পড়েছে, আর মন্‌চনিয়া আমার পাশে বসে ঢুলছে। নর্মদাবেনের কথার কে জবাব দেবে? আর জবাব না দিলেই ভালো। না হলে আবার খানিকক্ষণ মনচনিয়া হয়তো আমাকে জ্বালাবে। নর্মদাবেনের বাড়ি আহমদাবাদে। খুব বড়লোকের মেয়ে। বিলেত ফেরত; হাবভাব ও পোশাকটি ছাড়া বাকী সব, মেমসাহেবদের মতো। মহাত্মাজীর আদরের শিষ্যাদের মধ্যে তিনি একজন। গায়ের রং ফুটফুটে ফর্সা, পরনে খদ্দরের শাড়ি। জামসেদপুরের মজুরদের সেবার জন্য বিহারে এসেছিলেন। সেখান থেকে গ্রেফ্‌তার হন। আমাদের ওয়ার্ডের সম্মুখেই আছে একটি ছোট ঘর। আগে ঘরখানি আঁতুর ঘরের জন্য কিংবা কারও ছোঁয়াচে রোগ হলে, তাকে আলাদা রাখবার জন্য ব্যবহার করা হত। নর্মদাবেন ইংরাজীতে কথা বলে : কাজেই সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে ওর খুব আলাপ। তাঁকে বোলে ও ঐ ঘরটায় চলে গিয়েছে। সেখানে একলাই থাকে। বড়লোকের মেয়ে ; এখানে আমাদের সকলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে ওর একটু অসুবিধা হচ্ছিল। ঘরখানাকে খুব সাজিয়েছে। কত পর্দা, কত টেবিল ক্লথ। চারিদিকে ফুলের বাগান করেছে। দিনরাত্তির সেই বাগানে টুকটাক কাজ করছে। প্রত্যহ কত ফুল আমাকে দিয়ে যায়। এখনও মাথার কাছে রয়েছে ওরই দেওয়া একটা কাঁচের ঘটির মধ্যে কত ফুল। ফুলগুলো যেন কাগজের

ফুলের মতো দেখতে। একটুও গন্ধ নেই। বিলু থাকলে নিশ্চয়ই নাম বলে দিত। আশ্রমে বিলু কত যে ফুলের গাছ পুঁতেছিল তার কি ঠিক আছে? যে কোনো নতুন মরশুমী ফুল ফুটবে, আমাকে সে ফুলের নাম শোনানো, ওর চাই-ই চাই। আমার কি ছাই অত ইংরাজী নাম মনে থাকে? নর্মদাবেনের বিলুরই মতো ফুলের শখ বলে তাকে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু সে আমাকে এত ফুল দেয়,—আমি ফুলের মর্ম কী বুঝি? এতো কেবল 'বেনাবনে মুক্ত ছড়ানো।' বিলুকে যদি রোজ সেলে কিছু ফুল পাঠাতে পারত, তবে তো বুঝতাম তোমার ইংরিজির জোর। নর্মদাবেন সাহেবকে বললে, সাহেব নিশ্চয়ই প্রত্যহ সেলে ফুল পাঠাবার অনুমতি দিত। সেই মনে করেই নর্মদাবেনকে একদিন বিলুর ফুলের শখের কথা গল্প করেছিলোম। সেকথা ওর মাথায় ঢুকবে কেন? বিলেত গিয়ে কি ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিল? বিদ্যে হল এক জিনিস, আর বুদ্ধি হল আর এক জিনিস। সেইদিন থেকে একরাশ করে ফুল, আমার এখানে দিয়ে যায়। আর সাহেবের কাছে অনুরোধ করার সময়, করা হল কিনা নিজের 'ইউরোপীয়ান' ডায়েটের জন্য। সাহেব প্রত্যহ নর্মদাবেনের জন্যে নিজের বাড়ি থেকে, একখানা করে চোকল্-ভরা আটার পাঁউরুটি পাঠিয়ে দেয়। আর আমার মনের কথা ওকে পরিষ্কার করে বলতেও কেমন বাধবাধ লাগে। ও মেয়ে কিন্তু বড় লেক্‌চার দেয়। কথকঠাকুরের মতো যখন তখন দিনের বেলায় এসে আমাদের বোঝাবে সত্য আর অহিংসার কথা। হিন্দী তো বলেন আমারই মতো! ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে কী সব বলে, তার অর্ধেক কথা ছাই বোঝাও যায় না। কেবল মধ্যে মধ্যে কানে আসে সত্য, অহিংসা আর বাপুজী। যদি এসব লেকচারই দিতে হয়, তাহলে কথকঠাকুরের মতো মিষ্টি করে এসব বলতেও শিখতে হয়। গান্ধীজির আশ্রমে এসব লেকচার শেখায় নাকি? না—বিলু তো একবার গিয়েছিল সবরমতীতে—সে তো সেকথা কখনও বলে নি। আচ্ছা এত লোক থাকতে নর্মদাবেন আমাকেই কেন এসব কথা বেশী করে শোনাতে আসে? ওকি ভাবে যে আমি সত্যি কথা বলি না; না অন্যর গয়নাগাঁটি দেখে হিংসায় ফেটে মরি। আরে ওসব কথা আমাকে কী শোনাবে। আজ বিশ বচ্ছর ধরে ওসব

শুনতে শুনতে কানে পোকা পড়ে গিয়েছে। কত বক্তৃতা বলে শুনলাম—আর নর্মদাবেন ভাবছেন যে আমাকে নতুন কথা শেখাচ্ছেন···সেই প্রথম প্রথম যখন নতুন আশ্রম হল তখন উনি আমাকে এসব কথা কত বুঝানোর চেষ্টা করতেন! আমার মন তখন নীলু বিলু আর সংসারের উপর পড়ে রয়েছে। ওসব কথা জানবার আমার ইচ্ছেও নেই, বুঝতেও পারি না। এ কান দিয়ে শুনি, ও কান দিয়ে বেরিয়া যায়। আমার লাভের মধ্যে একটু কেবল মনে হত, যে এর মধ্যে দিয়ে তাঁর একটু কাছে আসতে পারছি। উনি চিরকালই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ওঁর সঙ্গে কি কোনোদিন প্রাণ খুলে কথা বলতে পেরেছি? মন খুলে কথা বলবো কী—ভয়েই মরি। আমাদের তো ঠিক অন্য সবার মতো নয়। স্বামীর সঙ্গে মনে যে কথা আসবে সে কথা না বলা,—হাসি এলে হাসি চাপা, সব সময় এই কী করে ফেললাম এই কী করে ফেললাম ভাব, এর দুঃখ ভুক্তভোগীই জানে।···তিনিই আমাকে শেখাতে আরম্ভ করলেন—চরখার কথা উঠলে, মহাত্মাজীর কথা উঠলে, দেশের কথা উঠলে হিন্দুস্থানীদের সম্মুখে কী বলতে হবে। এদেশে তো আর কেউ 'চরখা আমার ভাতার পুত, চরখা আমার নাতি', একথা বুঝবে না—এখানে তো অন্যরকম কথা বলতে হবে। তাই উনি হিন্দীতে কত ছড়া শিখিয়েছিলেন। ওঁরা কত জায়গায় নিত্যি লেকচার দেন,—ওঁদের ঐ সব ছড়া-পাঁচালির দরকার হয়।—কবেকার কথা হল ভুলেও গিয়েছি ছাই! একটা কী যেন ছিল;—স্বামীর আবার দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে। বৌ তা বুঝতে পেরেছে। পেরে বলেছে, "ইচ্ছে যখন তোমার হয়েছে তখন বিয়ে করো। আমার জন্য ভাববার দরকার নেই; আমার তো চরখা সম্বল থাকলো।" এরকম আরও কত গল্প উনি শিখিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যে আমিও হয়তো তাঁর মতো লেকচার দিয়ে বেড়াতে পারবো। পরে যখন উনি বুঝলেন যে আমার দ্বারা এ সব কিছু হবে না, এ কেবল ভস্মে ঘি ঢালা, তখন উনি হাল ছেড়ে দিলেন। আমিও হাল ছেড়ে দিয়ে বাঁচলাম। তুমি সব ছেড়েছুড়ে এদিকে এসেছো, বেশ করেছো, আমি তো তাতে বারণ করি নি। আমাকে সারাজীবন কষ্ট সইতে হবে, তার জন্যও আমি তৈরী। জেলে আসতে বলেছো, জেলেও

এসেছি। তাই বলে এক হাট লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে "পেয়ারে ভাইয়োঁ", সে আমার দ্বারা হবে না। তোমার আশ্রমের সংসার চালানো, ছেলে মানুষ করা সেও তো একটা কাজ।

রামগড় কংগ্রেসের আগে, তোমার কথা শুনে বাভনগামায় গিয়ে কী অপ্রস্তুত কী অপ্রস্তুত!—পাটনা থেকে চিঠি এসেছে যে শীগ্‌গির জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবিকা পাঠাও। জোর তাগিদ এখনই তাদের ট্রেনিং দিতে হবে, নইলে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তারা তৈরী হতে পারবে না। মহারাষ্ট্র থেকে একজন ভদ্রমহিলা এসে রামগড়ে বসে রয়েছেন, স্বেচ্ছাসেবিকাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। গেল রাজ্য, গেল মান! জেলার ইজ্জত আর বুঝি বাঁচে না। জেলে যাবার মতো মেয়েছেলে তো বলতে গেলে জেলায় পাঁচটি—আমি, হরদার দুবেইন, বহুরিয়াজী, বুড়হিয়াধানকাট্টার সরলা দেবী, আর চোপড়ার খাদিজুন্নিসা; তাঁরও আবার চোখে ছানি পড়ায়, কয়েক বছর থেকে আর বাড়ি থেকে বেরুতে পারেন না! সরস্বতী তো এবারে এসেছে।...... তখন আমার উপর হুকুম হল যে কোড়হা থানার সব কংগ্রেসকর্মীর বাড়ি বাড়ি যাও। জোর করে তাদের বাড়ির মেয়েদের দস্তখত 'স্বয়ং-সেবিকা-প্রতিজ্ঞাপত্রে' করিয়ে আনতে হবে। ব্যাটাছেলেরা গেলে হবে না, তোমাকেই যেতে হবে।...যারা যাবে তারা কেমন ফাঁকি দিয়ে বিনা পয়সায় কংগ্রেস দেখে নেবে; কোনো রকম বয়সের বন্ধন নেই; বেশী বয়সী ভদ্রমহিলা হলে তাঁকে খুব হালকা কাজ দেওয়া হবে, যেমন অন্য স্বেচ্ছাসেবকদের ছেলেপিলে সামলানো, ভাঁড়ারের চাবি রাখা, কিংবা ঐ গোছের কিছু; এই রকম কত টুকিটাকি উপদেশ উনি যাবার সময় আমাকে দিয়ে দিলেন। ভলাণ্টিয়ার মিস্ত্রি, আমায় গোরুর গাড়ি হাঁকিয়ে তো বাভনগামায় নিয়ে এলো। দুপুরবেলায় পাড়ার সব মেয়েছেলেরা ঝা-জীর বাড়ির উঠোনে জড়ো হয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে গল্প করছি—কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবিকা হওয়ার কথা। কতরকম কথা, সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করছে—জুতো না পরলে চলবে কিনা; ঘোড়ায় চড়তে হবে কিনা; সিঁদুর লাগানো, আর 'এতোয়ার'[১] করা বারণ কিনা; আরও কত অবান্তর প্রশ্ন। তারপর জনকয়েক রাজী হল—অবিশ্যি

১। রবিবার

যদি তাদের ব্যাটাছেলেদের আপত্তি না থাকে সেই সর্তে। আবার ছুটলাম বাড়ির কর্তাদের কাছে। সকলের সঙ্গে মোটামুটি জানাশোনা আগে থেকেই ছিল—কত দিন তারা সব আশ্রমে গিয়ে থেকেছে। তারাও প্রথমটা আমতা আমতা করে, পরে যেই একজন রাজী হয়ে গেল, অমনি সকলেই রাজী। আমি তখন প্রতিজ্ঞাপত্রগুলো নিয়ে আবার গেলাম বাড়ির ভিতর, সেগুলিতে দস্তখত করানোর জন্যে। কালি এল, কলম এল, কয়েকজনের দস্তখত, টিপসই হল। ঝা-জীর মেয়ে শকুন্তলা ফর্মে দস্তখত করবার আগে কাগজখানা জোরে জোরে পড়লো—"মৈ দেশকে বাস্তে হর তরহকী কুর্বানীকে লিয়ে তৈয়ার হু"।[১] "অ্যাঁ, কুর্বানী কি? এটাতো ঠিক বুঝলাম না। হ্যাঁ বাঙ্গালী মাই, দেশের জন্য সব রকমের কুর্বানী করবো, একথাটা লিখিয়ে নেওয়া কি তোমার ঠিক হল?" প্রথমে সবাই ছিল নরম। বেলগরামিয়ার নানী প্রথমটা একটু চটে আমাকে বলল, "আমরা অতশত মহাৎমাজী-ফহাৎমাজী বুঝি না; এ তোমার কেমন ব্যবহার? তোমরা মুসলমান হতে চাও হওগে না, আমাদের জাত নিয়ে টানাটানি কেন? এই কম্মর জন্য তুমি আশ্রম থেকে এতদূরে উজিয়ে এসেছ? ছি! লজ্জাও করে না। গরু হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবতী…। আমাদের জাত মারবার দস্তখত করা প্রমাণ নিয়ে যেতে এসেছো"—সবাই মিলে আমার উপর পড়ল। আমারও এ কথার কোন উত্তর যোগাল না। সত্যিই তো কুর্বানীর কথা এতে লেখা থাকবে কেন? উনি আসবার আগে এত কথা বুঝিয়ে দিলেন আর একথাটা বুঝিয়ে দিলেন না। বোধহয় হিঁদুদের প্রতিজ্ঞাপত্রের বদলে মুসলমানদের প্রতিজ্ঞাপত্র এসে গিয়েছে। আমার তখন ভয়ে গা দিয়ে ঘাম বেরুতে আরম্ভ হয়েছে। ওদের বোঝালাম যে আমি তো হিন্দী জানি না, বোধহয় কাগজ বদল হয়ে গিয়ে থাকবে। তাদের রাগ কি তবু পড়ে? তারপর বাইরে ঝা-জীর কাছে গিয়ে বললাম, "আর একদিন আসতে হবে, অন্য প্রতিজ্ঞাপত্র সঙ্গে করে।" ঝা-জী প্রতিজ্ঞাপত্র পড়ে হেসেই খুন। বলে, "এতো ঠিকই লিখেছে। হিন্দীতে কুর্বানী মানে ত্যাগ।" ঘ্যাখো দেখি কী কাণ্ড! কোথায় কুর্বানী আর

১। "আমি দেশের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি"।

কোথায় ত্যাগ! আমি কি ছাই অত জানি! আমি না হয় না জানতে পারি, উঠোনে মেয়েছেলেদের মধ্যে কেউ ও কথার মানে জানে না? তবে অমন কথা লেখার দরকার কী? যাদের জন্য লেখা তারাই বোঝে না, তবুও লেখা চাই। নম নম করে তো সেদিনকার কাজ শেষ হল। আমি আশ্রমে ফিরে এসে বললাম, "এই রইল তোমাদের কাগজ। এ কাজের পায়ে শতকোটি দণ্ডবৎ! আর যদি আমি কোনো কংগ্রেসের কাজে বাইরে গিয়েছি।" নীলু এ নিয়ে আমাকে কত ঠাট্টা করে।...

সখাবতীজীর ছেলেটা চ্যাচাচ্ছে, "বাংগাজী, বাংগাজী"। আমাকে বলে বাংগাজী। আমার ভারি ন্যাওটা। দিনরাত্তির আমার কাছে ঘুর-ঘুর করবে—মতলব কোলে চড়ে বসে থাকা। খুব যখন দুষ্টুমি করে, আর কথা শোনে না, তখন ওর মা ওকে আমার কাছে দিয়ে যায়। আমার কোলে চড়ে শান্ত। ছেলেটাকে নিয়ে এলে হত। মনচনিয়া তো কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন তো ওর জাগবার কথা না। এখন ডিউটি গলকট্টির। সেটাও তো দেখচি পাখা হাতে করে পাশে বসে ঢুলছে। সারাদিন 'ডালের খুদ বাছা'র কম্যাণ্ডে কাজ করেছে। এখন সারারাত কি জেগে থাকতে পারে? জেলে এসেছে বলে তো ঘুম-টুমগুলো বাড়িতে থুয়ে আসে নি। কীই বা দোষ করেছিল? এক লক্ষ্মীছাড়া স্বামীর অত্যাচারে জলেপুড়ে ও গিয়েছিল আত্মহত্যা করতে। ক্ষুর দিয়ে নিজের গলাটা নিজে কী করেই কেটেছিল! ভাবলেও গা-টা শিউরে ওঠে। এখনও গলার দিকে তাকানো যায় না। ঘা-টা নেই। কিন্তু গলার নলী কেটে এতখানি হাঁ হয়ে রয়েছে। নলীর ভিতরটা দেখা যায়। ঐ কাটাটার উপর চব্বিশ ঘণ্টা একখানা গামছা দিয়ে চেপে বেঁধে রাখে। বলে যে, না হলে কথা বলার সময় ফ্যাস্‌ফ্যাস্ করে তার মধ্য দিয়ে হাওয়াটা বেরিয়ে যায়, আর খাওয়ার সময় তা'র মধ্যে দিয়ে খাওয়ার জিনিস বেরিয়ে আসে। এমনি গামছা জড়ানো থাকলেই জল খাবার সময় গামছাটি অল্প ভিজে যায়। ছাখো দেখি একবার পোড়াকপালীর বরাতখানা। মরলে নিজেও বাঁচতো, স্বামীটারও হাড় জুড়াতো। তা মরলোও না, কিছুই না। মাঝ থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করার জন্য এক বছরের জেল হয়ে গেল। কী যে

এদের আইন! নিজের প্রাণটার উপরও অধিকার নেই। যে মরতে চায় না তাকে দেয় ফাঁসি; আর যে মরতে যায়, তাকে নিয়ে আসে ধরে জেলে।

ছেলেটা পরিত্রাহি চীৎকার করছে। ওটা গলা ফেটে মরলো—ওর মায়ের কী আক্কেল বলত! আহা! ছেলেটা আজকে সরাদিন আমার কাছে আসতে পায় নি। সখাবতীজী ছেলেকে বলছে—'লাড্‌লী-ই বাঙ্গাজীকে পাস 'জ্যাভ্‌ন কী'—বাঙ্গাজীর কাছে যাবে নাকি লাড্‌লী। 'বাঙ্গাজীর যে আজকে অসুখ করেছে। কাল সকালে যেও। অসুখ করলে তার কাছে যেতে হয় নাকি?' ছেলেটা খানিকক্ষণ চুপ করে বোধহয় কথা-গুলো বুঝবার চেষ্টা করছে। তারপর আবার আরম্ভ হয় তার কান্না। "বাঙ্গাজী…"। সখাবতীজী চটে গিয়েছে ছেলের উপর। "ঐ ত্যাখো ওখানে গলকট্টি আছে। ধরে নেবে।" ছেলেটা চুপ করে; বোধ হয় ভয়ে। আবার হয় একটানা চীৎকার "বাঙ্গাজী-ই…"। "আবদার! কী জেদ বাবা ছেলের। এতটুকু ছেলের এত জেদ।"…ঠাস ঠাস করে ছেলেটাকে মারছেরে। মা'টার কী একটুও দয়ামায়া নেই! গলকট্টি, এই গলকট্টি শীগ্‌গির লাড্‌লীকে এখানে নিয়ে আয় তো। গলকট্টি ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় জবাব দেয়, "ও ছেলে কি আমার কোলে আসবে নাকি!" গলকট্টিটা কী কুঁড়ে! ঘুম আসছে, উঠতে ইচ্ছ করছে না—একটা ছুতো দেখানো হল। আমার গলকট্টিকে ডাকতে শুনে, বহুরিয়াজী, কাম্‌লা সবাই এসে জিজ্ঞাসা করে, "কী বলছেন, একটু জল খাবেন নাকি?" এইরে! কেন মরতে গলকট্টিকে ডাকতে গেলাম! এরা সব এখানেই চুপটি করে বসে আছে তা কি আমি জানি। সত্যিই তো গলকট্টিকে দেখে তো ছেলেটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। লুসী জমাদারীনের কাছ থেকে কাপড়কাচা সাবানের বদলে আমাদের ওয়ার্ডের সকলে মধ্যে মধ্যে বিড়ি নেয়। আর গলকট্টিকে সেই বিড়ি দিয়ে সবাই মিলে মজা ত্যাখে—কাটাটার মধ্যে দিয়ে কী করে ধোঁয়া বেরোয়। গলকট্টিকে চারটে বিড়ি দিলে, সে একবার গলার গামছা খুলে ধোঁয়া বের করে দেখাবে; লাড্‌লী কিন্তু এইসব দেখে ভয়ে নীল হয়ে যায়, আর আমাকে আঁকড়ে ধরে। আরে, ওতো ছেলে মানুষ, অনেক বয়স্থ লোকেও সে দৃশ্য দেখলে ভির্মি খেয়ে পড়ে যায়।…

আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বহুরিয়াজী, ঢুলন্ত গলকট্টিকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বাঙ্গালী মাইজী কী বলছিল রে?"

"মাইজী বলছিল লাড্‌লীকে নিয়ে আসতে।"

"তা বলতে হয়। আমিই নিয়ে আসছি তাকে। গলকট্টি, তাহলে তুই ঐ দরজার উপর গিয়ে খানিকটা বোস। তুই থাকলে তো ও ছেলে এখানেও চেঁচাবে। লাড্‌লী ঘুমিয়ে পড়লে, আবার এখানে এসে বসিস'খন।"

গলকট্টি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বহুরিয়াজী ছেলেটাকে এনে আমাকে দিল। লাড্‌লী একেবারে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে। শুবি নাকি, শুয়ে পড়, আমি একটু পাখা করি। রাতদুপুরে লক্ষ্মী ছেলেরা জেগে থাকে নাকি? কী কথা শোনে আমার লাড্‌লী! কোথায় গেল কান্না, কোথায় গেল আবদার; লাড্‌লী আমার বুক ঘেঁষে শুয়ে পড়েছে। আমি ওর হাতে, শোয়া অবস্থাতেই নর্মদাবেনের দেওয়া একটা ফুল গুঁজে দিই। আর বলি, কাল সকালে সব ফুলগুলো দেবো। ও হাতের ফুলটা ফেলে দেয়। ওর এখন ফুলেরও দরকার নেই, কিছুরই দরকার নেই। ও যা চাচ্ছিল, তা পেয়েছে। একটু পাখা না করলে আবার মশায় খেয়ে ফেলবে। পাখা খুঁজছি দেখে বহুরিয়াজী একটু কাছে এসে বসল—পাখা করতে। এতক্ষণ সাহস পাচ্ছিল না—পাছে আবার আমি চটে যাই। আচ্ছা এ ছেলেটা আমাকে ভালবাসে বলে সখাবতীজী কি আমার উপর বিরক্ত হয়? মনে তো হয় না। তবে আমি কেন জিতেনের মা-দিদির উপর বিরক্ত হই? আমার চাইতে তো সখাবতীজীর মন অনেক ভালো বলতে হবে। সাধে কি আর নর্মাদাবেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অহিংসার বুকনি ঝাড়ে। বহুরিয়াজীও লাড্‌লীটাকে ভারি ভালোবাসে। ওর ছোট মেয়ে লজ্জার সঙ্গে লাড্‌লীর খুব ভাব ছিল কিনা। লজ্জার বয়স ছিল বছর পাঁচেক। কিন্তু সে মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। গ্রেফ্‌তারের পর বহুরিয়াজী চেয়েছিল যে লজ্জা যেন তার চাচীর কাছে থাকে। ও মেয়ে কিছুতেই মায়ের আঁচল ছাড়বে না। মহা মুশ্‌কিল। এদিকে তিন বছরের উপরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জেলে আসবার নিয়ম নেই। দারোগাও বলে যে রেখে আসুন। তখন বহুরিয়াজী বাধ্য হয়ে দারোগার সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে যে কে বলল যে এর বয়স তিন বছরের উপর।

মেপে ছাখো। দেড় হাত উঁচু মেয়ের কখনও পাঁচ বছর বয়স হতে পারে? ওকে সঙ্গে না যেতে দাও তো দেখি তুমি আমাকে কী করে ধরে নিয়ে যাও। এখনি স্বরাজী ভলাণ্টিয়ারদের দিয়ে তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিয়ে দেবো। দারোগাসাহেব ভাবলেন, দরকার কি এসব ফ্যাসাদে। লজ্জাকে সুদ্ধু সঙ্গে করে এনে জেলে পুরলেন।···দিনরাত লাড্‌লী আর লজ্জা একসঙ্গে খেলা করতো। খেলা আর কি—লজ্জাটা লাড্‌লীকে কোলে কাঁখে করে নিয়ে ঘুরতো। এখানে তো আর বেশী সঙ্গীসাথী নেই। মিশতে হলে অন্য ওয়ার্ডের, ছোটলোকের বদ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে হবে। তাদের আবার নানারকমের খারাপ রোগ। চব্বিশ ঘণ্টা নিজেদের মধ্যে গালিগালাজ করছে। তাদের সঙ্গে কি আমাদের ছেলেমেয়েদের মিশতে দিতে পারি। তাই আমরা সবাই ওদের অষ্টপ্রহর চোখে চোখে রাখতাম। আহা রে, মেয়েটা কদিনের রক্ত আমাশায় মারা গেল। মায়ের প্রাণ তো—বহুরিয়াজীর তারপর কী দুঃখ কী কান্নাকাটি। কেবল নিজের বুক চাপড়ে মরে, আর বলে—যদি আমি ওকে সঙ্গে করে না আনতাম, তাহলে হয়তো লজ্জার আমার এদশা হত না। লাড্‌লীটাও লজ্জা মারা যাবার পর থেকে, যেন দিন দিন শুখিয়ে উঠছে। জেল থেকে ছেলেটা আধসের করে তো দুধ পায়। তাও আবার জেলের দুধ। মাখনতোলা মোষের দুধ জল মিশিয়ে, কণ্ট্রাক্টর নিয়ে আসে। তারপর গেটে, গুদামে, ওয়ার্ডে, যত জায়গা হয়ে দুধটা আসে, সব জায়গার ওয়ার্ডার, মেট, পাহারা আর কয়েদীরা, সবাই তার থেকে এক এক গ্লাস করে দুধ নিয়ে, কাঁচাই ঢকঢক করে খায়। এ একেবারে বাঁধা নিয়ম। আর এর মধ্যে কিছু লুকোচুরি নেই। কেবল একটা বাধ্যবাধকতা আছে; যিনিই এক গ্লাস দুধ তুলে নেবেন, তাঁকে মেহনত করে দুধের ড্রামের মধ্যে ঠিক এক গ্লাস জল মিশিয়ে দিতে হবে। সেই দুধ যখন এখানে এসে পৌঁছোয়, তখন তা এমনি জিনিস হয়ে দাঁড়ায় যে তা খেয়ে আর ছেলেপিলে বাঁচতে পারে না। ছোট ছেলেপিলেদের না দেয় জেল থেকে কাপড়-জামা, না দেয় খাওয়ার জিনিস; বোধহয় ভাবে যে যারা দুধ ছাড়া অন্য জিনিস খেতে শিখেছে, তাদের আবার মার সঙ্গে আসবার দরকার কী? দিব্যি পরিষ্কার উত্তর!···

আহা ছেলেটার পেটটা একেবারে পড়ে রয়েছে। কেন, মা রাতে খাওয়ায় নি নাকি? আমার জন্যে খাবার তো মাথার কাছে রেখে দিয়েছে। দেবো নাকি কিছু খেতে? না থাক, ওসব খেয়ে আবার অসুখ-বিসুখ করবে, তখন আবার ওর মা ঠেলা সামলাতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়বে। কী নরম গা টা! বিলু যখন ছোট ছিল, এমনি করে কোল ঘেঁসে শুয়ে থাকতো। ঠাকুরের কোলে ও বসে—সেই ফটোখানা যখন তোলা হয়, তখন ও এত বড়ই হবে। ও কিছুতেই চুপ করে বসবে না। দূর থেকে আমি এক টুকরো মিছরি দেখালাম। সেই কথা ভেবে ও যখন মনের আনন্দে মশগুল, তখন নিতাই-ঠাকুরপো ওর ফটো তুলে নিল। সে কী আজকের কথা! অসুখের পর কী রোগা হয়ে গিয়েছিল! চব্বিশ ঘণ্টা খাই খাই মন করে;—তা বলে মুখ ফুটে গাঁ-গাঁ করে কান্নার অভ্যাস তো ওর কোনো দিনই ছিল না। আমি হয়:তো ওকে তক্তাপোশের উপর বসিয়ে রেখে ভাঁড়ারে কি রান্না ঘরে গিয়েছি, আর সেখানে কোন কাজে আটকে পড়েছি। খানিক পরে এসে দেখি, ছেলের দুচোখ দিয়ে জল পড়ে বুক ভেসে যাচ্ছে। নিচের ঠোঁটটা একটু যেন বাইরে বেরিয়ে এসেছে, আর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমাকে দেখে ছেলের কী অভিমান, কী অভিমান! "আমার আসতে দেরি হয়েছে বলে কাঁদছিস। মরে যাই, মরে যাই—কী লক্ষ্মী ছেলে আমার বিলু" এই বলে ওর মাথাটা বুকের দিকে টেনে নিলাম। আর ছেলে আমার ঠাণ্ডা—মধ্যে মধ্যে খালি একটু ফোঁপানির শব্দ। এখনও যেন সেই ফোঁপানির গরম ভিজে নিশ্বাস, থেকে থেকে গলার কাছে লাগছে। লাড্‌লী, তুই আমার সেই ছোটবেলার বিলু নাকি। তোর নরম নরম গাটাকে দেব নাকি একবার সেইরকম করে চটকে। না এরা সব দেখছে। আবার কী মনে করবে। বিলুকে এখন যদি একবার পেতাম, তাহলে একবার নিতাম বুকের মধ্যে টেনে। যতটুকু সময়ের জন্যে হোক না কেন, বুকটা তো একটু জুড়োতো। দুজনে একসঙ্গে কেঁদে মনে একটু শান্তিও তো পেতাম। শেষ সময়টায় কাছে থাকবো, এ উপায়টুকুও ভগবান রাখলে না। চারিদিকে লোহার গরাদ আর তালা। যুদ্ধে শুনি এত লোহা লাগে। বিলু গল্প করেছিল যে যুদ্ধের সময় কোথায় যেন গির্জার ঘণ্টা গলিয়ে কামান তৈরী করা হয়। আর

তাদের কি জেলের এই রাশি রাশি লোহার উপর নজর পড়ে না? এত-গুলো পোড়া বুকের নিশ্বাস যে যমের সিংহাসনও টলিয়ে দিতে পারে!

"বহুরিয়াজী, আচ্ছা সত্যি করে বলতো—ভগবান কি আমার উপর অবিচার করেন নি?"

বহুরিয়াজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এ প্রশ্নটার জন্য সে তৈরী ছিল না। সে আমার কথার উত্তর দিল না। একবার নৈনা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে, কী যেন ইসারা করলো। তারপর আমার মাথার চুলগুলোর মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আঙুল চালিয়ে দিতে লাগলো, আর জোরে জোরে পাখা করতে লাগলো। তোমার কাছে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম বটে কথাটা, কিন্তু জবাব চাইও নি, আশাও করি নি!

লাড্‌লীটা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এতটুকু ছেলে, কিন্তু নাক-ডাকানি ঠিক বড় মানুষের মতো। আহা রে! একদিকে কাত হয়ে শুয়েছে, আর রুপোর চাকতিগুলো কেটে কেটে যেন পেটের চামড়ার মধ্যে বসে গিয়েছে। কোমরের ঘুন্‌সির সঙ্গে, একরাশ রুপোর চাকতি ঝুলিয়ে রাখবে! সখাবতীজী ভাবে যে এতে বড্ড বাহার হয়। কতদিন বলেছি যে এটা জেল-খানা, এখানে হাজার রকম স্বভাবের লোক থাকে, রুপোর লোভে কোন দিন ছেলেটাকে কি করে-টরে বসবে, তখন আর কেঁদে কূল পাবে না। তা কি সখাবতীজী শুনবে। ঐ ঘুন্‌সির মধ্যে ওর কী তুকতাক আছে কে জানে!......

বিলু যখন ছোট ছিল ওর কপালের উপরের চুলগুলোকে ছোট্ট একটা বিনুনি বেঁধে দিতাম। রোগা ছিল কিনা,—খেলেই পেটটা গণেশ ঠাকুরের মতো উঁচু হয়ে উঠতো। ওকে ভুলোবার জন্য খাওয়ার পর বলতাম, "ব্যাস্ এইবার হয়ে গেল—এইবার উঠতে হবে—বা-বা-রে!" অমনি নিজের পেটটা দেখিয়ে বলবে, "বাতাবি বাতাবি করে দাও!" কবে একদিন ওর পেটে হাত বুলিয়ে বলেছিলাম "বাতাবি ভস্মরাশি! বাতাবি ভস্মরাশি! সব হজম হয়ে যাবে—বিলুবাবুর আর অসুখ করবে না।" সেই কথা মনে করে রেখেছে। ভাত খাবার পর সেইজন্য ওকে প্রত্যহ পেটে হাত বুলিয়ে 'বাতাবি' করে দিতে হবে। তারপর পিঁড়ি থেকে উঠবার সময় হাঁটুর উপর

ভর দিয়ে বলবে "বাবারে।" একেবারে বুড়ো মানুষের মতো ভাব—যেন ওর উঠতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।...

কতদিনের কত ছোট ঘটনা, একের পর এক মনের মধ্যে আসছে। বিলু এত কষ্ট করে তোকে মানুষ করে তুলেছিলাম—এমনি করে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবি? আমার দুঃখের কথা মনে করে তুই শেষ সময়টায় দুঃখ পাস্নে যেন। এমনই তো তোর কষ্টের বোঝা, আমি কিছুতেই হালকা করতে পারলাম না। এখন তার মনের উপর দিয়ে কী যাচ্ছে, তা কি আমি বুঝি না। তার উপর আমার কথা মনে করে, তোর যদি বুকের বোঝা বাড়ে, তাহলে আর আমার দুঃখের শেষ থাকবে না। তুই এখন মনে কর্ যে তোর মা তোকে একটুও ভালবাসতো না।

নৈনাদেবী বহুরিয়াজীর সঙ্গে গল্প করছে—স্বরটা একটু গরম গরম—"তাহলে বাপু ভগবানকে এর মধ্যে টানা কেন? সাজা দিলে সরকার, আর উনি দোষ দিচ্ছেন ভগবানের। সেই গল্প আছে না—এক বামুনের এক ঘোড়া ছিল। বামুনের প্রতিবেশী ছিল এক ধোপা। বামুনমশাই যেই পূজা করতে বসতেন অমনি ধোপার গাধাটা বিকট চীৎকার আরম্ভ করত—বামুনঠাকুর তাই চটে-মটে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন—'হে ভগবান, ছ্যাখো, এই গাধাটা কিছুতেই তোমার পূজা করতে দেবে না। তোমাকে ডাকতে গেলেই ওটা বাধা দেয়। ওকে তুমি মেরে ফ্যালো।' দিন কয়েক পর বামুনঠাকুরের ঘোড়াটা অসুখ করে মরে গেল। তখন বামুনঠাকুর ভগবানকে বললেন—'ভগবান, এতদিন ধরে ভগবানগিরি করলে, কিন্তু এখনও কোনটা ঘোড়া কোনটা গাধা চেনো না'—এ হয়েছে তাই! ভগবানের এর সঙ্গে কী সম্বন্ধ?"

নাক না টিপেও নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করা যায়, কিন্তু কানে আঙুল না দিয়ে শোনা বন্ধ করা যায় না কেন? এখন কানে আঙুল দেওয়াও ভালো দেখায় না। সবাই দেখছে।...ও বিষমুখীকে আমি চিনি না! ও বহুরিয়াজীর সঙ্গে গল্প করছে না আরও কত। খানিক আগে ওর সঙ্গে একটু রুখে কথা বলেছিলাম কি না, তারই বিষ এখন ঝাড়া হল। তখনই আমি জানি, ওকি ছেড়ে কথা বলবার মেয়ে। একটা রাতেরও সবুর

সইল না। আজকে রাতটার জন্যেও আমাকে মাফ করতে পারলে না। তুমিও তো ছেলের মা! যে না পদের গল্প ; না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। কোথাকার শোনা গল্প ; মনে করলো যে খুব পণ্ডিতী ফলালাম। একি, নৈনা দেবী এরই মধ্যে চুপ করে গেল যে। বোধ হয় বহুরিয়াজীর কাছে আমল পেল না।···

বিলু নীলুর কেবল ছোটবেলার কথাই মনে পড়ে কেন? বোধহয় ওরা আমার কাছে সেই ছোট্টটি থেকে গিয়েছে।···

···দুজনে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আমি কাজকর্ম সেরে ঘরে ঢুকে বললাম, "কেয়া বচকন আওর ছট্‌কন, ঘুমতে হো"? বিলু বচকন্ আর নীলু ছট্‌কন্। অমনি দুজনে হো-হো করে হেসে উঠবে। আর নীলু বলবে, "কতদিন মাকে বলে দিয়েছি, হিন্দীতে ঘুমতে হো মানে ঘুমোচ্ছো হয় না, ওর মানে হচ্ছে ঘুরছো, তাও মার মনে থাকবে না।" বিলু বলবে, "বোকা কোথাকার। ওতো মা জেনে-শুনে ইচ্ছে করে বলেছেন—আমাদের হাসানোর জন্যে।"···এত টুকু টুকু ছেলে ; দুজনে কী গম্ভীর হয়ে পণ্ডিতের মতো আলোচনা করে। সেই সময় যদি ওরা এই গান্ধীজির রাস্তায় না আসতো! আসা না আসার ভার কি ওদের উপর? সে তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এখন যদি একবার বিলুর বাবাকে কাছে পাই তাহলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিই, যে ছাখো, বাপ হয়ে ছেলেদের কী পথে এনেছ? সারাটা জীবন আমার একই রকম গেল। নিজে একদিন শান্তি পেলাম না। ছেলেদের একদিন হাসিখুশী ফুর্তিতে থাকতে দিতে পারলাম না। সারাজীবন ধরে যে উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এসেছি, সে কি এরই জন্যে? ছেলেরা যখন ছোট ছিল, তখন ইচ্ছে হয়েছে যে এদের টেনে বড় করে দি। বড় হলে ওরা নিজের রাস্তা বেছে নেবে--ব্যাটাছেলের আবার ভাবনা কী? তারপর ওরা ঘর সংসার করবে। সে কথা ভাবলেও শান্তি! কিন্তু হল কী? বড় ছেলেটাকে তো পড়ালেই না! আর যেটা পড়লো সেটারও এই দিকেই মন। এবার জেল থেকে বেরোতে দাও—আর আমি নীলুকে এই রাস্তায় থাকতে দি'! ছোট ভাইএর কাছে লাথি-ঝাঁটা খেতে হয় সেও স্বীকার, তবু নীলুকে সেইখানে পাঠিয়ে দেবো। একটা কিছু

রোজগারের ব্যবস্থা সে নিশ্চয়ই করে দেবে। আমাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিলে; আমি তোমার আশ্রমের হোটেলে দাসীবাঁদীরও অধম হয়ে চালিয়ে যাব চিরকাল—তাই বলে আমার ছেলেকে আর আমি এর মধ্যে রাখি! অনেক মুখ বুঁজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আমার সহ্য করার দাম কড়ায় ক্রান্তিতে চুকিয়ে দিয়েছ। তোমার হুজুগ, তোমার শখ গান্ধীজির সেবা করা; আমার কথা, ছেলেদের কথা একবার ভেবেছ? এক একদিন এক এক হুজুগ তোমার। দিনকতক ছোলা খেয়েই থাকলে। দিনকতক রোজ বেথুয়ার শাক চাই। দিনকতক খালি বিলিতী বেগুনের শরবত। কাঁচা পটল খেয়ে সেবারে কী অসুখ হল। একবার হুকুম হল বিলিতী বেগুন খাওয়ার সময় আস্ত দেবে; কামড়ে কামড়ে খাওয়াই নাকি গান্ধীজি বলেছেন ভালো। কাটতে গেলে মিছামিছি সময় নষ্ট। গান্ধীজির আশ্রমে নাকি এই নিয়ম জারি করা হয়েছে। চললো আমাদের আশ্রমেও সেই নিয়ম। ওমা, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, একদিন হুকুম হল যে ও নিয়ম আর চলবে না। সেবাগ্রাম আশ্রমে বিলিতী বেগুন খাওয়ার নিয়ম বদলে গিয়েছে। মহাদেব দেশাই কাগজে লিখেছেন যে গান্ধীজির মতে গোটা বিলিতী বেগুন কামড়ে খাওয়া ঠিক না। যেই কামড় দেওয়া যায়, আর অমনি কাপড়ে-চোপড়ে ছিটকে বিলাতী বেগুনের রস পড়ে।—আর কী কথা আছে! সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও তাই করতে হবে। এতদিন কি কামড় দেওয়ার সময় চোখ বুঁজে থাকতে নাকি? আদিখ্যেতা না? দিনের মধ্যে ভাত ছাড়া আর পাঁচটি জিনিস খাব, গোনা পাঁচটা। ছটা খেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সারা জীবন কি এত গুণে হিসাব করে চলা যায়? গাওয়া ঘি না হলে খাব না;—এদেশে কি গাওয়া ঘি পাওয়া যায়? পদে পদে জ্বালাতন। আর সেকি কেবল এই গান্ধীজির রাস্তায় এসেই নাকি? তার আগেই বা কী? চাবিটা থাকবে নিজের কাছে—ইস্কুলে যাওয়ার সময় একটা টাকা আমাকে দেওয়া হল বাজার খরচের। আমার কাছে চাবি রাখলে কি আমি সব টাকাকড়ি নিজের পেটে পুরতাম নাকি? না তোমার ভাণ্ডার উজাড় করে আমার বাপের বাড়ি পাঠাতাম? কী ভাবতেন, কে জানে। সে কথা কোনো দিন জিজ্ঞাসাও করি নি, তা

জানবার প্রবৃত্তিও ছিল না।...ছোটলোকদের সম্মুখে একদিন কী অপমানই না হতে হয়েছিল!—তেলী-বৌ সকালে স্কুলের কোয়ার্টারে তেল নিয়ে এসেছে। দোকানের তেল ভালো না। তাই তেলী-বৌকে উঠানে ডাকিয়ে তার কাছ থেকে এক টাকার তেল নিলাম, আর বলে দিলাম যে বাইরের ঘরে বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নে। ওমা খানিক পরে তেলী-বৌ এসে আমার উপর কী তম্বিগম্বি—দাও এখনি তেল ফেরত দিয়ে, মিছামিছি আমার এ সময় নষ্ট করলে। বাবু বলল যে তেল কে নিতে বলেছে?—অপমানে আমার মাথা কাটা গেল। সে সব কথা একটি একটি করে মনে গাঁথা আছে।...তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছো সত্যি—কিন্তু আমাকে তো একটুও স্বাধীনতা দাও নি। কতদিন ভেবেছি যে ছেলেরা বড় হলে একথা একদিন ছেলেদের বলবো। কিন্তু বলি বলি করে বলা হয় নি। ছেলেদের কাছে কি একথা বলা যায়? তোমার কথার উপর কোনো দিন একটি টু শব্দ করি নি। কেবল ছেলেদের মুখ চেয়েই রয়েছি এতদিন। আমার নিজের যা হয়েছে তা হয়েছে। তার জন্য একটুও ভাবি না। কিন্তু তোমার জন্যে, আমার ছেলের এই হল। আমার সংসার ছারখার হয়ে গেল। তোমার জন্যে, আমার নিজের পেটের ভাই, যার বাড়িতে থেকে কত বাইরের ছেলেরা পড়ে, সে তার ভাগ্নেদের খোঁজ নেয় না। বীরেনের মা যে বীরেনের মা, সে সুদ্ধ এসে একদিন কত কথা শুনিয়ে গেল; কত মুখ ঝামটা দিয়ে গেল। বাঙ্গালী বলে তার ছেলের ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের চাকরিটা নাকি কংগ্রেস খেয়েছে। আমাদেরই মুখের উপর বলে গেল—মাস্টার মশাই না ছাই; এম. এ. গাধা; মোড়লী করার জন্যে কংগ্রেসে আছে, বাঙ্গালীদের মুখে চুনকালি দিয়ে। এখন আমার এমন হয়েছে যে, যে দিকে তাকাই—অন্ধকার!...

গান্ধীজি, তুমি আমার একি করলে? তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরী করে ছেড়েছ; সত্যিকারের ভিখিরী। তুমি মাসের শেষে হাতে তুলে কিছু দেবে, তবে আমরা চারটি খেতে পাবো। নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে তোমার পূজো করেছি; তোমার জন্যে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব সব ছেড়েছি; হাসতে ভুলেছি। তার প্রতিদান তুমি খুব দিলে। তোমার

দেখানো রাস্তায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না, বাপ ছেলেতে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়। নিজের ইষ্টমন্ত্র ছেড়ে দিয়ে সন্ধ্যায় তোমার নাম জপ করেছি; কত বছর আগে আমাদের আশ্রমে যে জায়গাটায় তুমি বসেছিলে, সেখানটায় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালিয়েছি; একদিনের জন্য চরখা কাটা ছাড়িনি, সে কি এরই জন্যে? মেথরকে হরিজন বলেছি, তার ল্যাংটা ছেলেটাকে নীলু-বিলুর সঙ্গে রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়ে খাইয়েছি:— পাড়ার লোক হেসেছে। কিন্তু তার ফল কী হল? দুর্গার মা'রা তো ঠিকই বলেছিল যে স্বদেশীর কাজ করতে চাও কর, কিন্তু এসব করো না—ঠাকুর দেবতাদের ঘাঁটাতে যাওয়া ভালো না: তখন তোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের কথা কানে তুলি নি। আজ মর্মে মর্মে বুঝছি। আজ দুর্গার মা, থেঁদীর মা, কি জিতেনের মা-দিদি থাকলে, তাদের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেও একটু মনটা হালকা করতে পারতাম। মহাত্মাজী না ছাই! ঐ কি সন্ন্যাসীর মতো চেহারা নাকি? উঃ, কী করেছি এতদিন! পৃথিবীসুদ্ধ লোক মিলে আমার কী করেছে! গায়ের জ্বালায় নিজের মাংস ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে, মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করে। আর না—দেবো চরখাটাকে এখনি টান মেরে ফেলে— আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলবো ওটাকে। টেবিলের উপর রেখেছিলাম না?…

চরখাটা নেওয়ার জন্য জোর করে উঠে বসি। উঠতে কি পারি? মাথার বাঁ দিকটায় যেন একমণ লোহা ভরা। মাথাটাকে কে যেন বালিশের উপর ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। বহুরিয়াজী, কাম্‌লাদেবী হাঁ-হাঁ করে উঠেছে।

"উঠলে কেন বাঙ্গালী মাই? কী খুঁজছো? চারিদিকে অমন করে তকোচ্ছো কেন? শুয়ে পড়। মাথায় একটু জল দিয়ে দেবো?"

সকলে মিলে জোর করে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কোন জিনিসটা খুঁজছিলাম, সেটা আর ওদের কাছে বলা হচ্ছে না। ওরা তাহলে মনে করবে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এখনই কী মনে করছে কে জানে! মাথায় অডিকোলন দিচ্ছে। ঘরসুদ্ধ লোক এক এক করে এসে জুটলো দেখছি আমার বিছানার ধারে। গলকণ্ঠটা হাপরের মতো গলায়,

লুসী জমাদারনীকে ডেকে কী সব বলছে। বোধহয় আমারই কথা। সেটা আবার এখন চ্যাচামেচি করে হাসপাতালে খবর নিয়ে অনর্থ না করে। সখাবতীজী আস্তে আস্তে আমার পাশ থেকে ঘুমন্ত লাড্‌লীকে তুলে নিল। ও কি ভাবল ওর ছেলেটাকে আমি কিছু করে-টরে ফেলবো নাকি? নে বাপু নে, যা ভালো বুঝিস কর্। তুই হলি ওর মা। ওর ভালো তুই যত বুঝবি, তত কি আর আমি বুঝবো? সকলে চুপ করে আমার চারিদিকে ঘিরে বসেছে—এখন স্থচটি পড়লে তার শব্দ শোনা যায়। খালি হাতপাখাটা থেকে একটা একটানা শব্দ হচ্ছে।···একটা গুবরে পোকা উড়ছে। শব্দ হচ্ছে ভোঁ-ও······। ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। আবার উড়ছে, আবার কিসে যেন ঠোকর খেয়ে পড়লো। এখনও ওড়ে নি—এখনও না—এখনও না। এইবার যেই উড়বে, অমনি এক দুই তিন করে দশ গুণতে হবে। দশ গোনার আগেই যদি পড়ে যায়, তাহলে বিলু কিছুতেই বাঁচবে না। আর যদি পোকাটা পড়বার আগে দশ গুণে ফেলতে পারি, তাহলে ভগবান যেমন করে হোক বিলুকে বাঁচাবেনই বাঁচাবেন। খুব তাড়াতাড়ি গুণতে হবে; যত তাড়াতাড়ি পারি। ঐ উড়লো—এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত—ঐ যাঃ! পোকাটা পড়ে গেল। এ কী করলে ভগবান! যা'ও একটু আশা ছিল তাতেও তুমি বাদ সাধলে? যাঃ, এসব মনগড়া খেয়ালের কিছু মাথামুণ্ডু আছে? নিজেই ভাঙি, নিজেই গড়ি। পোকাটার সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছিলাম তা কখনই ঠিক নয়। সবই ভগবানের হাত। সেই ভগবানকে আমি এতদিন কী হেনস্তাই করেছি! মা পূর্ণেশ্বরী, আমার সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করো। তোমারই দয়াতে তো বিলুকে কোলে পেয়েছিলাম। তোমার নামেই তো বিলুর নাম রেখেছিলাম পূর্ণ। বাড়িসুদ্ধ সবাই তোমার মন্দিরের মহাপ্রসাদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলেই কি তুমি আমার উপর বিরূপ? বিলুর অসুখের সময় যে মানত করেছিলাম, সে পূজো পূর্ণেশ্বরীর ওখানে দিয়েছিলাম তো? মনে তো পড়ছে না। ভুলে গিয়েছিলাম নাকি? দেখেছো? ছাখ দেখি, একটা সামান্য ভুল থেকে কী কাণ্ড হল! মা পূর্ণেশ্বরী, কেন তুমি একথা আগে আমায় মনে পড়িয়ে দাও নি? না, নিশ্চয়ই দেওয়া হয়েছিল। তবে কেন এমন হল? মা, তুমি তো জাগ্রতা

দেবী, বিলু তো একরকম তোমারই ছেলে, ওকে এবার বাঁচিয়ে দাও। আর আমি তোমার কাছে কোনো দোষ করবো না। আর আমি গান্ধীজিকে তোমার চাইতে বড় মনে করবো না।···

বরহমথানে বিলু হওয়ার সময় যে ইটটা বেঁধেছিলাম, তা খোলা হয়েছিল তো? হ্যাঁ, সেই যে আমি আর জিতেনের মা-দিদি গিয়েছিলাম। সেই যেবার আমার পায়ের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে গিয়েছিল, ঘটি পড়ে! সেই সময়ই ভুল করেছি। কোন ইটটা খুলতে কোন ইটটা খুলেছি! ঠিক ঠিক—অত ইটের মধ্যে চিনবার কি জো আছে?

সেই সরস্বতীদের বাড়ির কাছেই, অশথতলায় মাটির উপর সিঁদুর মাখানো, তিনি হচ্ছেন 'ডিহ্ওয়ার'—দহিভাত গ্রামের গ্রাম্য দেবতা তিনি 'ডিহি' (গ্রামের সীমানা) পাহারা দেন—সেখানে সকলে মাটির ঘোড়া পূজো দেয়। সরস্বতীর মা আমাকে বলেছিল যে যখন মায়ের দয়া, কলেরা কি অনাবৃষ্টি হয়, তখন ঘোড়ায় চড়ে ষাট হাত লম্বা ডিহ্ওয়ার ঠাকুর, গ্রাম পাহারা দেন। গ্রামের চৌকীদার রাতদুপুরে কতদিন দেখেছে। সরস্বতীর মা'র মুখের উপর কিছু বলি নি, কিন্তু মনে মনে হেসেছিলাম। ষাট হাত লম্বা ঠাকুর বিশ্বাস করি নি। ষাট হাত লম্বা ঠাকুরের এক বিঘৎ উঁচু ঘোড়া। তা কি হয়? ডিহ্ওয়ার ঠাকুর নিশ্চয়ই আমার সেই সময়ের মনের কথা বুঝেছিলেন! তাই তিনি রাগ করে আমার এই কপাল করলেন। কিংবা হয়তো তাঁর গ্রামের মেয়ে সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে দিই নি বলে, তিনি আমার এই দশা করেছেন। ডিহ্ওয়ার ঠাকুর, আজ আমার বিলুকে বাঁচিয়ে দাও। তারপর যাতে তুমি খুশী হও তাই করবো।···তোমরা বিরক্ত হলে আমার মতো সামান্য মানুষের দিন কী করে কাটে বলো।···

ঐ! ঐ! মোটরের হর্নের শব্দ হল—অ্যাঁ!—তাহলে আমার বিলু···

সেই সবুজ ঝাঁঝওয়ালা শিশিটা ধরেছে বুঝি নাকে।······

জেল গেট

(নীলু)

নীলু

জেলগেটের সম্মুখের গাড়িবারান্দার নিচে, ওয়ার্ডার নেহাল সিংএর সহিত আসিয়া দাঁড়াইলাম। গেটের বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী। গেটের ভিতরটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। ভিতরে আলোর নীচে, সুবাদার সাহেব ডেস্কের পাশে একটি উঁচু টুলের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। নেহাল সিংএর কথা মতো গাড়িবারান্দার সম্মুখের অনুচ্চ প্রাচীরের উপর বসি।

"বাবু, কম্বল-উম্বল সাথ নহী লায়ে, না"[১] ?

বলিলাম, "না।"

সে নিজেই গেটের ভিতরের সুবাদারের নিকট হইতে, গরাদের ভিতর দিয়া তিন চারিখানি কম্বল যোগাড় করিয়া আনিল। সেগুলি ঐ প্রাচীরের উপর পুরু করিয়া পাতিয়া, দায়সারা ভাবে একবার তাহার ধুলা ঝাড়িবার চেষ্টা করিল।

আমাকে বলিল, "বাবু, বৈঠল যায়।"[২]

তাহার পর গেটের সান্ত্রী ও সুবাদার সাহেবকে অনুচ্চস্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল যে, ভোররাত্রে যাঁহার ফাঁসি হইবে, ইনি তাঁহারই ছোট ভাই। এইখানেই সারারাত্রি বসিয়া থাকিবেন বলিতেছেন। ইহাকে যেন জ্বালাতন না করা হয়। সুবাদার দেখিলাম কথাগুলি ভালভাবে লইল না। জেলের ভিতরের মালিক হেডওয়ার্ডার, আর গেটের বাহিরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সুবাদার সাহেব। আসলে তাহার পদের নাম গেটওয়ার্ডার। যুদ্ধ ফেরত বলিয়া তাঁহার নাম সুবাদার সাহেব হইয়াছে। জেলের ভিতর কে আসিতেছে, জেল হইতে কে গেল,—ইহাদের টাকাকড়ি, জিনিসপত্র, সার্চ,

---

১। "বাবু, কম্বল টম্বল সঙ্গে আনেন নি, না ? ২। "বাবু, বসুন"।

বাজারের সওদা, ঠিকেদার, এ সকল জিনিসের সর্বময় কর্তা সুবাদার সাহেব। এই মহামান্য সুবাদার সাহেবের নিকট একজন সামান্য ওয়ার্ডার কেন এই যুক্তিহীন প্রার্থনা করিতেছে? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কিছু তথ্য আছে।

কাজেই সুবাদার জিজ্ঞাসা করে, "তোমাকে কত দিয়াছে?" নেহাল সিং কিছুদিন যাবত আমার টাকা খাইতেছিল। প্রত্যহই আমার কাছে আসিয়া ফর্দ দেয়—"আজ এই এই জিনিস আপনার ভাইয়াজিকে খাবার জন্য দিয়েছি। বাজার থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। জেলের ভিতর লুকিয়ে আবার নিয়ে যাওয়া কি সোজা ব্যাপার?" সুবাদারটা যেন একটা বাঘ। প্রত্যেকটি জিনিস নিয়ে যেতে ওকে একটা করে টাকা দিতে হয়। সে বাহান্ন টাকা মাইনে পায়, কিন্তু তার চারগুণ সে উপরি রোজগার করে। একেবারে মিলিটারি মেজাজ—যুদ্ধে গিয়েছিল কিনা। এইরূপ নানা প্রকার অবান্তর কথা বলিবার পর, অল্প অল্প হাসে আর বলে, "হুজুররাই তো মা-বাপ। আপনাদের ভরসাতেই তো 'বালবাচ্চা' ছেড়ে এই দূরদেশে পেটের 'ধান্ধায়' এসেছি।" এমনি করিয়াই সে আমার নিকট হইতে টাকা লয়।

সুবেদার ও নেহাল সিং দুজনেরই ইচ্ছা ছিল, যাহাতে আমি বুঝি যে এখানে থাকিতে হইলে, সামান্য কিছু খরচ করা দরকার। তাহা না হইলে তাহারা এত জোরে জোরে কথা বলিবে কেন? তাহারা ইচ্ছা করিয়াই আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কথা বলিতেছে।

সুবাদারের কথায় নেহাল সিং উত্তর দেয়, "দেবে আবার কী? এখনও ধরম আছে;—'বেটা কিরিয়া'[১] বলছি কিছু দেয় নি। সাহেব এঁকে লাশ নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছেন।"

"লাশ নেবার হুকুম দিয়েছে তো দিয়েছে। এখানে থাকবার হুকুম তো দেয় নি। এখানে বাইরের লোককে থাকতে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিতে পারি না।"

সুবেদার গড়গড় করিয়া আরও অনেক কিছু বলিয়া যাইতেছিল। আমি নেহাল সিংকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দিলাম। সুবেদার সাহেব

১। 'ছেলের নামে শপথ করে'।

দেখিল। আর এ সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য হইল না; ভাগ-বাটোয়ারা পরে হইবে।

সুবেদার সান্ত্রীকে বলিয়া দিল—"এই বাবুকে কেউ যেন বিরক্ত না করে। দফা বদলির[১] সময় প্রত্যেক দফা যেন পরের দফাকে এই কথা বলে দেয়।"

নেহাল সিং যাইবার সময় নমস্কার করিয়া বলিয়া গেল, "পরণাম।" এদেশে নমস্কার কথাটির চলন নাই। তাহার পরিবর্তে পাত্রাপাত্র নির্বিচারে, ব্যবহৃত হয় 'প্রণাম' কথাটি; আমাদেরও এদেশে থাকিতে থাকিতে এই কথাটি এবং এইরূপ কত কথা বলাই অভ্যাস হইয়া যাইতেছে।...

...শিশিরের সেই চিঠিখানার ভাষা এখনও মনে আছে। শিশির জেল হইতে আমাদের পূর্বেই ছাড়া পায়। আমরা জেলের মধ্যে সব সময়ই বলাবলি করিতাম যে, যে জেল হইতে বাহির হয়, সে আর জেলের ভিতরের লোকের কোনো খবরাখবর নেয় না। বাস্তবিক প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাহাই দেখা যাইত। যাহাদের জীবন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর জেলের ভিতর ভাপসাইয়া পচিয়া উঠে; যাহাদের উদ্দাম জীবনীশক্তিকে নিয়মের বন্ধনে অসার করিয়া দেওয়া হয়, চীনা রমণীর পায়ের মতো যাহাদের জীবন স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ পায় না; তাহাদের বাহিরে খবরাখবর পাঠাইবার কত দরকার নিয়মিত জমা হয়; এরূপ ধরনের প্রয়োজন সরকারী নিয়মের মধ্য দিয়া মিটাইবার সুবিধা নাই। তাই অন্ধকার যক্ষপুরীতে ক্ষীণ আলোক আসিবার গবাক্ষ, নূতন রাজবন্দীর জেলে আসা। আর বাহিরের যে কর্মবহুল সংসারের শত মধুর সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বন্দীকে লইয়া আসা হইয়াছে, তাহার সহিত সাময়িক সম্বন্ধ স্থাপনের বিফল চেষ্টা করা হয়, যে বন্দী মুক্তিলাভ করিতেছে তাহাকে দিয়া। জেলযন্ত্রের 'সেফটী ভাল্‌ভ' সদ্যোমুক্ত রাজবন্দী। সে জেলের ভিতরের শত ব্যর্থতার, অপার নিষ্ফল আক্রোশের, অপরিমিত অশ্রুবেদনা ও দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সাময়িক নির্গম পথ।...জেল হইতে বাহির হইবার সময় কত লিখিবার কথা, কত ইন্‌টারভিউ করিবার কথা, কত কাজ করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা, এক প্রকার যাচিয়া গছিয়া লওয়া কত প্রকারের ফরমাশ;—যাওয়ার দিনের ফুলের

১। ওয়ার্ডারদের একদলের চলিয়া যাওয়া ও আর একদলের আসা।

মালা, বিদায়ের ঘটা, প্রণাম নমস্কার; আদাব আলিঙ্গন, অযাচিত আলাপের ছড়াছড়ি, দরজা পর্যন্ত প্রায় মিছিলের মতো ঘটা করিয়া পৌছাইয়া দেওয়া; —ইহার প্রত্যেকটি কাজ জেলের গতানুগতিকতার অঙ্গ হইলেও, কাহারও আন্তরিকতার অভাব নাই। কী তাহার পর? তাহার পর কী হইবে তাহাও চোখ বুঁজিয়া বলিয়া দেওয়া যায়! ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ বলিয়া দিতে পারেন, দেখেন কত লোক আন্দাজ, আগামী বৎসর ঠিকানা না লিখিয়াই ডাকবাক্সে চিঠি ফেলিবে। আর রাজবন্দীরাও বলিয়া দিতে পারে যে, মুক্ত বন্দী গেটের বাহিরে যাইবার পরই জেলের ভিতরের লোকদের কথা ভুলিয়া যাইবে।···আমাদের গণনা ভুল প্রমাণ করিবার জন্য শিশির জেলের বাহির হইতে দাদাকে চিঠি লিখিয়াছে। দাদা চিঠিখানির কয়েকটি লাইন, 'আণ্ডার লাইন' করিয়া দিল—এখনও মনে আছে। 'বেশীর ভাগ লোক যেমন হচ্চে আমাকে ঠিক তাদের দরজায় ফেলো না। জেল থেকে ছুটবার সাতদিনের মধ্যে চিঠি দিচ্চি। অমুক অমুক অমুককে আমার প্রণাম জানাবে।···"

···হরদার ডুবেজীর স্ত্রী, বুড়ি; সেও আমাকে প্রণাম করে। অথচ দাদাকে বলে 'ধরমবেটা'। গরিবমানুষ; কিন্তু সেদিন যখন দেখা হইল 'বেটার' মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য আঁচলের খুঁট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া দিল;—তাহার দুই চোখে জল আসিয়া গিয়াছে। মনে হইল ডুবেজীকে লুকাইয়া টাকা দিতেছে। কেন জানি না···

ডুবেজী নিজেই মোকদ্দমা চলিবার সময় ভয় ও কুণ্ঠার সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, টাকাকড়ির যদি দরকার হয় তাহা হইলে সে কিছু যোগাড় করিয়া দিতে পারে। ডুবেজী বলিয়াছিল, "ভগবান 'নারাজ' বলেই তো আমাকে আর আমার স্ত্রীকে পুলিশে ধরে নি। না হলে আমি তো 'জুলুসে শরীক'[১] হয়েছিলাম। আমার হাতে সব চাইতে বড় 'তিরঙ্গাটি'[২] ছিল। যখন জেলের বাইরে আমাকে রাখাই ভগবানের ইচ্ছে, তখন 'কংগ্রেসীকে নাতে'[৩] বিলুবাবুর মোকদ্দমার তদ্বির করে আমার নিজের 'ফর্জ অদা'[৪] করা উচিত।" তখন আমি টাকা লইতে অস্বীকার করি।

১। মিছিলে ভাগ নেওয়া। ২। ত্রিবর্ণরঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা। ৩। কংগ্রেসের সদস্য বলিয়া।
৪। কর্তব্য সম্পাদন করা।

ঢুবেজী আমার ব্যবহারের অর্থ করিল যে আমি দাদার মোকদ্দমা ডিফেণ্ড করাইতে চাই না। অথচ আমি অস্বীকার করিয়াছিলাম, কারণ জ্যাঠাইমা কোথা হইতে জানি না মোকদ্দমার খরচের জন্য আমাকে শ তিনেক টাকা দিয়াছিলেন। জ্যাঠাইমা কেবল বলিয়াছিলেন, "হরেনবাবু উকীলকে দিয়ে দিস।" টাকা দিবার সময় জ্যাঠাইমার মুখের ভাব, ঠিক ঢুবেজীর স্ত্রীর মতো। তাহার পর হইতে ঢুবেজী নিজেই উকীলের বাড়ি যাতায়াত করিত।...

...ঘোড়ার পিঠে ঢুবেজী। লাল ঘোড়াটি একটু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে। ঘোড়া হইতে নামিয়া ঢুবেজী ঘোড়ার পিঠে একটি চাপড় মারিল। পিঠের চটগুলি সরাইয়া ঘোড়াটিকে হরেনবাবুর গেটের ধারের ইউকালিপ্‌টাস গাছটায় বাঁধিতেছে।...ঢুবেজী বোধহয় অনেক টাকাও খরচ করিয়াছিল। আমি অবশ্য জ্যাঠাইমার দেওয়া টাকাও হরেনবাবুকে দিয়াছিলাম। তিনি বাবার বন্ধু; কিন্তু জ্যাঠাইমার টাকা পাওয়া সত্ত্বেও, আবার ঢুবেজীর দেওয়া টাকা লইতে ইতস্তত করেন নাই।...

তাহার পর ঢুবেজীর স্ত্রী নিজের কথা বলিয়াই ফেলিল। "আমার স্বামী তো 'বেটার' মোকদ্দমার যথেষ্ট 'পৈরবী'[১] করেছে। খোলামকুচির মতো পয়সা খরচ হয়েছে। কিন্তু ফল কী হল? আসলে পুলিশ যার দিকে, মোকদ্দমায় তারই জিৎ। তোমার কথা তো পুলিশ শোনে। কালেক্টর সাহেব শুনি তোমাদের সঙ্গে 'সলাহ'[২] না করে কিছু করেন না। তোমাদেরই দলের নোখেলাল ছ্যাখো না, হরদাবাজারের সব দোকানদারদের জ্বালাতন করে মারছে; কিন্তু দারোগাবাবু তার হাতের মুঠোয়। সরকার শুনি তোমাদের দলের লোককে মাইনে দেয়।" তখন ঢুবেজীকে লুকাইয়া টাকা দিবার অর্থ বুঝিলাম। বিলুবাবু তাহার 'ধরমবেটা'। তাহার জন্য, সে নিজের সরল বুদ্ধিতে যাহা করা দরকার মনে করিয়াছে, তাহা করিতে ইতস্তত করে নাই। আমাকে উহারা পুলিশের লোক মনে করে। উহাদের দোষই বা কী? উহারা অন্য কীই ভাবিতে পারে? দেশসুদ্ধ লোক তো তাহাই ভাবিতেছে। সরলমনা ঢুবেইন তো কেবল পূর্বপরিচয়ের দাবিতে,

১। তদ্বির। ২। পরামর্শ

আমার মুখের উপর কথাটি পরিষ্কার বলিয়া ফেলিল। ইচ্ছা হইল টাকা তিনটি ছুঁড়িয়া তাহার মুখে মারি; কিন্তু মুখে বলিলাম, "মোকদ্দমার রায় তো হইয়া গিয়াছে। আর টাকা কী হইবে?"—দেখিলাম সে বিশ্বাস করিতেছে না যে, এখন আর কলেক্টর বা লাটসাহেব কিছু করিতে পারেন না। তাহার পর তাহার হতাশাব্যঞ্জক মুখের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, যে টাকাটা আমার লওয়া উচিত। বলিলাম, "আচ্ছা দাও টাকাটা।" এক সন্তানহীনা রমণীর পরসন্তান বাৎসল্যের আবেগের কাছে আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত মাথা নত করিল। কিন্তু মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় নিজের রাজনীতিক principle একটু নমনায় করিয়া লইলে কী লোকসান হইত? তখন যেন আমি সাধারণ মানুষ ছিলাম না। তখন যে জনমতের বিরুদ্ধে, পরিচিত অপরিচিত সকলের বিরুদ্ধে, আমার একাকী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার কথা; নিন্দুক ও বিরোধীদের আমার principleএর দৃঢ়তা দেখানোর কথা। রাজনীতিক মতবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বোধহয় সেখানে আমার ব্যক্তিগত জিদের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল। আমার উপর চাপ দিয়া আমার মত বদলাইয়া লইবে, এত নমনীয় রাজনীতিক মত আমি রাখি না। লোকে কি আমার মনের গভীরে যে কথা ছিল সে কথা বুঝিয়াছে? ডুবেজীর স্ত্রী আমার সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছে, সাধারণ লোকে হয়তো তাহা অপেক্ষাও খারাপ ধারণা পোষণ করে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই করে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নিত্যই দেখিতেছি। সেদিন ফুটবল মাঠের ধারে বসিয়া যে ছাত্রের দল সিগারেট খাইতেছিল, আমি পাশ দিয়া সাইকেলে করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহাদের সুউচ্চ গলা খাঁকারির শব্দ শুনিয়াছি। পাড়ার ছেলেমেয়েদের বিস্মিত ও অনুসন্ধিৎসু চক্ষে আমার দিকে তাকাইতে দেখিয়াছি। বাল্যবন্ধু সৌরিন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মারিবার ভয় দেখানো বেনামী চিঠি পাইয়াছি। কী যুক্তিহীন চিঠি! প্রথমেই কিরূপ উচ্চমনা পিতার পুত্র তাহা মনে করাইয়া দিয়া, শেষের লাইনে আমার পিতৃত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। জ্যাঠাইমা ও ন'দি পর্যন্ত নেহাত কাজের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন না। একজন ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের মেম্বারকে, অপর একজন মেম্বারের নিকট বলিতে শুনিয়াছি

যে, দুই ভাইই সহদেওএর বোনের সহিত প্রেমে পড়িয়াছিল। সেইজন্য হিংসায় আমি নাকি দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছি; না হইলে কেহ ফাঁসির মোকদ্দমায় নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে? সরস্বতীর সম্বন্ধে এইরূপ ধরনে আমি কখনও ভাবি নাই। আর দাদার দিক হইতেও কখনো এমন কিছু দেখি নাই যাহাতে বুঝা যায় যে দাদা তাহাকে ভালবাসে; কিন্তু লোকের মুখ কে বন্ধ করিবে?

...জেলে দাদার মোকদ্দমা চলিবার সময়, আমার সাক্ষ্যের দিনে, জেলের বাহিরে কী ভিড়। জেলের ভিতর মোকদ্দমা চলিতেছে। ঐরূপ মারাত্মক আসামীকে কী করিয়া খোলা এজলাসে বিচার করা যাইতে পারে? কয়জন চৌকীদার, দফাদার, কনেস্টবল ও দারোগা সাক্ষীর সহিত গেটে পুলিশের ভ্যান হইতে নামিলাম। জনতার দিকে তাকাইতে পারিতেছি না কিন্তু অনুযোগ ও ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি অনুভব করিতেছি। আমি জনতার ক্ষোভকে তাচ্ছিল্য করি, এই ভাব দেখাইবার জন্য একবার জোর করিয়া ঐ দিকে মাথা উঁচু করিয়া তাকাইলাম। বোধ হয় মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মুখের দিকে মনোবিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। 'জু' তে বন্যজন্তুকে যে দৃষ্টিতে দেখে, সেদিন জেল ওয়ার্ডাররা সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়াছে; জজসাহেব প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। জেলের পুরাতন কয়েদীদের চক্ষেই একমাত্র দেখিয়াছি উদাসীনতার ভাব; আর কাহারও চক্ষে সেরূপ নাই। জেলের রাজবন্দীদের সহিত সে সময় সাক্ষাত হয় নাই। সাক্ষাত হইলে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ হিংস্র হইত তাহা অনুভব করিতে পারি। ঐ মোকদ্দমায় দাদার সহিত আর দুইজন আসামী ছিল,—সুরজেদও আর হরিশচন্দর। আমি এজাহার দিতে উঠিলে, হরিশচন্দর চীৎকার করিয়া আসামীর কাঠগড়া হইতে বলিয়া উঠিয়াছিল—"ছি! ছি! ছি! ছি!" তাহাতে আমি ফিরিয়া সেই দিকে তাকাইয়াছিলাম। তাহার চোখ দিয়া ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহার তীক্ষ্মস্বরের মধ্যে যতটা তীব্র ব্যঙ্গ ছিল, নিষ্ফল আক্রোশ ছিল তাহা অপেক্ষাও বেশী।...একবার আশ্রমে একটি ছেলে সাপ চিমটা দিয়া ধরিয়া দাদার কাছে লইয়া গিয়াছিলাম। দাদা

বাগানে কাজ করিতেছিল। সাপের সাদা পেটের দিকটা হঠাৎ দেখিয়া দাদার চোখে-মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেই ভাব দেখিলাম সুরজ-দেওএর মুখে। তীব্র ঘৃণায় সে আমার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে চায়। আর দাদা—কাঠগড়ার মধ্যে একখানি কম্বলের উপর বসিয়া; একখানি লালচে মলাটের বইএর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ, মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনাহীন। আমার মনে হইল যে উহা সত্যকারের অভিনিবেশ নয়; ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি সংযোগ মাত্র। কেননা তাহা হইলে দাদা হরিশচন্দরকে নিশ্চয়ই কোনও কথা বলিতে বারণ করিত। তাহার পর সরকারী উকিলের জজ সাহেবের নিকট হরিশচন্দরের সম্বন্ধে নালিশ—হাকিমের উষ্মা ও হরেনবাবুর দিকে তাকাইয়া বিরক্তি প্রকাশ—হরেনবাবুর উদ্বেগ ও একবার কাশিয়া উদ্বেগ দমন করিবার প্রয়াস—অ্যাসিস্টেণ্ট-জেলার-'অন-ডিউটি' ও দারোগার চাঞ্চল্য; কোর্টরুম না হইলে তাহারা এখনই আসামীকে মজা টের পাওয়াইয়া দিত—দুজনের মধ্যে এইরূপ অর্থসূচক দৃষ্টি বিনিময়—সব ছবিই চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। হরিশচন্দর মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—বলিতেছে "কেয়া করোগে ? ফাঁসিসে ভী কুছ বেশী দেওগে কেয়া ?" ওয়ার্ডার ও পুলিশে আসামীর কাঠগড়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। হরিশচন্দর তাহার মধ্য হইতেই আমাকে তীব্র স্বরে বলিল "কুত্তা কাঁহাকা।" জজসাহেব চশমা মুছিতেছেন। পেস্কার দৌড়াইয়া হরিশচন্দরকে কী বলিতে গেল। দাদার সহিত হরিশ-চন্দরের চোখাচোখি হইয়া গেল। দাদার মিনতিভরা দৃষ্টি—বলিতে চায়, হরিশচন্দর এবার থাম, একটা scene হইয়া গেল যে। হরিশচন্দর থামিয়া যায়। আবার এজলাসের কাজ আরম্ভ হয়।…

কাঁকরভরা রাস্তায় একসঙ্গে অনেকগুলি জুতার শব্দ আসিতেছে; অন্ধকারে রাস্তার দিকের কিছুই দেখা যায় না। কেবল দূরে দেখা যাইতেছে ওয়ার্ডারদের লম্বা ব্যারাকের বারান্দায় কালো শেড দেওয়া আলো। ব্যারাকে ওয়ার্ডারদের ঢোলক খঞ্জনী সম্বলিত কীর্তন চলিতেছে, তাহার উগ্রস্বর কানে আসিতেছে; ভাসিয়া আসিতেছে বলা চলে না, কর্ণপটাহে দস্তুরমতো আঘাত করিতেছে। কিন্তু সে শব্দকেও ছাড়াইয়া উঠিয়া ক্রমনিকটায়মান জুতার শব্দ জেলগেটের নিকট পৌছিল। দেখিলাম

একদল ওয়ার্ডার আসিয়াছে। অধিকাংশের পায়ে হলদে রং-এর কাবুলী স্যাণ্ডাল। দুইজনের পায়ে অতি পুরাতন বুট। যুদ্ধের জন্য বুট জুতা পাওয়া যায় না বোধহয়।

জেলগেটের দোতলায় একজন ওয়ার্ডার এগারোটা বাজিবার ঘণ্টা দিল। একসঙ্গে ঢং ঢং করিয়া দুইটি করিয়া পাঁচবার তাহার পর আর একবার। এরই মধ্যে দুই ঘণ্টা হইয়া গেল। দশটা কখন বাজিল জানিতেও পারি নাই। গেটের সম্মুখের ওয়ার্ডারের দল অনুসন্ধিৎসু চক্ষে আমাকে দেখিতেছে—এ-আবার-কে-আসিয়া জুটিল এই ভঙ্গীতে। একজন আমার কাছে দেশলাই আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, 'নাই'। ইতিমধ্যে ভিতরের ওয়ার্ডার গেটের তালা খুলিয়াছে। ওয়ার্ডাররা কোলাহল করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিল। খাতায় নাম লেখা হইল।

গেটওয়ার্ডার হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করে, "কিছু 'নাজায়জ'[১] ভিতরে নিয়ে যাচ্ছো না তো?"

একজন বলিল, "হুজুর সারিচ কিয়া যায়।"

সুবেদার উত্তর দেয়, "তারপর আমার বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হোক আর কি। তোমাদের তো আমার জানা আছে। তোমরা তো আর উর্দির পকেটে জিনিস রাখ না।"

রেজিস্টারে নাম লেখা হইল। জেলের ভিতরের লৌহদ্বার খুলিল। অবশ্য সম্পূর্ণ নয়; দ্বারের একদিককার কপাটের মধ্যস্থ ছোট দরজাটি খুলিল। জেলের ভিতরে জমাট অন্ধকার। এক এক করিয়া, একটি ব্যতীত অপর সকল নূতন ওয়ার্ডার প্যাসেজের উজ্জ্বল আলোক হইতে, জেলের ভিতরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। গেটের জমাদার কপাট বন্ধ করিয়া তালা লাগাইল—প্রকাণ্ড একটি রিং-এ শতাধিক বড় বড় চাবি। তালা বন্ধ করিবার পর একবার অন্যমনস্কভাবে তালাতে হ্যাঁচকা টান মারিয়া দেখিল; ঠিক বন্ধ হইয়াছে তো। টানমারাটা যেন reflex action এর মতো বোধ হইল। তাহার পর আমার দিকের ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গেটের বাইরে বন্দুকধারী সান্ত্রী বদল হইল। আগেরটি ছিল গম্ভীর প্রকৃতির, এটি

১। আইনবিরুদ্ধ জিনিস।

অনুরূপ। ভিতরের জমাদার বাহিরের সান্ত্রীর নিকট খয়নি চাহিল, ও গুজ্-গুজ্ করিয়া গল্প করিতে লাগিল। বোধহয় আমারই কথা। গেটের ভিতর নূতন দলের যে ওয়ার্ডারটি রহিয়া গিয়াছে সে সুবেদার সাহেবের সঙ্গে গল্প করিতেছে। সুবেদার উঁচু টুলের উপর বসিয়া, একখানি খাতা নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছে। বোধ হয় লেন-দেনের ব্যাপার কিছু হইবে, কিংবা কোনো জিনিস হয়তো জেলগুদাম হইতে চুরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে। কোনো জিনিস চুরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। জেলের অভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্র এমন যে যতক্ষণ শৃঙ্খলের সকল বলয়গুলি সংযুক্ত না হইতেছে, ততক্ষণ চুরির যোজনা সফল হইতে পারে না। খাও, কিন্তু মিলিয়া-মিশিয়া খাও। ছোটকেও তাচ্ছিল্য করিবার উপায় নাই।…

ঢং ঢং করিয়া কলেক্টরির টাওয়ার ক্লকে এগারোটা বাজিল। সকলস্থানের জেলের ঘড়িই দেখি মিনিট পনের ফাস্ট থাকে।—জেলের সম্মুখে রাস্তা। তাহার ধারে ধারে জেলকর্মচারীদের কোয়ার্টার। পর্দা দেওয়া জানালা-গুলির ভিতর দিয়া কোথাও অস্পষ্ট আলোক দেখা যাইতেছে। উহাদের মধ্যে একস্থানে অন্ধকারের ভিতর চতুষ্কোণ আলোকের ঝলক হঠাৎ দেখা যায়,—একটি কোয়ার্টারের দরজা খুলিয়াছে। আলোর রশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, সরল রেখায়; একটি আলোকময় ট্রাপিজিয়ম, চৌকাঠের দিকের বাহুটি ছোট। রেললাইনের সমান্তরাল রেখা দুইটি দিগন্তের দিকে যেরূপ নিকটে আসিবার চেষ্টা করে সেইরূপ। একটি মূর্তি দরজা দিয়া বাহিরে আসিল আর একটি 'সিলহুট' দরজা পর্যন্ত আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। দ্বিতীয় মূর্তিটি দরজা বন্ধ করিল।…তাহাদের গৃহস্থালির আলোক কেন জেল এলাকার নিবিড় অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিবে? দরজা যেন জোর করিয়া সেই আলোককে নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে রাখিবার যন্ত্র-মাত্র।…লুঙ্গিপরিহিত ডাক্তারবাবু গেটের কাছে পৌঁছিলেন। তাঁহার গায়ে গেঞ্জি। পান চিবাইতেছেন।…গালে পান রাখিলে সত্যই কি ক্যান্‌সার হয়? কাঁধের উপর শার্ট, খাকীর হাফপ্যাণ্ট্, আরও বোধহয় দুটি একটি জামা। চলিবার সময় পা দুইটি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সম্মুখের দিকে ফেলেন। সান্ত্রী খট করিয়া 'এটেনশন' হইয়া দাঁড়াইল!…ইহাদের কাবুলী স্লিপার

কয়দিনই বা টিকিবে···সান্ত্রী সেলাম করিল। ভিতরের ওয়ার্ডার আদাব করিয়া গেটের তালা খুলিল। ডাক্তারবাবু, সেলাম প্রত্যর্পণের ইঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া, ভিতরে ঢুকিলেন। গেটের তালা বন্ধ হইল। সুবেদার সাহেব টুলের উপর বসিয়াই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁধের উপরের ও পোশাকগুলো কিসের জন্যে?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ডিউটি তো হাসপাতালে। কিন্তু কী জানি; ভোর রাত্রে ডাক্তার সাহেব, হাকিম, সকলে আসবে, তখন যদি কোনো দরকার পড়ে যায়। তখন তো আর লুঙ্গি পরে সাহেবের সম্মুখে যেতে পারবো না। অবিশ্যি ফাঁসির সময়ের ডিউটি বড় ডাক্তারবাবুর, আমার নয়। কিন্তু কী জানি দরকারের কথা বলা তো যায় না—আর যা গরম পড়েছে।"

ডাক্তারবাবুর কথাবার্তায় একটু আবদারে দুলাল দুলাল ভাব। দেখিলাম ডাক্তারবাবু সুবেদারের সহিত বেশ সমীহ করিয়া কথা বলেন। তাহার কারণ সুবেদার নারাজ হইলে, জেলের খাঁটি গরুর দুধ না পাইয়া ছেলেপিলেরা রোগা হইয়া যাইবে, হাসপাতালের বরাদ্দ মাংসের সামান্য অংশও ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পৌছিবে না, কেরোসিন তেল হয়তো গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া বাজার হইতে কিনিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও কত রকমের জিনিস যেগুলিকে তাঁহারা বেতনের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন, হয়তো কাল হইতেই বন্ধ হইয়া যইবে। হাসপাতালের নেটের মশারি, বিছানার চাদর, শিমুল তুলা, চিনি, পুরাতন চাউল প্রভৃতি কত জিনিস ইঁহাদের দরকার। ভোরবেলায় যে গ্যাং বাহিরের কম্যাণ্ডে কাজ করে, তাহাদেরই মধ্যে একজন হয়তো, প্রত্যহ গেট হইতে বাহির হইবার সময় ফুলের সাজিতে করিয়া ডাক্তার গৃহিণীর জন্য পূজার ফুল লইয়া যায়। ফুলের সহিত থাকে একটি কাঁচা বেল ও কয়েকটি কাগজী লেবু—ছেলেপিলেরা প্রত্যহ বেল পোড়া খায় কি না।···আর ডাক্তারবাবু—তিনি তো বোধ হয় জেলে চাকরি করিতে করিতে চিকিৎসাশাস্ত্র ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ সেই গতানুগতিক কাজ—হিসাব, নাম, ফাইল, দপ্তর, ওজন নেওয়া, রিটার্ণ পাঠানো, সাহেবের সহিত ফাইলে ঘোরা, হাসপাতালে মেট হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের মন জুগাইয়া চলা—ইহার মধ্যে ডাক্তারি করিবার অবকাশ কোথায়? সেবার জেলে

ডাক্তারবাবু আমাকে দিয়া একটি রিটার্ণ লিখাইয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুর নাম ছিল বুঝি নরেনবাবু। রিটার্ণের অনেক বিষয়ের ভিতর একটি ছিল spleenic index। উহা কী করিয়া হিসাব করিতে হয় আমি জানিতাম না। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও দেখিলাম জানেন না,—বলিলেন, "এখন থাক, আমি গত বৎসরের রিটার্ণ দেখিয়া আন্দাজে বসাইয়া দিব।"...

জেলগেটের ভিতর ঢুকিয়াই, ডানদিকের দেওয়ালে দেখা যায় একটি ব্ল্যাকবোর্ড—স্টেশনে যেরূপ চতুষ্কোণ ফলকগুলির উপর টাইমটেবল আঁটা থাকে, সেগুলির মতো। তাহার উপর লেখা আছে,—এই জেলে কত কয়েদীর স্থান হইতে পারে, আজ কত কয়েদী আছে, তাহার মধ্যে আণ্ডারট্রায়াল কত। সর্বাপেক্ষা নীচে লেখা থাকে যে ডাক্তার এখন ডিউটিতে আছেন তাঁহার নাম।

ডাক্তারবাবু খড়ির টুকরাটি লইয়া বোর্ডের উপর নিজের নাম লিখিলেন। আর পাশেই লিখিলেন যে, রাত্রি নয়টা হইতে ডিউটি করিতেছেন। তাহার পর ডাক্তারবাবু অল্প হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অফিস ঘরে ফ্যান্ আছে আপনাদের এখানে ফ্যান্ নাই?"

সুবেদার সাহেব বলিলেন, "তক্‌দীর!"[১] বলিয়া নিজের কপালটি দেখাইয়া দিলেন। কপালের মধ্য দিয়া বেশ একটি উঁচু শিরা; এতদূর হইতেও দেখা যায়!...

জিতেনদার পৈতার সময় জ্যাঠাইমার বিছানায় শুইয়া এক গরিব তাঁতির গল্প শুনিয়াছিলাম। তাঁতির কপালে ছিল রাজটীকার সুলক্ষণ। তাহার পর কিছুদিন যাহাকে দেখি তাহারই কপালটি ভাল কলিয়া লক্ষ্য করি। আমি আর দাদা একদিন আঙুল দিয়া ঘষিরা ঘষিয়া চামড়া প্রায় তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। কাপালে ঠিক তিলক কাটার মতো দাগ হইয়া গিয়াছিল। মা'র বকুনি আর পাড়ার লোকের ঠাট্টায় কয়েকদিন আমরা বাড়ির বাহির হইতে পারি নাই।...

দরজা খুলিল। ডাক্তারবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরের খোলা দরজা দিয়া অনেকগুলি জুতার শব্দ শোনা যায়। জেলের ভিতর হইতে

১। ভাগ্য।

অনেকে বোধহয় মার্চ করিয়া গেটের দিকে আসিতেছে। আবার দরজা বন্ধ হইল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দরজার মধ্যের ছয় ইঞ্চি পরিমাণ গবাক্ষ খুলিয়া গেল, ও একজন ভিতর হইতে ভোজপুরী ভাষায় দরজা খুলিতে বলিল। আবার দরজার তালা খুলিল। ওয়ার্ডারদের তালা খুলিবার ও বন্ধ করিবার বিরাম নাই। ইহাতে উহারা ক্লান্তও হয় না। এইতো ডাক্তারবাবু ভিতরে যাইবার সময় দরজা খুলিয়াছিল। সেই সময়েই তো পদশব্দে বুঝিয়াছিল কাহারা আসিতেছে। সেই সময় কয়েক মুহূর্ত দরজা খুলিয়া রাখিলেই তো হইত। তাহা হইলেই আর দুইবার করিয়া পরিশ্রম করিতে হইত না। ইহারা যে যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করে তাহা কি জেলের নিয়মের জন্য, না নিজেদের অভ্যাস বলিয়া? দরজা খুলিবার নিয়মগুলিও অদ্ভুত।—জেল-গেটের মাঝে দুইটি ফটক। একটি আমি যেখানে বসিয়াছি তাহারই সম্মুখে, আর একটি এই গেট হইতে দশ পনের হাত ভিতরে। দুইটি ফটকের মধ্যের প্যাসেজটি একটি বড় হলঘরের মতো। জেলের ভিতরের কর্মকেন্দ্র 'গুমটি'; আর জেলের বাহিরের কর্মকেন্দ্র এই প্যাসেজটি। হয়তো চারখানি গরুর গাড়ি জেলের ভিতর ইট লইয়া যাইবে। ওয়ার্ডার সম্মুখের দরজাটি খুলিয়া প্রথমে দুইখানি গাড়ি ঐ হল ঘরে যাইতে দিবে। তাহার পর বন্ধ করিবে। ইহার পর ভিতরের দরজা খুলিবে, গাড়ি দুইখানিকে যাইতে দিবে, ভিতরের দরজা বন্ধ করিবে; আবার আসিবে সম্মুখের দরজা খুলিয়া বাকি দুইখানিকে যাইতে দিতে। একসঙ্গে দুইটি ফটক খুলিয়া চারিখানি গরুর গাড়িকে যাইতে দিলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত!…

ভিতরের ওয়ার্ডারের দল কোলাহল করিতেছে। একজন ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করিব নাকি, ফাঁসি সেলে কাহার ডিউটি ছিল। তাহার নিকট হইতে জানা যাইতে পারে দাদা এখন কী করিতেছে। না থাক, আবার কী মনে করিবে। হয়তো টিটকারি দিয়া কথা বলিবে! হয়তো সে আমার সাক্ষ্য দিবার কথা জানে।……

সকলেই ব্যারাকে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত; অনেক রাত হইয়াছে। একটি রেজিস্টারে নাম লেখা হইল। একজন ওয়ার্ডার উঁচু ডেস্কের নীচে দিয়া হাত চালাইয়া, সুবেদারকে কী যেন দিল,—ইচ্ছা অপর কেহ যেন দেখিতে না পায়!

এক এক করিয়া সকলে বাহিরে আসিতেছে। উহাদের মধ্যে ফর্সা গোছের অল্পবয়স্ক একজন ওয়ার্ডারকে সুবেদার নিকটে ডাকিয়া, তাহার পাগড়িটি খুলিতে বলিল। সুবেদার উহার কোমর, হ্যাফপ্যাণ্ট প্রভৃতি সার্চ করিতেছে। সার্চ করিয়া কিছু পাওয়া গেলনা। ওয়ার্ডার বাহির হইবার সময় রাগে গজ্ গজ্ করিতেছে—"আমারই উপর যত আক্রোশ। সুবেদারের বিশ্বাস আমি হেড ওয়ার্ডারের দলের লোক। নিজেদের মধ্যে 'মোচকা লড়াই' আর আমাদের লইয়া টানাটানি; থামো, জেলর সাহেবকে বলে এর বিহিত যদি আমি না করি···, তাতে আমার চাকরি যায় আর থাকে, তার পরোয়া আমি করি না।"

তাহার পর একটি অশ্লীল গালাগালি দিয়া বলিল—"নোকরী নিয়ে না কিছু বলেছে!···"

······কীর্তনের গানের একটানা চীৎকার শোনা যাইতেছে। একটি কথাও বুঝা যাইতেছে না। কেবল মধ্যে মধ্যে "রামা হো রামা।" সেই ছোটবেলায় একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটি লাইন ছিল। "দারোয়ান—রামা হৈ।" কবিতাটি মনে পড়িতেছে না—তাহার প্রথম লাইন ছিল 'ভোর হলো, খুকুমণি জাগো'—এই ধরনের কিছু।

···জিতেনদা—জ্যাঠাইমার বড় ছেলে—জ্যাঠাইমার বাক্স হইতে টাকা চুরি করিয়া অনেকগুলি গল্পের বই আনাইয়াছিল। কলিকাতা হইতে পার্সেল আসিলে পর বাড়িতে জানাজানি হইয়া যায়। জিতেনদা বাড়ি হইতে পলাইয়া আমাদের আশ্রমে দুই দিন ছিল। জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন, আর উহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিবেন না। সেই পার্সেল হইতে দুইখানি বই জ্যাঠাইমা আমাদের দুই ভাইকে দিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে একখানিতে ঐ কবিতা ছিল। জিতেনদা কতবার পয়সা চুরি করিয়া এই পার্সেল আনাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যাডমিণ্টন সেট, ক্যারমবোর্ড, ফুটবলের পাম্প, কত পার্সেল যে উনি আনাইতেন তাহার কি হিসাব আছে? এক এক খেলায় উৎসাহ কিছুদিন থাকিত। কোন খেলাই চলনসই ধরনেরও খেলিতে পারিতেন না।···সেই জিতেনদাই আজ কী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ঠিকাদারিতে কত অর্থ উপার্জন করেন।

আমাদের অর্থাৎ যে সকল গরিব কর্মী রাজনীতি ক্ষেত্রে আছে তাহাদের বেশ কৃপা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন। কে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে যে আমরা চেষ্টা করিলেও হয়তো তাঁহার অপেক্ষা অধিক অর্থোপার্জন করিতে পারিতাম।…Nothing succeeds like success....

ভিতরের দরজার ছোট গবাক্ষের কপাটটি সরিয়া গেল। কেহ যেন ওয়ার্ডারকে কিছু বলিল; অন্ধকারে লোকটির মুখ কিছুতেই দেখা গেল না। আলিবাবার গুহা…চিচিং ফাঁক!…আলিবাবার গুহা রাশি রাশি ধনরত্ন ব্যতীত আর কী দিতে পারিত? কিন্তু এই ফটক খুলিলে কত জীবন্মৃত লোক আবার সত্য সত্যই বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

…জেলের সবটাই প্রাচীর নয়। উহার ভিতরেও প্রচুর খালি জায়গা আছে, যেখানে খোলা হাওয়া বাতাস পাওয়া যাইতে পারে। অন্তত সাধারণ গৃহস্থবাড়ির আঙ্গিনা অপেক্ষা জেলের আঙ্গিনা অনেক বড়। কিন্তু তাহা হইলে কী হইবে? জেলের ভিতর ফুলের বাগান, নিমের এভিনিউ, ছায়াযুক্ত বেল অশ্বথ ও বটবৃক্ষ থাকিলে কী হইবে? সারা বাতাবরণ[১] বিষাদে ভরা, প্রাণহীন, কঠোর ও ক্লেদময়। আবহাওয়া কেমন যেন ভারী ভারী।…অলিভার লজ, লেডবেটার, কোনান ডয়েল ইঁহারা কি psychical phenomena সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন? গভীর চিন্তন ও মানসিক আলোড়নের সময় আমরা কি চিন্তামূর্তিগুলিকে ঐ স্থানে ছাড়িয়া দিই? আমাদের চিন্তাসমষ্টি কি পেঁয়াজের মতো যে, উহা হইতে এক একটি খোলা ও কোয়া আমরা ছাড়াইয়া ফেলিতে পারি,—কোনটি মোটা, কোনটি মিহি। সত্যই কি কোনও পুরানো বাড়ির ভিতরে যাইতে এইজন্যই আমাদের গা ছম্‌ছম্‌ করে?…

যিনি ভিতর হইতে আসিলেন, তিনি হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। ভদ্রলোকটি বেশ সৌখীন। হাতে একটি হারিকেন লণ্ঠন।—সাপের ভয় নাকি ?—আসলে তিনি জেলে প্রবেশ করিবার সময় লণ্ঠনটি খালি অবস্থায় লইয়া আসেন; বাড়ি ফিরিবার সময় এটিতে কেরোসিন তেল ভরিয়া লইয়া যান। ইহা সকলেই জানে, সকলেই বোঝে, কিন্তু কেহ কিছু বলে না।

১। Atmosphere

এরূপ ধরনের ছোট ছোট প্রাপ্যগুলিকে উহারা উপরি পাওনা বলিয়া মনে করে না,—ইহা যে তাহাদের চাকরির বেতনের অঙ্গীভূত। হয়তো বেতন পঁচিশ টাকা। কিন্তু কাপড়-চোপড় জুতা-জামায় কী করিয়া এত পয়সা খরচ করে!—ডাক্তারের সঙ্গে নিশ্চয়ই পাওনার ভাগাভাগি আছে।…

"কী, কম্পাউণ্ডার সাহেবের আজ বড় দেরি হয়ে গেল দেখছি"—সুবেদার সহানুভূতির স্বরে বলে।

"হ্যাঁ, সুবেদার সাহেব, এই জেলে চাকরি নিয়ে কী গুখোরী কাজই না করেছি। এক মিনিট ছুটি নেই। সেই ভোরে এসেছি, এখন রাত বারোটা হল। দুপুরে কেবল বাড়ি গিয়ে খেয়ে এসেছি। সিনৃহেসরবাবুর নটার সময় হাসপাতালে ডিউটিতে আসবার কথা; এলেন এখন। রাত বারোটায়, খেয়ে দেয়ে, পান চিবোতে চিবোতে।"

তাহার পর একটি অশ্লীল গালি দিল। নিজের ভাগ্যকে, সিনৃহেসর বাবুকে, না জামার মধ্যে যে পোকাটি ঢুকিয়াছে তাহাকে, কাহাকে গালি দিল ঠিক বোঝা গেল না। এইটুকু কেবল বুঝিলাম যে, খানিক আগে যে ডাক্তার বাবুটি জেলের ভিতর গেলেন, তাঁহার নাম সিংহেশ্বর বাবু।… জামার ভিতর হইতে পোকাটি বাহির করিতেছে। এখনকার মুখভঙ্গী দেখিলে হাসি পায়।

কম্পাউণ্ডার সাহেব নিজের সুখ দুঃখের কথা বলিয়া চলিয়াছে। "মিত্তির সাহেষের নাইট ডিউটি থাকিলে, তবুও একরকম ভালো। তিনি যেদিন আসেন নটার সময়ই আসেন, না হলে একেবারেই আসেন না।"

দুই জনেই চোখে চোখে কী যেন ইঙ্গিত করিয়া হাসিয়া উঠে। আবার গল্প চলে।

"ওসব জেলর সাহেবও জানে। কতদিন জেলর সাহেব রাত্রে রাউণ্ড দেবার সময়. হাসপাতালে গিয়ে দেখেছে যে ডাক্তারের ঘর খালি। আর নিজে চোখে না দেখলেও, জেলে কোনো খবর পেতে তো বাকি থাকে না! আগেকার সাহেব থাকতে, একদিনে ধরা পড়ে জবাব দিয়েছিল, 'কী করা যায়; হাসপাতাল ও ওয়ার্ডে যে ঘরে ডিউটির ডাক্তার শোয়, তার দরজা নেই। রাত্রে কেউ যদি এসে মারপিট করে সেই ভয়ে ওখানে শুই না।'

সে সাহেবও ছিল ঘুঘু। সে বলেছিল যে রাতে তো কয়েদীরা বন্ধ থাকে। মারপিট কে করবে? ডাক্তার জবাব দিয়েছিল যে, যেসব মেট্‌দের রাত্রে ওয়ার্ডারের ডিউটি দেওয়া হয়, তারা তো আর বন্ধ হয় না। এই ব্যাপারের ঠিক আগেই জেলে মিউটিনি হয়ে গিয়েছে। কাজেই সাহেব আর বেশী কিছু বলতে পারেন নি।—কিন্তু এখন? মুজঃফরপুর জেলের জনকয়েক পলিটিকাল প্রিজনার পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে তো মেট্‌দের রাতের ডিউটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুনি যে মেট্‌রাই নাকি তাদের পালাতে সাহায্য করে।...এখন তো আর আগের অজুহাত চলবে না। এখন আবার বোধ হয় নতুন কোনো ছুতো দেখাবে। আচ্ছা 'ইয়ার', এখন একটা সিগারেট খাওয়াও তো দেখি। একেবারে 'থকে' গিয়েছি। হাড়গোড় যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

স্থবেদার সাহেব সিগারেট বাহির করিল; কম্পাউণ্ডার সাহেব ধরাইলেন। তাহার পর অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ স্বরে কী সব কথাবার্তা হইল। কম্পাউণ্ডার সাহেব লণ্ঠনের পলিতাটি একটু উস্কাইয়া লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরেন। আধখাওয়া সিগারেটটিতে একটি জোর টান মারিয়া, স্থবেদারের হাতে দেন। গেট হইতে বাহির হইবার সময় বলেন, "সেজন্যে ভেবো না। আমিই দিয়ে দেব।"—কিসের কথা হইতেছিল এতক্ষণ? কী দিয়া দিবেন? ইনজেকশন না তো? স্থবেদার সাহেব ও কম্পাউণ্ডারবাবু দুইজনের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা আছে দেখিতেছি। গেটের বাহিরে আসিয়া কম্পাউণ্ডারবাবু স্থবেদারকে জিজ্ঞাসা করেন—

"তুমি তো আজ এখানেই শোবে?"

"হ্যাঁ, অফিস ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি। এইবার শুতে যাব।" কম্পাউণ্ডার সাহেবের মাথার পিছনের চুলগুলি কী বড় বড়! অধিকাংশই সাদা হইয়া গিয়াছে। তিনি কত কয়েদীর ফাঁসি দেখিয়াছেন। ভোর রাত্রের ফাঁসির সম্বন্ধে কোনো কথা তাঁহার মনেও আসে না। যত কম্পাউণ্ডার সকলেই কি পিছনের চুল বড় রাখে?...

...সেই হরিশ কম্পাউণ্ডার। মাথায় আধবাবড়ি চুল। সে মাধববাবুর বাড়ির জন্য ওষুধ তৈয়ারী করিতেছে। সন্দেহবাতিক ছিটগ্রস্ত মাধববাবু ঠিক

পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন।—মাপ ঠিক হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত ও অধৈর্য হইয়া হরিশের মাথার চুলগুলি খপ করিয়া মুঠার মধ্যে ধরিয়া, মাথাটি নাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, "চুল ছোট করে কাটতে পার না। পিছন থেকে তোমার ওষুধ তৈয়ারীর কিছুই দেখা যায় না।"…আমি গিয়া দাদা আর মা'র কাছে এই গল্প করিয়াছিলাম। সকলে মিলিয়া কী হাসি! মা হাসি চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিতেছেন. "মা গো মা, সবই কী তোর চোখেই পড়ে?"… মা হাসিলেই তাঁহার চোখে জল আসিয়া যায়। আর দাদা যখনই হাসে, কোনো শব্দ হয় না; বাঁ গালে একটু টোল খাইয়া যায়। আশ্চর্য! দুই গালে নয়, একই গালে গর্তটি দেখা যায়। হাসিবার সময় চোখ দুইটি অর্ধনিমীলিত হইয়া পড়ে।…দাদার হাসিমুখ চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।…

আলোক শিখাটি ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেছে! এদিক-ওদিক দুলিতেছে। কম্পাউণ্ডারবাবুর লণ্ঠন। কম্পাউণ্ডারবাবু কি এত হেলিয়া দুলিয়া চলেন! গরিলারা এমন করিয়াই চলে। নিকটে থাকিবার সময় এতটা লক্ষ্য করি নাই। অত দূরে যাইতেছেন কেন? বোধহয় সরকারী কোয়ার্টার পান নাই। দূর হইতে হারিকেন লণ্ঠনের শিখায় ও প্রদীপের শিখায় কোনো তফাত বোঝা যায় না।…

…রানীপাত্রায় একটি 'কিসান'কেস তদারক করিয়া ফিরিবার সময় আমি, দাদা আর সহদেব খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অন্ধকার রাত্রে মিটিমিটি আলো দেখিয়া, রাত্রি কাটাইবার জন্য সেখানেই যাওয়া স্থির করিলাম। জোনাকির ন্যায় মৃদু আলোক—ক্রমে কাছে গিয়া দেখিলাম একটি ডিজ্ লণ্ঠনের শিখা। লণ্ঠনটি পুরানো মরিচা ধরা।…

…'মহাৎমা'দের জন্য খাটিয়া, কম্বল, বালিশ আসিল। "বলন্টিয়র"[১] সহদেওএর জন্য একখানি মাদুর দাওয়ায় বিছানো হইল। খাটিয়া দেওয়া হইল বাড়ির বাহিরের একটি দোচালা ঘরে। দেওয়াল বা বেড়া নাই। এদেশে উহাকে 'হাওয়াটুঙ্গি' বলে। কম্বলের উপর ময়লা চাদর ও তৈলাক্ত বালিশ দেখিয়া আমার গা ঘিনঘিন করিতেছিল—হয়তো কত রোগের বীজাণু

১। ভলান্টিয়ার।

উহাতে আছে। আমি খাটিয়া হইতে সেগুলি সরাইয়া খালি কম্বলে বসিলাম,—কম্বলের উপরের ময়লা চোখে দেখা যায় না বলিয়া একটু মনের তৃপ্তি। যে লোকটি চিঁড়ে দই পরিবেশন করিল তাহার চোখ উঠিয়াছে। দাদা চিঁড়ে দই খাইয়া দিব্যি নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ বালিশে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইল।...ভাগ্যবাদিতার আমেজ, দাদার মধ্যে চিরকাল লক্ষ্য করিয়াছি। পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজের খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা তাহার অদ্ভুত। এ বিষয়ে কথা তুলিলেই বলিবে যে যদি কোন মূল সিদ্ধান্তে আঘাত না লাগে, তাহা হইলে নিজের সৌজন্যকে বলি দিবার প্রয়োজন কী? উহার আত্মকেন্দ্রিক মন চিন্তার মধ্যে নিজেকেই ডুবাইয়া রাখিতে চায়। সব প্রশ্ন সে নিজের ধরনে ভাবে, মনে মনে সব জিনিসের চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে, যে কোনো সূক্ষ্ম বিষয় আমার অপেক্ষা ভালো বোঝে; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনে, তাহার আচরণ যুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখে না। যে কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, হয়তো মৃদু হাসির সহিত ছোট্টটো একটি উত্তর দিয়া, উহা সহ্য করিয়া গেল। একেবারে নীলকণ্ঠ। সাহসের অভাব তাহার নাই, ভয় পাইয়া কোনো উচিত কাজ ছাড়িয়া দিতে আজ পর্যন্ত তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু তাহার রক্ত যেন গরমই হয় না। বুদ্ধিশক্তির তীক্ষ্ণতা ও অনুভূতির তীব্রতা থাকা সত্ত্বেও, আবেগের উগ্রতা ও প্রাণশক্তির প্রচণ্ডতা উহার মধ্যে নাই। প্রতি পদক্ষেপ তাহার মাপা। যেন পিছল পথের উপর দিয়া অতি সাবধানতার সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া চলে।...

......থ্রিলেগেড্ রেসের সময় দাদা কী আড়ষ্টভাবে পা ফেলে!...সেই একবার কুমারসাহেবের মেলায় ছেলেদের স্পোর্টসএ আমি আর দাদা থ্রিলেগেড রেস দিয়াছিলাম। আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছিলাম, সফল হইতে পারি নাই। ঐ 'আইটেম্' শেষ হইয়া গেলে রাগে দুঃখে দাদাকে বলিয়াছিলাম, "তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ানো, আর গলায় একটা বিরাট ঢাক বেঁধে দৌড়ানো একই কথা।" দাদা বলিয়াছিল, "আমি তো আগেই বলিয়াছিলাম। তুই তো স্পোর্টসে সব তাতেই ফার্স্ট হস। আমাকে নিয়ে মিছামিছি টানাটানি করলি। পান্নার সঙ্গে জুড়ি বাঁধলেই পারতিস।"' এত লজ্জিত, এত অপ্রতিভ হইতে দাদাকে কোনো দিন দেখি

নাই। ১৯৪৩ আর ১৯২২—একুশ বৎসর আগেকার ঘটনা।···দাদার স্বেদ-সিক্ত, শ্রমক্লান্ত মুখখানি···ইতস্তত বিস্রস্ত চুলগুলি ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। হাঁফাইতে হাঁফাইতে কোঁচার খুঁট দিয়া পায়ের ধুলা ঝাড়িতে লাগিল। আমার মন খারাপ হইয়া গেল। অন্যান্য প্রতিযোগিতায় পাওয়া প্রাইজগুলি মাকে দেখাইয়া আনন্দ পাইলাম না। দাদা নিজেই সেগুলি মাকে দেখাইল। পরের দিন আবার সেগুলি বন্ধুবান্ধবদের দেখাইল। মাকে বলিল, "শোনো নীলুর কাছে, রোজারিও সাহেবের কাণ্ড—আমি তো ভালো বলতে পারব না।" বুঝিলাম দাদা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার তীক্ষ্ণ অথচ দরদী দৃষ্টি মনের অন্তস্তল পর্যন্ত বুঝিয়া লয়। দাদা আমার মন হালকা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার দিক হইতে নিজের রূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত ছিল।···রোজারিও সাহেবের কাণ্ডের কথা বলিতে হইল। রোজারিও সাহেব কুমারসাহেবের ম্যানেজার। খেলার স্পোর্টস্ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হয়। একশত গজ দৌড়ে খোকনদার সহিত কেহ পারে না। তাহার ভালো নাম ক্রীঙ্কারীরঞ্জন দত্ত। সে হইয়াছিল ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড। ছেলেদের স্পোর্টসএ জামায় নম্বর দেওয়া হয় না; গন্তব্যস্থানে পৌছিবার পর রোজারিও সাহেব সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া একটি কাগজে নাম লেখে। খোকনদাকে নাম জিজ্ঞাসা করিল।—চারিদিকে ভীড় কোলাহল—প্রত্যেক প্রতিযোগিতা শেষ হইলেই এইরূপ হয়। খোকনদা নাম বলিল। সাহেব দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও, বোধহয় তাহার নামটি বুঝিতে পারিল না। তাহার পর আমার নাম লিখিল, আমার পরে দুই জনের নাম লিখিল। প্রাইজ দিবার সময় দেখি আমাকে ফার্স্ট প্রাইজ দিল। খোকনদার চোখ ছলছল করিতেছে, তাহার নাম নাই। জিতেনদা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলে, "ক্রীঙ্কারীরঞ্জন দত্ত কি সাহেব লিখিতে পারে? বাপ-মায়ের দেওয়া নামের জন্যে তোর প্রাইজটা নষ্ট হল। এখন কাল সকালে কুমারসাহেবের কাছে যা।" ভাবিয়াছিলাম মা গল্প শুনিয়া হাসিবেন—কিন্তু ফল হইল উল্টা। আমার প্রাইজের টিপট্‌টি পরের দিন খোকনদাকে দিয়া আসিতে হইল। আমার প্রাইজটি কিন্তু মাঠে মারা গেল। রোজারিও সাহেবকে দেখিলে এখনও আমার এই দুঃখের কথা মনে পড়ে।······

দাদা কিন্তু আর কোনো দিন, আমার পার্টনার হইয়া খেলিতে রাজী হয় নাই; কোনও না কোনো ছুতায় avoid করিবার চেষ্টা করিয়াছে। দাদার খেলাধূলার বিশেষ শখ কোনও দিনই ছিল না। এক ব্যাডমিণ্টন ছাড়া কোনও খেলাই ভালো খেলিতে পারিত না; কিন্তু ইহাতেও সে কোনো ম্যাচ, আমার পার্টনার হইয়া খেলে নাই। প্রীতি, সৌজন্য ও নমনীয়তার মধ্যেও তাহার দৃঢ়তা অসীম। এক জায়গায় গিয়া তাহার আর নাগাল পাওয়া যায় না,—এত নিকট, তথাপি যেন একটু বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র। তাহার সেই অভিমান আমি একুশ বৎসরের মধ্যে শত চেষ্টাতেও ভাঙ্গাইতে পারি নাই।······

ব্যারাকের কীর্তন এখনও চলিতেছে। কোলাহলে মনে হইতেছে যে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এখন আর 'সীয়ারামা'র নাম কীর্তন হইতেছে না। এখন একটি মাত্র একটানা স্বর শোনা যাইতেছে "নারায়ণা নারায়ণা না—রা—অ—য়ণ আ······"। এইরূপ নামকীর্তনের পরই সাধারণত ইহাদের কীর্তন শেষ হয়!······সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার কোয়ার্টারের নিকট এই বিকট চীৎকার কি করিয়া সহ্য করে? বোধহয় ওয়ার্ডারদের চটাইতে চায় না। তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত জেলের শাসন যে একদণ্ডও চলিতে পারে না।

কত দিনের কথা হইল! রোগা খিটখিটে জজ, স্পিলার সাহেব ছিলেন আধপাগলা গোছের লোক। প্রত্যহ ব্যায়ামের জন্যে কুড়ুল দিয়া কাঠ চিরিতেন···জার্মান সম্রাট কাইজারেরও এই বাতিক ছিল।···ফজলেমিয়া নাজির জজসাহেবের কাঠের গুঁড়ি যোগাইতে যোগাইতে অস্থির। বজরং-প্রসাদ উকিলের মেয়ের বিয়ের সময় কী কাণ্ডই স্পিলার সাহেব করিয়াছিলেন! রাতে বিয়ের বাজনা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে উহাতে তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই একখানি লাঠি ও একটি 'বুল্‌স্‌আই' লণ্ঠন লইয়া বজ্‌রং বাবুর বাড়িতে গিয়া হাজির। সেখানে আর কথা না বলিয়া লাঠিখানি দিয়া ঢোলের চামড়ায় ছিদ্র করিয়া দেন। পরের দিন বজরং বাবু জজসাহেবের নামে মোকদ্দমা দায়ের করেন। কিছুদিন পরে মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। মাথা একটু ঠাণ্ডা হইলে উকিলসাহেব বুঝিতে পারেন যে, ওকালতি করিয়াই

যখন খাইতে হইবে তখন আর জজসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া লাভ কী? আত্মীয় কুটুম্বদের সম্মুখে অপমান যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে। কথা যত বাড়াইবে তত বাড়ে।...

আমাদের দেশের লোকের কী দোষ দিব। সব দেশের লোকই সমান। সাহেবরাও আমাদের মতো time server। এই কংগ্রেস-মিনিস্ট্রীর সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভার্নন সাহেব যাচিয়া আসিয়া আমাদের আশ্রমে ভাত ডাল খাইয়া গিয়াছেন। মিসেস ভার্নন, হাত দিয়া ভাত খাইবার সময়, ভাতের দলাটিকে ঠিক মুখে পৌঁছাইতে পারিতেছিলেন না। হাতের উপর ভাত রাখিতেছিলেন, ঠিক যেমন করিয়া চামচে ভাত লয় সেইরূপ করিয়া; আর ঠিক চামচের মতো করিয়াই হাতটি মুখে ঢুকাইতেছিলেন। সমস্ত মুখে ভাত ডাল লাগিয়া গিয়াছিল।...ছুতায়নাতায় ভার্নন সাহেব যখন-তখন দেখা করিতে আসিতেন। খদ্দর ও গান্ধীটুপির সে কী খাতির! সাহেবের মেয়ে একটি বেজী পুষিয়াছিল। "বাড়িতে বেজীটি বড় জ্বালাতন করিতেছে; তোমরা যদি আশ্রমে রাখ তাহা হইলে দিই" এই বলিয়া দাদাকে বেজীটি দিয়াছিলেন। পরে এই বেজীটিকে দেখিবার ছুতা ধরিয়া স্ত্রী কন্যা লইয়া কলেক্টর সাহেব, সময় নাই অসময় নাই, যখন-তখন আসিয়া হাজির! তাঁহার মেয়ে নাকি রিকিকে দেখিতে চায়। তারপর রিকিকে লইয়া ছেলেমানুষের মতো কত আদর, কত চেঁচামেচি...

চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া, অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া, বাতাবরণ[১] কম্পিত করিয়া, বারোটার ঘণ্টা পড়িল। ডাক্তারের কোয়ার্টারের একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল—তাহার সুখতন্দ্রা বোধহয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। "হো-ও হৈ!" এই বিকট চিৎকারের সহিত, খঞ্জনী ঝাঁঝ, ঢোলক সম্বলিত, ওয়ার্ডারদের কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা কি ঘড়ি ধরিয়া বারোটা পর্যন্ত কীর্তন করে নাকি? কী করিয়া পূর্ব হইতে সময়ের ঠিক পায়?...খাকীর আধ-হাতার নীচের একজোড়া হাত এক আধহাত ব্যাসের ঝাঁঝ বাজাইয়া চলিয়াছে। বাঁ হাতের মনিবন্ধে একটি সস্তা রিস্টওয়াচ ও তাহার উপরের অংশে নীল লাল উল্কিতে অঙ্কিত একটি নারীর মূর্তি।...

১। Atmosphere

বাবার কীর্তন ঠিক আটটায় শেষ হইত। "রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিতপাবন সীতারাম"—মহাত্মাজীর প্রিয় ভজনটি সব চাইতে শেষে গাওয়া হইত। আশ্রমে যে কোন কংগ্রেসকর্মী থাকে, সকলেই কীর্তনে যোগদান করে। সকলে মনে করে বাবা ইহাতে খুশি হইবেন। সত্যই বাবার কীর্তনের বাতিকের কথা জেল সুদ্ধ লোক জানে।···মিটিংঘরেই কীর্তন বসে। সিমেণ্টের মেঝে, মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, দেওয়াল মা'র নিজ হাতে ঝকঝকে নিকানো—মধ্যে মধ্যে ছোটো জানালা, উহাতে কপাট নাই। দেওয়াল ভরিয়া মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের ছবি। একদিকে দুইটি কংগ্রেসপতাকা ক্রশের আকারে দেওয়ালে অাঁটা। তাহার উপরের দিকে লাল শালুর উপর সাদা তুলা দিয়া নাগরীতে লেখা "স্বাগতম্"। নীচে গান্ধীজীর একখানি বড় ছবি। ঘরের পূর্ব ও উত্তর কোণ একটু অপরিষ্কার। কস্‌টিক সোডা, লোহার কড়া, আর কাপড়কাচা সাবান তৈয়ারীর অন্যান্য সরঞ্জাম ভরা কাঠের চাকাওয়ালা একটি প্রকাণ্ড সিন্দুক থাকে ঐ দিকে। সিন্দুকটি ফুলকাহার নন্দলাল তেওয়ারী কংগ্রেস কমিটিকে দিয়াছিল। কোণে দাঁড় করাইয়া রাখা থাকে একটি ধুনকি ; আর আড়কাঠ হইতে ঝুলানো থাকে একটি ধনুক। দিনের বেলায় পাঁজ তৈয়ারী করিবার তুলা বুনিবার সময়, ইহার সহিত ধুনকিটি বাঁধিয়া লওয়া হয়।···আশ্রমের কীর্তন আরম্ভ হইল। "দেশের ছেলে গান্ধীজীকে চিনলি নারে জানলি না"······বাবার নিজের লেখা গান। মা ধূপদানি লইয়া মিটিংঘরে ঢুকিলেন। গান্ধীজীর ছবির সম্মুখে একটি ফুলের মালা দিয়া, উহার সম্মুখে ধূপদানিটি রাখিলেন ও তাহার পর এক কোণে আলাদা হাত জোড় করিয়া বসিলেন। বাবা লণ্ঠনটি কম করিয়া দিয়া, সুর ধরিলেন। সহদেও প্রভৃতি সকলেই বিকৃত উচ্চারণে ঐ বাংলা কীর্তন করিতেছে। প্রথম গান শেষ হইল। মা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিলেন। এতগুলি লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে—কীর্তনে বসিয়া থাকিলে রাঁধিবে কে? আমি আর দাদা দুজনেই ছোটবেলায় কীর্তনে বসিতাম। পৈতা হইবার পরও কয় বৎসর বসিয়াছিলাম।···দাদা কীর্তন বন্ধ করিবার দিনকয়েক পর হইতেই আমিও কীর্তনে যাওয়া বন্ধ করি। তাহা লইয়া মা'র কী কান্না! "তোরা

না এলে উনি দুঃখিত হন। তোর মন না চায়, তবু ওঁর কথা ভেবে বসনা কেন?" দাদা কোনও উত্তরই দেয় না।...দাদা বাড়িতে কীর্তন করিত না; কিন্তু কংগ্রেসের কার্যসূত্রে যখন গ্রামে যাইতাম, তখন বড় বড় গ্রামে গ্রামবাসারা আমাদের মনোবিনোদনের জন্য কীর্তনের বন্দোবস্ত করিত। বাবার জন্য তাহারা এইরূপ করিতে অভ্যস্ত, সেইজন্য মাস্টার সাহেবের ছেলেদের জন্যও তাহারা এই 'খাতিরদারি' করে। এ কীর্তনে কিন্তু দাদা কখনও বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। আমি অস্বস্তি প্রকাশ করিলে ইঙ্গিতে আমাকে ধৈর্য ধরিতে বলিয়াছে।......

বাইসী থানার খাগ্‌ড়া হাটে মিটিং হইবে। একজনও লোক আসে নাই। সহদেও কংগ্রেস পতাকাটি মাটিতে পুঁতিয়া "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ" "গান্ধীজিকা জয়" কতবার বলিয়াছে! ঢেঁড়া পিটানো, ঘণ্টা বাজানো প্রভৃতি গ্রামের হাটে লোক জড় করিবার যত কৌশল আছে, সবই করা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লোক আর হয় না। তখন স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী রামদত্ত মণ্ডল, গয়লাদের কীর্তনের দল ডাকিয়া আনিল। সঙ্গে একটি সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম। দশ মিনিটের মধ্যে হাটসুদ্ধ লোক ঐ স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পর আমরা তাড়াতাড়ি বক্তৃতা সারিয়া লইলাম। লোকে হাটের কাজে ব্যস্ত। দাদের ওষুধের ক্যানভাসারের বক্তৃতায় আর মাহাত্মাজীর চেলার বক্তৃতায় তাহারা কোনো তফাৎ বুঝিতে পারে না। হাটে আসিয়াছে, সবরকম তামাসার মধ্যে মহাত্মাজীর তামাসাও তাহারা দুই মিনিট দেখিয়া লইবে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো মহাত্মাজীর 'দর্শন' "নিমক সত্যাগ্রা"র পূর্বে করিয়াছে,—তাহারা আবার এই সব অর্বাচীন 'চেলার' মুখ হইতে নূতন কথা শুনিবে?—কী সব বলে পনের আনা কথা তো বোঝাই যায় না। আমাদের "মবেশীর চরীর"[১] ব্যবস্থা করুক, খাজনা কমাইয়া দিক, তহশীলদার পঞ্চের মহিষ যে সকলের ক্ষেত 'উজার'[২] করিতেছে—তাহা বন্ধ করুক, তবে তো বুঝি। তা নয়, কেবল মেম্বরী চাঁদা লওয়ার ফন্দি। মিনিস্ট্রী 'গদ্দীপর' বসিয়া খাজনা বাকীর আইন করিয়াছে। হাটে ভাষণ দিয়ে গেল, কাহারও চার আনার বেশী দরখাস্তে খরচ পড়িবে

১। গোরু মহিষ প্রভৃতির মাঠে চরানো। ২। ফসল খাইয়া যাওয়া।

না। খরচ পড়িল তাহার বিশগুণ। অর্ধেক লোকের দরখাস্ত তো খারিজই হইয়া গেল। মহাত্মাজীর চেলা পূণ্যদেওজীর কাছে দরখাস্তগুলি দিয়াছিলাম, তদ্বির করিবার জন্য। তিনিও দরখাস্ত পিছু আট আনা "মেহনতানা"[১] লইয়াছিলেন। এক মাস্টার সাহেব আছেন বলিয়া এ জেলায় মহাত্মাজীর কাজ কিছু হয়। না হইলে ইহাদের অর্ধেক লোক তো 'ঠগ'।......সত্যই তো কংগ্রেস সংগঠন, সম্পূর্ণ ধনী কিষাণদের হাতে। জমিদারের শোষণ হইতে তাহারা মুক্ত হইতে চায়; কিন্তু নিজেরা তাহাদের সীমিত ক্ষেত্রে আধিয়াদার, বাটাইদার বা নিঃসম্বল ক্ষেতমজুরদের উপর শোষণ বন্ধ করিতে চায় না; কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় নিঃস্ব রায়তদের জন্য যতগুলি আইন তৈয়ারী হইয়াছিল, সবগুলিই ইহারা কূটকৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সহদেওএর মতো কংগ্রেসকর্মীও আধিয়াদারের কায়েমীসত্ব বন্ধ করিবার জন্য 'বন্দোবস্তী'র মিথ্যা দলিল তৈয়ারী করিয়াছে।...

......দহিভাত গ্রামের সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি, যে কংগ্রেস অফিসে প্রায়ই আসিত,—গলায় প্রকাণ্ড গলগণ্ড—আসিয়াই কাঁদিতে বসিত; দাদাকে বলিত, "তুমি ছাড়া এর বিহিত আর কেউ করতে পারবে না। আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকিতে আমার উপর এই জুলুম। সহদেওএর দাদা কপিলদেও আমার সব জমিজমা নিয়ে নিতে চায়। জমি প্রায় পঞ্চাশ বিঘা। তার বাড়ীর কাছে জমি কিনা; 'মান্ধাতা'[২] তামাকের ক্ষেত চমৎকার হবে। তাই এই জমির উপর নজর। 'পুরুখ'[৩] ছিল তেলী। জোয়ান-ছেলে 'পুরুখ' থাকতেই মরে যায়। 'পুতহু'র[৪] তখন ছেলে পেটে। এক বছরের মধ্যে আমার 'পুরুখ' মরল; তারপর গেল 'পুতহু'। বছর না ঘুরতেই একরত্তি নাতিটিরও 'বাই উখর গিয়া'[৫]। সে চব্বিশ ঘণ্টা দাদীর কোলেই থাকতো। কত ওষুধ, কত চিকিৎসা হল। ব্যথা লাগবে বলে বাছাকে 'সুই'[৬] দিতে দিই নি। দিলে হয়তো বাঁচতো। তাকে আর ধরে

১। পারিশ্রমিক। ২। এক প্রকার তামাকের স্থানীয় নাম। ৩। স্বামী। ৪। পুত্রবধুর।

৫। এ দেশে অশিক্ষিত লোককে কী অসুখ করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেই বলিবে "বায়ু ছিঁড়ে গিয়েছে"। যে কোন অনির্দিষ্ট অসুখকে ইহারা এই নাম দেয়।

৬। ইনজেক্শন্।

রাখতে পারলাম না। পাড়ার গোরে গোপের ছেলে তার কিছুদিন পরে মারা যায়। তখন কপিলদেও পঞ্চায়তী করে আমার উপর 'ইলজাম'[১] লাগালো যে আমি ডাইনী; আগে নিজের বাড়ি শেষ করেছে, এখন গোরেলালের ছেলেকে 'বাণ' মেরে তাকে শেষ করলো। আরে বেকুফ, এটুকু বুঝলি না, আমি যে স্বামী, পুত্তুর, নাতিপুতি সব খেয়ে বসে আছি; আমার পেটে আর জায়গা কোথায়? তারপর আমাকে গ্রামছাড়া করবার জন্যে সেদিন রাত্রে রাধো, শনিচরা, ছেদী এরা সব কপিলদেওএর কথাতে, আমার বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। একমুঠো ধান পর্যন্ত বাঁচাতে পারি নি। আমি কিন্তু আমার ভিটে ছাড়চি না। শুনছি নাকি আবার কপিলদেও আমার উপর সদরে 'ডিক্রী' করিয়েছে, জমিটা নেওয়ার জন্য। আমি কি কচি খুকি যে এই কথা বিশ্বাস করব? জমি থাকলো দহিভাত গ্রামে, আর ডিক্রী করবে পূর্ণিয়ায়। তা কি কখনও হয়?"—এইরূপ কথা কত বলিয়া চলে; মধ্যে মধ্যে ঠক্ ঠক্ করিয়া মাথা কুটে এবং ডুকরাইয়া কাঁদিতে থাকে। সে বলে যে মাস্টার সাহেবের সময় কোথায়? তাহা না হইলে তাঁহাকেই দহিভাতে একবার লইয়া যাইতাম। কাজেই বিলুবাবু ছাড়া তাহার আর নাকি গতি নাই। দাদা আর আমি কত চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কপিলদেওএর এই অন্যায়ের বিহিত করিতে পারি নাই। আমরা দহিভাতে গেলে কপিলদেও পুরী তরকারি খাওয়াইয়া দেয়; কিন্তু কাজের কথায় আমল দেয় না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলে যে তাহারাও তো মহাত্মাজীর ভক্ত, সে তো জেলা কংগ্রেস কমিটির মেম্বার, আশ্রমের চাল ছাইবার "খড়" তো সেই প্রতি বৎসর দেয়, এক ভাইকে তো সে কংগ্রেসে দান করিয়াছে। আসল কথা বড় একান্নভুক্ত পরিবারের সকল লোকের কাজ, জমিজমা দেখিতে দরকার হয় না। বাড়ির অন্ন ধ্বংস করিয়া গ্রামে জটলা করা অপেক্ষা এক আধজনের কংগ্রেসে যোগদান করা ভালো। ইহাই বড় কৃষাণদের মনোবৃত্তি। কংগ্রেস সংগঠন হইতে যতটুকু সুবিধা পাওয়া সম্ভব, তাহা এই 'দানের' দ্বারা নিশ্চিত হইয়া যায়। চাই কী, ভাই যদি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মন জুগাইয়া চলে তাহা হইলে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের

১। অভিযোগ।

মেম্বার পর্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। আর নেহাৎ যদি কংগ্রেস কোনো বিষয়ে ধনী কৃষাণের উপর চাপ দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা গায়ে না মাখিলেই হইল। শেষ পর্যন্ত নৈতিক প্রভাব ব্যতীত আর কোনো শক্তিই তো কংগ্রেসের নাই।......

পরে একদিন ঐ তেলীবৌ দাদাকে রাগে দুঃখে বলিয়াছিল, "দারোগা সাহেবকে কপিলদেও কিনে নিয়েছে জানি। তোমাকেও কি কিনে নিয়েছে?" তাহার পর আরও কত কী বলিতে যাইতেছিল। হঠাৎ সহদেও আসিয়া পড়ায় থামিয়া যায়। শত্রুতাই থাকুক, সহদেব ভুঁইয়ার ব্রাহ্মণ—উঁচু জাত। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি। উহার সম্মুখে সামান্য তেলীবৌ জোরে কথা বলিতে পারে না। আর সহদেওকেও এ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিলে বলে, "কপিলদেও-ভাইয়া মালিক। আমি ইহার কী জানি?"

আমার ইচ্ছা করিতেছিল সহদেওকে ঘাড় ধরিয়া কংগ্রেস আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিই! ইহার পর অনেকদিন উহার সহিত কথা বলি নাই। দাদা কেবল আমাকে বলিয়াছিল, "ওর ওপর রাগ করে কী হবে—গলদ যে সংগঠনের গোড়ায়।"

১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের আন্দোলনে ক্যাম্পজেলে থাকিবার সময় আমাদের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যর্থতার কথা আমরা অনুভব করি। জেলে এ সম্বন্ধে কত আলোচনা, বাদানুবাদ, মনোমালিন্য হইয়া গিয়াছে। যাহারা এই ব্যর্থতার কথা প্রকাশ্যে না বলিত, তাহাদের মুখে হতাশার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। সেই বীজ এতদিনে অঙ্কুরিত হইল। দাদা ও আমি কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করিলাম। তেলীবৌয়ের ঘটনা, সুপ্ত বীজকে তাপ ও জল সিঞ্চন করে। ঐ স্ত্রীলোকটি এখনও তাহার স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে কিনা জানি না; কিন্তু তাহার চোখের জল আমাদের হৃদয়ের সকল দ্বিধা, সন্দেহ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। হৃদয়-কন্দরের অর্ধজাগরিত আকাঙ্ক্ষা, গবাক্ষপথে উষার আলোক দেখিতে পাইল। তাহার পর আমি আর দাদা একই পার্টির মধ্যে থাকিয়া কী উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছি। ও যে কেবল সহকর্মী নয়, কেবল

কমরেড নয়—ও যে আমার দাদা। কত সুখদুঃখের স্মৃতি বিজড়িত একসূত্রে গাঁথা আমাদের জীবন। কিসে আমার ভালো হইবে, কিসে আমার একটু আনন্দ হইবে, এই চিন্তা সর্বদা তাহার মনে…। নিজে কলেজে পড়ে নাই। তাহার জন্য দাদার মনের দুঃখ কম ছিল না। "আর্থকোয়েক রিলিফে"র কাজের 'এলাওএন্স'-এর টাকা দাদা আমার কলেজের পড়ায় খরচ করিয়াছে। তাহার মনের সাধ আমারই উপর দিয়া মিটাইয়াছে। 'রিলিফে'র কাজ শেষ হইবার পর, জিনিসপত্র যখন নিলাম হয় তখন দাদা একখানি সাইকেল কিনিয়া আমাকে দেয়। এসব তো তুচ্ছ জিনিস। দাদার ভালবাসার প্রসঙ্গে এইসব জিনিসের কথা উঠানো, দাদার ভালবাসাকে ছোট করিয়া দেওয়া মাত্র। আমার মাথা ধরিলে দাদা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। জেলের মধ্যে 'এতোয়ার'[১] করিয়া যে গুড় পাইত, লক্ষ্য করিতাম যে সে নিজে তাহা খায় না। কেননা দাদা জানে যে আমার ভাত খাওয়ার পর একটু মিষ্টি না খাইলে, মনে হয় খাওয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। জেলে নিয়মিত আমার জামা ও জাঙ্গিয়া কাচিয়া দিয়াছে; বাধা দিলে বলিয়াছে, "থাক, তোর অভ্যাস নেই।" আমিও আর জোর করি নাই। মনে হইয়াছে দাদা আমার জন্য এসব করিয়া দিবে ইহা তো আমার ন্যায্য দাবি—ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই।

কিন্তু……কিন্তু দাদার কি আমার উপর কিছুই দাবি নাই? থাকিতে পারে। থাকিতে পারে কেন, আছে। তাহার স্থান রাজনীতি ক্ষেত্রের বাহিরে। রাজনীতিক্ষেত্রে, আমি নীলু, আর সে দাদা নয়। এখানে যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়িয়া, যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রত্যেক কার্যপদ্ধতি যাচাই করিতে হইবে; আমার পার্টির দৃষ্টিকোণ দিয়া সকল ধর্ম বিচার করিতে হইবে; …পৃথিবী আমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা ভাবুক, দাদা আমার মনোভাব ঠিক বুঝিবে; সেখানে যে সংকীর্ণতার লেশ মাত্র নাই।…

……১৯৪০ সালে আমি আর দাদা যখন গ্রেফ্‌তার হই তখনও আমরা দুইজনই সি. এস. পির মেম্বার। কিন্তু জেলের ভিতর কয়েক মাসের মধ্যে কী পরিবর্তন হইয়া গেল!…সেই ওয়ার্ডের কাঁঠাল গাছের তলায়, চন্দ্রদেওএর

১। রবিবার।

সহিত প্রথম আলাপ—তাহার নিকট হইতে বই লওয়া—তাহার লেকচার ক্লাসে যাওয়া—কাঁটাল গাছের নীচে কম্বল বিছানো লেকচার ক্লাস—সব চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।···তাহার অকাট্য যুক্তির নিকট মাথা নত করিতে হইল। মনে হইল ধীরে ধীরে দৃষ্টির সম্মুখের বধির যবনিকা সরিয়া যাইতেছে,—দাদার পক্ষপুটে থাকিয়া যে ভঙ্গীতে রাজনীতিক্ষেত্র দেখিতাম, তাহা রুগ্ন, jaundiced, ভ্রান্ত; উহা সুবিধাবাদী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস মাত্র। যথার্থ সর্বহারার সাবলীল উদ্দামতার স্থান সেখানে নাই;—জাতীয়তার বাহিরে দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। চন্দ্রদেওদের দলে প্রবেশ করিবার পূর্বে মনে করিয়াছিলাম, দাদার সহিত আলোচনা করিব। বলি বলি করিয়াও কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই; মুখ্যত সঙ্কোচের জন্য, আর গৌণত ভয় ছিল যে তাহার যুক্তির উত্তর দিতে পারিব না। অথচ মনে মনে অনুভব করিতেছিলাম, দাদার যুক্তি ভুল। প্রতি যুক্তির উত্তর যদি চন্দ্রদেওএর নিকট হইতে শুনিয়া, পুনরায় দাদার কাছে বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে হইত। শেষ পর্যন্ত দাদাকে না বলিয়াই নূতন দলে যোগদান করিয়াছিলাম। আর জিজ্ঞাসাই-বা করিব কেন? রাজনীতিক্ষেত্রে নাবালকত্ব কি চিরকালই থাকিয়া যাইবে? সেই সময় হইতে আমাদের দুইজনের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়িয়া উঠিল,—তাহা আজ পর্যন্ত রহিয়া গিয়াছে।···রাজনীতিক কর্মীর জীবন তাহার পার্টির ভিতরে—পার্টির বাহিরের অস্তিত্ব তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর হইতে আমি দাদাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছি। নেহাত ব্যক্তিগত কাজের কথা ব্যতীত আর অন্য কোনো কথা হয় নাই। আমার সর্বদা ভয় যে, আমার পার্টির লোকেরা আবার কী মনে করিবে। দাদা যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বীদলের নামজাদা কর্মী! উহার সহিত অন্তরঙ্গতা আমার পার্টির লোকেরা নিশ্চয়ই পছন্দ করিবে না। আমাকে হয়তো কিছু বলিবে না; কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা করিবে। এই দুই দল ছাড়াও আরও কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলের কর্মীরাও সেখানে ছিল। প্রত্যেক দলের বিশ্বাস যে তাহাদের দলের মধ্যে অপর দলের চর আছে। আর সত্যই; যতই গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা কর,

এক দলের কথা অপর দলের লোকেরা নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে। জেলে দেওয়ালেও শুনিতে পায়।

দাদাও আমার সঙ্কোচ দেখিয়া, আমাকে এড়াইয়া চলে। পার্টিক্লাস হইতে আসিয়া নিয়মিত দেখি আমার বিছানা ঝাড়া হইয়াছে; ঐ পরিচ্ছন্ন বিছানায় দাদার দরদীহাতের স্পর্শ অনুভব করি। যেদিন মা'র কিংবা বাবার চিঠি আসে, সেইদিন কেবল দাদার সহিত কথা বলিবার সুযোগ পাই। মা'র পোস্টকার্ড আসিয়াছে—আমি পড়িয়া দাদার বিছানার উপর রাখিলাম। "কার চিঠি; মা'র নাকি?" বলিলাম, "হ্যাঁ"। দাদা চিঠি পড়িতেছে—"সকালে খালি পেটে চা খেয়ো না। মধ্যে মধ্যে ত্রিফলা আর ইসবগুল খাবে। বেলপোড়ার বন্দোবস্ত করতে পারলে সব চাইতে ভালো। আমার বড় ভয়—জেলে তোমাদের প্রত্যেকবারেই আমাশা হয়। সিকিউরিটি বন্দীদের তো এ সব জিনিস যোগাড় করা শক্ত নয়। যদি টাকার দরকার হয় লিখতে লজ্জা করো না। যেমন ক'রে হোক পাঠিয়ে দেবো"।—"মা'র কাণ্ড"—বলিয়া দাদা অল্প অল্প হাসিতেছে। বাঁ গালে টোল পড়িয়াছে।···কত কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা করে। আগে হইলে মা'র সম্বন্ধে কত গল্প হইত। এখন খালি বলিলাম, "হ্যাঁ"। বুক ভরা কত কথা; কিন্তু সঙ্কোচের শৈত্যে জমিয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে।···ছোটবেলায় একখানি লেপের মধ্যে আমি আর দাদা শুইয়া আছি। রাত্রি চারিটা হইতে গল্প আরম্ভ হইয়াছে—গল্পের আর শেষ নাই।···এখন ছোট একটি "হাঁ" বলিবার পর মনে হইল যে, আর কথা যোগাইতেছে না। কথা ফুরাইয়া যাইবার অস্বস্তি চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে। তাহা ঢাকিবার জন্য একটি কাজের অছিলা লইয়া, ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হয়······

···তাহার পর সেই দেউলীতে ট্রান্স্ফারের দিন···। আমাদের কয়েকজনকে মাত্র দেউলীতে পাঠানো হইতেছিল। দাদা ঐ দলের মধ্যে ছিল না। যাইবার দিন দাদা আমার বাক্স গুছাইয়া দিল। বাক্সের নীচে একখানি তাল-পাতার পাখা রাখিয়া দিল।···পাখাখানিতে মা'র হাতের ঝালর দেওয়া। তাহার এক জায়গায় লেখা, 'নীলু বিলু পিল্পিলু'। কোন অসম্বৃত

মুহূর্তে মা'র কী মনে হইয়াছিল, কী ভাবিয়া 'পিল্‌পিলু' লিখিয়াছিলেন জানি না। ...তাহার ফাউণ্টেনপেনটি দাদা আমার পকেটে গুঁজিয়া দিল। এখনও আমার পকেটে সেই কলমটি রহিয়াছে।...

"বাবুসাহেব সো গয়ে কেয়া?" (ঘুমিয়ে পড়েছেন না কি?)

দেখিলাম সুবেদার সাহেব পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

"না, কেন?"

...সে ডিউটি ছাড়িয়া গেটের বাহিরে আসিল কেন?

"আপনার ডিউটি শেষ হল বুঝি?"

"হ্যাঁ,—না আমার তো রাত্রে ডিউটি থাকে না। ভোর রাত্রে অফিসার-টফিসারের আসবার কথা। সেই জন্য ভাবলাম, আজ এখানেই শুই। এর আগের ফাঁসির দিন সাহেব রাউণ্ডে এসেছিল। ফাঁসিমঞ্চে চারিদিকে বড় বড় আলো দিয়ে সেই জায়গাটা দিনের মতো করে রাখা হয়, আর চারজন ওয়ার্ডার সেইখানে পাহারা দেয়। শালা জেলখানার ব্যাপার; কত রকম কয়েদী, কত রকম ওয়ার্ডার আছে। কেউ পয়সা-টয়সা খেয়ে যদি ফাঁসির মঞ্চে কিছু গোলমাল করে দেয় তাহলে হয় তো কাজের সময়ের আগে সেটা ধরা পড়বে না। তাই এত সাবধান হওয়া। একটা ফাঁসিতে গোলমাল হলে সাহেব থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ডার পর্যন্ত সকলের চাকরিতে 'নুক্‌স্‌'[১] পড়ে যাবে। আর এসব বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হওয়া উচিত ভিতরের হেড জমাদারের উপর। কিন্তু সে নবাবের পুত্তুর সাহেবকে কী বুঝিয়ে দিয়েছিল জানি না, সাহেব দেখি আমার উপর ভীষণ খাপ্পা। সাহেব নতুন এই 'ডিপাটমে' এসেছে। জেলের নিয়ম কানুনের না কিছু জানে, না কিছু বোঝে। অমন কত সাহেব লড়ায়ের সময় দেখেছি। কত মেম-সাহেবদের হাতের দেওয়া 'সন্তরা'[২] খেয়েছি। এখন কিনা পেটের দায়ে বিনা দোষে গালমন্দ সহ্য করতে হয়।...

দেখিলাম সুবেদার সাহেব আমাকে কিছু বলিবে, তাহারই ভূমিকা বাঁধিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহলে এখন আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

১। দাগ, কলঙ্ক। ২। কমলালেবু।

"যা মশা, শোবার কি জো আছে? বিছানাও অফিস ঘরে পেতে রেখেছি; কিন্তু বড় গরম। আপনারও তো নিশ্চয়ই মশা লাগছে। তাই ভাবলাম বাড়ি গিয়ে চা খেয়ে আসি। যুদ্ধে গিয়ে এই বদভ্যাসটা হয়েছে। তা আপনিও চলুন না কেন? এই মশার কামড়ে সারারাত পড়ে থাকার কী দরকার? নোখে সিং পরিবার নিয়ে থাকে না। তার কোয়াটারে রাতটা কাটিয়ে দেবেনখ'ন। আপনার মানসিক কষ্ট তো আমরা কমাতে পারি না, কিন্তু তাই বলে যতটুকু আপনাদের সেবা করতে পারি, তা করবো না কেন? আমাদেরও বালবাচ্চা আছে। আমরাও 'বিলায়েৎ' এর মানুষ না।"

আমি বলি, "থাক থাক—বেশ তো আছি। মশা বেশী নেই তো। আবার এখন এই রাতে কোথায় দৌড়াদৌড়ি করব?"

তাহার ভদ্র ব্যবহার আমাকে অভিভূত করে। আমার মৃদু আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া একরকম জোর করিয়া আমাকে টানিয়া উঠাইল। আমি কম্বলগুলি তুলিতেছিলাম। সুবেদার বলিল, "থাক থাক—আমাকেও কিছু বিছানা দিন। দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে নিয়ে যাওয়া যাক।"

আমি বলি—"কী আর ভারি!"

চারিখানি কম্বলের মধ্যে তিনখানি সে নিজেই লয়, আর আমি একখানি।

বলে—"এই তো কাছেই কোয়ার্টার।"

রাস্তা পার হইয়া, ডাক্তারদের কোয়ার্টারগুলি ছাড়াইয়া গিয়া ওয়ার্ডার-দের কোয়ার্টারগুলির সম্মুখে দাঁড়াই। কোয়ার্টার বেশী নাই। কেবল সিনিয়র ওয়ার্ডাররা বাড়ি পায়। বাকি সকলে বড় ব্যারাকে থাকে। একটি দরজার সম্মুখে গিয়া দরজা ধাক্কা দিয়া, সুবেদার-সাহেব বলে—

"আরে, এযে দেখি তালা বন্ধ! বাবু, আমি এক্কেবারে ভুলে গিয়ে-ছিলাম। নোখেলাল এখন ডিউটিতে। আপনাকে মিছামিছি কষ্ট দিলাম।"

আমি বলি, "তাতে কী হয়েছে। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি। কত-টুকুই বা দূর?"

"দাঁড়ান আলো নিয়ে আসি।"

"না না, থাক থাক। আর আলোর দরকার নেই"…নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করিয়া, একটি ভাঙা কর্কশ স্বর উঠিল "লেফট টারন্"। দূরত্ব কর্কশতাকে কিছু কমাইয়া স্বরটাকে কিছু মধুর করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। আওয়াজ জেলের ভিতরের। বোধহয় ওয়ার্ডারের দল বদল হইতেছে। ঠিক গেটের সম্মুখে বসিয়া, দুই ঘণ্টা পূর্বের "দফাবদলের" সময় ইহা শুনিতে পাই নাই। এখন গেট হইতে কিছু দূরে রহিয়াছি বলিয়া এই শব্দ শুনিতে পাইলাম। গেটটি কী sound proof ?

পুনরায় জেলগেটে ফিরিয়া আসিয়া পূর্বের জায়গায় কম্বল পাতি। একখানি মাত্র কম্বল। বাকি তিনখানি সুবেদার সাহেবের কাছে রহিয়া গিয়াছে। এইজন্যই কি সুবেদার সাহেবের এত সহৃদয়তা? এইজন্যই কি রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বাড়ি যাইবার কথা মনে হইয়াছে? একখানি কম্বল যদি কেহ জেল হইতে বাহিরে 'চালান' করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে আর তিনখানি কম্বল, অপর তিনজন সহকর্মীকে দিতে হইবে। ইহাই জেলের জিনিস বাইরে 'চালান' দিবার প্রচলিত নিয়ম। তাহা না হইলে ধরা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ অনায়াসে তিনখানি কম্বল বাড়ি লইয়া যাইবার লোভ সম্বরণ করা সুবেদার সাহেবের পক্ষে অসম্ভব। তাহার উপর আবার এখন যুদ্ধের বাজার।…

আবার পূর্বের স্থানে আসিয়া বসি। রাষ্ট্রের বিরাট পেষণ-যন্ত্রগুলির মধ্যে জেলের স্থান নগণ্য নয়। চক্রের মধ্যে চক্র,—ইহারই একটির সম্মুখে বসিয়া আছি। জেলগেট—বড়ই কঠোর ও প্রাণহীন; সবই নিয়মিত রুটিনে হইয়া চলিয়াছে, ঘড়ির কাঁটার মতো। আর ঘড়ির যন্ত্রে প্রধান প্রধান স্থানে যেরূপ জুয়েল বসানো থাকে, সেইরূপ এই পেষণচক্রের দুইটি হীরকখণ্ড, গেটের সুবাদার ও ভিতরের সেণ্ট্রাল টাওয়ারের হেড-ওয়ার্ডার।

এই চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই জেল গেটের একঘেয়েমি অসহ্য লাগিতেছে। অন্ধকারে ওয়ার্ডারদের কোয়ার্টার পর্যন্ত ঘুরিয়া আসাতে যেন এই একঘেয়েমি হইতে একটু বাঁচিলাম।…আবার সেই ওয়ার্ডারের দল,—ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া দরজা খোলা ও দরজা বন্ধ করা।…গেটে ওয়ার্ডার না রাখিয়া,

যন্ত্রে এই সকল কাজ করিলে কি হয়? একই কাজের পুনরাবৃত্তি যেখানে সেখানে যন্ত্রের সাহায্য লওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব ও সমীচীন।...

গেটের উপরতলা হইতে একটি ওয়ার্ডার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। গেটের দোতলায় জেলর সাহেবের কোয়ার্টার; তাহারই সম্মুখে খোলা বারাণ্ডায়, বন্দুকধারী ওয়ার্ডার ঘণ্টা বাজায়—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, রৌদ্রে-হিমে, দিনে-রাত্রে। প্রতিঘণ্টায় ঘণ্টা বাজানো তো আছেই, তাহা ছাড়া সাহেব ঢুকিলে দেয় একটি ঘণ্টা; গণ্যমান্য অতিথি জেলে ঢুকিবার সময় দেয় দুইটি ঘণ্টা। ইহা বোধহয় ভিতরের সকলকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য ও গলদ ঢাকিবার পর্যাপ্ত সময় দিবার জন্য। ইহার উপর আছে মধ্যে মধ্যে "পাগলী"র ঘণ্টা। সে সময় তো ঘণ্টা বাজিবার বিরাম থাকে না। সে সময় দূর হইতে ঠিক রবিবারের গীর্জার ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শোনায়।...গীর্জা নিজের দল সামলাইতে ব্যস্ত এবং 'পাগলী'ও একটি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিতে নিয়োজিত।...

...ঘণ্টা বাজাইবার ওয়ার্ডার দুই ঘণ্টা এত বড় দায়িত্বের কাজ করিয়া সগর্বে গেটের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। গেটের বাহিরের সান্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, "তোমার ভাই এত দেরি কেন? নূতন 'দফা'র ওয়ার্ডার তো অনেকক্ষণ উপরে গিয়াছে।"

"আর 'ইয়ার' বল কেন? ডিউটি আরম্ভ করিবার সময় আগেকার ওয়ার্ডার বলে যায়, একটার সময় জেলর সাহেবকে ডেকে দিতে। ভাবলাম জেলর সাহেব বুঝি রাউণ্ডে বেরুবেন। এখন দোর গোড়ায় ডাকাডাকি করতে গিয়ে দেখি, একেবারে খাপ্পা। এখন বলে কিনা,—কেন চীৎকার করছ? বড় অফিসার,—যা কর শোভা পায়। প্রথমে গরম হয়ে উঠে, পরে আবার হুকুম দিলেন, যে নূতন ওয়ার্ডারকে বলে দিতে তাঁকে যেন তিনটের সময় ডেকে দেয়। এওয়ার্ডারটি যদি না ডাকে তো বেশ হয়; সাহেব নিজেই এসে ডাকবে। তাহলে মজা বেরোয়।..."

গেটের সান্ত্রী বলে, "দাঁড়াও, যাও কোথায়? একটু খয়নি-টয়নি খেয়ে যাও।"

"না ভাই, এবার গিয়ে শোয়া যাক। এই রাতে আবার খয়নি খেয়ে কী হবে?"

একথা বলা সত্ত্বেও সে খয়নির প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। সে মাথার পাগড়ি খুলিয়া ফেলে—বোধহয় গরমে। মাথায় বেশ টাক।

গেটের সান্ত্রী বলে, "একটু ঠাণ্ডা তেল লাগাবে মাথায়। মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। জমাদার সাহেব তেলটা ফেলে গিয়েছে। বোধহয় বি-ডিভিশন কয়েদীর হবে। নিশ্চয়ই ঠিকেদার সাহেবের 'নজরানা'। টাকের উপর লাগিয়ে নাও। চুল গজালে আর টাকের উপর মশা কামড়াতে পারবে না"।

ইহার মাথায় টাক যেন আশাই করি নাই।...মেরী স্টুয়ার্টের কুঞ্চিত কেশদামের খ্যাতি ছিল দেশবিদেশে। বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার পর লোকে জানিতে পারে ঐ কেশদাম তাঁহার নিজের নয়; তিনি পরচুলা ব্যবহার করিতেন।...পুলিশ কনস্টেবলের মাথায় টাক কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। উহাদের মাথায় থাকিবে পাগড়ি, সন্ন্যাসীর মাথায় থাকিবে জটা...

—আমি আর দাদা, সেই জমিদার অখৌরী সিংএর বৈঠকখানায় গিয়াছি; তাঁহার ম্যানেজার চিঠি দিয়াছিলেন দেখা করিবার জন্য।...ধূর্ত সাঁওতাল 'মাঝি' নিজের জমি জমিদারের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য উহা মহাত্মাজীকে দান করিয়াছিল। জমিটি জমিদারের মেলার কাছে পড়ে। মেলায় নারীদেহের রূপলাবণ্য যে সকল তাঁবুর পণ্য—সেই তাঁবুগুলি, এই ভূখণ্ডের নিকটেই খাড়া করা হয়—সারির পর সারি। এই বর্ধিষ্ণু মেলার এই দিকটাতেও স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। তাই জমিদারের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ইহার উপর। 'মাঝি' ভাবিয়াছিল—মহাত্মাজীর লোকেরা জমিদারের সহিত লড়ুক, তাহার পর তাহাদেরও জমির দখল না দিলেই হইবে। প্রথমে আমরা তাহার এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারি নাই! বাবাও বলিয়াছিলেন—কী দরকার ওখানে জমি নিয়ে। আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম ম্যানেজারের নামে। তাহার উত্তরেই এই ডাক পড়িয়াছে। বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিয়া অখৌরী সিংকে চিনিতেই পারি না। তাঁহার মাথায় টুপি নাই—মাথা ভরা চকচকে টাক। কেবল পিছন দিকের টিকির নিকট

একগুচ্ছ কেশ—লম্বা করিয়া রাখা। উহাই spiralএর মতো ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, 'ব্রিলানটাইন' দিয়া মাথার সম্মুখের দিকে বসানো।...টেকোদের কী সত্যই অনেক টাকা হয়?...ম্যাথামেটিক্স্ টিচার রামেশ্বর বাবু জ্যামিতি পড়াইতেছেন। ঠিক মাথার মধ্যখানে একটি টাক! ব্ল্যাক-বোর্ডে লিখিলেন, 'টেক্ ও দি মিড্ল পয়েন্ট।' ক্লাসসুদ্ধ সকলে হাসিতেছে।......এইজন্যই কি আগেকার কালে পরচুলা ব্যবহার করিবার প্রথা ছিল? অখৌরী সিং ম্যানেজারকে ইংরাজীতে কী যেন বলিলেন। ম্যানেজার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি মাস্টার সাহেবের ছেলে? কংগ্রেস ভলান্টিয়াররা মাঝির ঐ জমির উপর চালা তুলেছে। শুনেছি যে ঐ দিককার তাঁবুগুলো বয়কটের জন্যে পিকেটিং করবে। কাল রাতে জানেন তো দুজন ভলান্টিয়ারকে পুলিশে ধরেছে, ঐ তাঁবু থেকে অর্ধেকরাতে বেরোবার জন্যে। বোধহয় মেলার পুলিশের নিয়ম জানেন। রাত বারোটার পর আর কেউ পাড়ার তাঁবু থেকে বেরোতে পারে না। বারোটার আগে চলে এসো, না হলে ভোর বেলায় বেরোও। কাদের পাল্লায় পড়েছেন আপনারা? তার ওপর কার দিক নিয়ে লড়ছেন? এই 'মাঝি'কে দুচার বিঘে জমি অন্য জায়গায় দিলেইতো ও আমাদের দিকে হয়ে যাবে। কংগ্রেসের জন্য মোটা চাঁদা চান, দিতে পারি; কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি এসব গোলমাল মাথায় নেন তাহলে......"

"আদাব বাবুসাহেব"।

ঘণ্টার সিপাহী যাইবার সময় আবার আমাকে আদাব করে কেন?

সে বলে, "পরশু দুপুরে ফাঁসিসেলে আমার ডিউটি ছিল—দেখলাম বাবু খবরের কাগজ পড়ছেন।" লোকটি নিজে হইতেই দাদার খবর দিতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ হইতেই ইচ্ছা করিতেছিল যে এই সব ওয়ার্ডারদের দাদার কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রতিদল ওয়ার্ডার যখনই ডিউটি শেষ করিয়া বাহির হইতেছিল, তখনই ইচ্ছা করিতেছিল যে তাহাদের জিজ্ঞাসা করি, তাহাদের মধ্যে কাহার ফাঁসিসেলে ডিউটি ছিল। কেমন বাধ-বাধ লাগায়, জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। ইহারা সকলেই হয়তো আমার

সাক্ষ্য দিবার কথা জানে,—জেলেইতো বিচার হইয়াছিল। কী জানি ইহারা আমার সম্বন্ধে কী মনে করিতেছে…

দাদার সম্বন্ধে খবরের এই অপ্রত্যাশিত স্থবিধায় খুব আনন্দ হইল। ওয়ার্ডারকে কত কথা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। নেহাল সিংএর মারফত যে সমস্ত খবর পাইয়াছিলাম, সেগুলি একে একে মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। খাওয়ার কিছু আলাদা ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা বুঝা গেল না। নেহাল সিং কি তাহা হইলে টাকাগুলি সবই নিজেই খাইয়াছে? দাদার জন্ম কি কিছুরই বন্দোবস্ত করে নাই? বাবুজী কতক্ষণ সেলের মধ্যে পায়চারি করে, কখন ওঠে, কখন স্নান করে, কখন ঘুমায়, সব কথার উত্তর ওয়ার্ডারটি দিল। অধিকাংশ মনে হইল আন্দাজে বলিতেছে। আসলে সে নিজে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করে নাই। একদিন নাকি সে দেখিয়াছিল যে বাবুজী বিড়ালকে দই খাওয়াইতেছেন। হইতেও পারে! সত্যমিথ্যা মিলানো, তাহার গল্প শুনিতে বেশ ভালো লাগে। অন্তত এটুকু সত্য যে, সে দাদাকে দেখিয়াছে।…ওয়ার্ডারটি চলিয়া গেল। পায়ে পট্টি বা মোজা নাই—যা গরম। খাকীর হাফপ্যাণ্টের নীচে পা দুইটি ধনুকের ন্যায় বাঁকা মনে হয়!

……চীনেম্যানের পা।…দৈত্যের ছায়া যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে দুইখানি চলমান পা—অন্ধকার—গেটের এক ঝলক আলোকে আলোকিত পিচের রাস্তার এক টুকরা—আঁধার ভরা দেওয়াল—গেটের গরাদ—আবার গেটের ভিতর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া এই আলোকিত অংশই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার বাহিরে ইহা অপেক্ষা কতগুণ বিস্তৃত অন্ধকার ও যোজনব্যাপী তারকা খচিত আকাশ রহিয়াছে। তাহা আমার মন ও দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না।…গেটের ভিতর প্রবেশ করিতে মধ্যে হলঘর, দক্ষিণে জেল অফিস, বামে জেলর ও স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দুই জনের বসিবার ঘর। অফিসের বাহিরের দিকের গরাদগুলির উপর লোহার জাল দেওয়া। কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজন আসিলে, এই জালঘেরা গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে। আশ্চর্য এ জেলের ব্যবস্থা! সাক্ষাৎকারীদের রৌদ্রে ও জল হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহার উপর একটি আচ্ছাদন পর্যন্ত নাই—জাল

দেওয়া, পাছে কোনো জিনিস আদানপ্রদানের চেষ্টা করা হয়। অনভিজ্ঞ সাক্ষাৎকারী একে তো বিস্তর খরচ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জেলগেটে আসিয়া পৌঁছায়; তাহার পর দরখাস্ত করার হাঙ্গামায় ও দরখাস্ত মঞ্জুরির অর্থব্যয়ে প্রায় দিশাহারা হইয়া পড়ে। এই সকল দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া, যখন কয়েক মিনিটের জন্য গরাদের ব্যবধানে কয়েদীর পোশাক পরিহিত একটি রুক্ষকেশ শীর্ণমূর্তি দেখিতে পায়, তখন ইহা যে তাহার অতি পরিচিত প্রিয়জনের মূর্তি এই কথাটি ভাবিয়া লইতেও সময় লাগে। সাধারণ মেট ও ওয়ার্ডারদের অপমানসূচক কথাবার্তা ইহাদের ওপর অকাতরে বর্ষিত হইতেছে। কয়েদীর পোশাক, খাকীর উর্দি ও পাগড়ি, গরাদ, তালা, সি. আই. ডি. সব মিলিয়া আবহাওয়া এমন করিয়া তোলে যে, এখানে দিশাহারা না হইয়া পড়াই আশ্চর্য। অবান্তর দুই চারটি কথার পর শোনা যায় যে সময় হইয়া গিয়াছে। সাক্ষাৎকারীর চোখের সম্মুখে কিছুক্ষণ পরে ভাসিয়া উঠে, প্রিয় পরিজনের দুইটি মূর্তি; একটি যখন গরাদের সম্মুখে আসে তখনকার,—উদ্‌গ্রীব, সলজ্জ, অপ্রতিভ মুখখানি; আর একটি চলিয়া যাইবার সময়ের—করুণ, অসহায়, আশাহীন। তখনকার জোর করিয়া মুখে হাসি আনিবার ব্যর্থ প্রয়াস, বুকফাটা ক্রন্দন অপেক্ষাও মর্মন্তুদ মনে হয়।

…১৯৩৩এ বাবার সহিত দেখা করিতে হাজারীবাগ জেলে গিয়াছি। জ্যাঠাইমা সঙ্গে এক টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্তি করিয়া বাবার জন্য খাবার তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন; গিয়া শুনিলাম সেদিন আপার ডিভিসন কয়েদীদের সাক্ষাতের দিন নয়, 'সি' ক্লাস কয়েদীদের সাক্ষাতের দিন। কয়েকজন সাক্ষাৎকারী স্টেশনে টিকিট ঘরের সম্মুখে যেমন হয়, ঠিক সেইরূপ ঠেলাঠেলি করিতেছে। গরাদের ভিতরেও অনেকগুলি কয়েদী—জানালার গরাদের নিকটে আসিবার জন্য ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। হট্টগোলের ভিতর কে কী বলিতেছে, কাহাকে বলিতেছে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে ও কান্নার সহিত গ্রাম্য ভাষায় কী সব বলিয়া যাইতেছে, তাহার একবর্ণও তাহার ছেলে বুঝিতে পারিতেছে কিনা সন্দেহ। একটি বৃদ্ধ মুণ্ডা কয়েকটি পেয়ারা ও এক ঠোঙ্গা ফুলুরি লইয়া

আসিয়াছে। সে তাহার ছেলেকে উহা খাইতে দিবার জন্য ওয়ার্ডারের খোশামোদ করিতেছে। ওয়ার্ডার দর বাড়াইতেছে "ডাক্তার সাহেব মঞ্জুর না করলে কী করে দেবো? 'সি' ক্লাসীদের বাইরের জিনিস নেবার হুকুম নেই। 'সি' ক্লাস কয়েদীকে খাবার দেবার জন্য আমাকে এক টাকা দিতে হবে। ডাক্তার সাহেবের মঞ্জুরির জন্যে আর এক টাকা। আমার চাকরির গোলমাল হতে পারে—এসব কাজ আমি বিনা পয়সায় করবো কেন?" অনেক কাকুতিমিনতির পর এক টাকায় রফা হয়। ইহা বোধ হয় দরিদ্র মুণ্ডাটির এক বৎসরের সঞ্চয়। টাকাটি সিপাহীজী পাগড়ির ভিতর গুঁজিয়া রাখিল। এই ফুলুরির ঠোঙ্গা কিন্তু যথাস্থানে পৌছিল কিনা কে জানে।

গেটের বাঁদিকের দেওয়ালে একটি কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে নোটিশ বোর্ড। উহার ভিতরে কাল রং-এর পটভূমিতে অনেকগুলি সাদা কাগজ আঁটা রহিয়াছে। কিসের নোটিশ জানি না। অন্য জেলে তো দেখি কেবল জেল কমিটির মেম্বরদের নাম লেখা থাকে। এত সব নোটিশ! বোধহয় আই. জি. শীঘ্রই জেল ভিজিটে আসিবেন। নোটিশ বোর্ডের নিচে টেলিফোন রিসিভার। ইহার পশ্চিম দিক ঘেঁসিয়া একটি ওজন করিবার যন্ত্র—রেল স্টেশনে যেমন থাকে। আর ঠিক গেটের মধ্য দিয়া গিয়াছে এক রেল লাইন—ন্যারো গেজের লাইনের সমান চওড়া···ডি. এইচ. আর-এর কিষণগঞ্জ লাইনে সেই একবার ছোট্ট এন্‌জিনটির সহিত একটি গরুর ধাক্কা লাগে। চুঙ্গীপাড়ার কাছে গাড়ি ডিরেল্‌ড হইয়া গিয়াছিল। জেল ফ্যাক্টরির জিনিস-পত্র বোঝাই করা ট্রলী, এই গেটের লাইনের উপর দিয়া চলে। লোহার লাইনের পাশে স্থানে স্থানে গোবর পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয় গরুর গাড়ি গিয়াছে। সাহেব ও হাকিম আসিবে বলিয়া দেখিতেছি সকলেই সন্ত্রস্ত, কিন্তু গোবরটি পরিষ্কার করার কথা কাহারও মনে নাই। হয়তো মনে আছে কিন্তু সকালে কয়েদীরা না আসা পর্যন্ত পরিষ্কার করিবে কে? মহামান্য ওয়ার্ডার সাহেবেরা এই হেয় কাজ করিতে যাইবে কেন? রেল লাইন, নোটিশ বোর্ড, ওজনের যন্ত্র, টেলিফোন, পাথরে বাঁধানো মেঝে, সব মিলাইয়া স্থানটিতে একটি রেল স্টেশনের ভাব আনিয়া দিয়াছে। মনে হইতেছে গাড়ির প্রতীক্ষায়, প্লাটফর্মের উপর কম্বল পাতিয়া বসিয়া আছি।···

…সৌরীনকে বলিয়াছি রামকৃষ্ণ মিশনের সৎকার কমিটিকে খবর দিতে —সকলে যেন খড়িয়াবাগ ঘাটে উপস্থিত হয়। ছোট শহর; অধিকাংশ লোকই কোনো না কোনো রকমে গভর্নমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট—উকিল, মোক্তার, কেরানী। তাহাদের সকলকেই গভর্নমেণ্টের বর্তমান মনোভাবের হিসাব রাখিয়া চলিতে হয়। যদি তাহারা না আসে? পুলিশের ভয়ে নাও আসিতে পারে। তাহা হইলে? তাহা হইলে জেলের লোকই দাহ করিবে। ইহারা পাঁচটি টাকা ও মোটর-লরি তো সকলকেই দেয়। সৌরীনের আবার মতলব দেখিলাম প্রোশেসন করিবার। বৃহস্পতিবারে কলেক্টর সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কলেক্টর সাহেব এই সর্তে মৃতদেহ আমাকে দিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, কোনো প্রোশেসন যেন না হয়। লোকে বোধহয় শুনিবে না। শ্মশান ঘাটে গিয়া যদি সকলে জড়ো হয়,—সে যত বড় ভিড়ই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাহা হইলে আমার কথা থাকে। কিন্তু বারণ করিব কাহাকে? পাটকল ইউনিয়নের সেক্রেটারি দাদা, এক্কাচালকদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট দাদা—ঐ সকল ইউনিয়নের সদস্যদের বাধা দিবে কে? আর কলেক্টর সাহেবের কাছে কী কথা দিয়াছি না দিয়াছি তাহাই বড় হইল? না; হউক প্রোশেসন। দাদার মৃতদেহ, বিলুবাবুর মৃতদেহ, শহীদের মৃতদেহ, 'মাস্টার সাহেবের বেটার' মৃতদেহ, ইহাতেও লোকে প্রোশেসন করিবে না তো কিসে করিবে?……গাড়ি, মোটর, বিপুল জনতা—ফুলের মালা—দেবদারু পাতা —বাড়ি বাড়ি হইতে গঙ্গাজল বর্ষিত হইতেছে—দোতলা হইতে কয়েকখানি তালপাতার পাখা পড়িল, তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি—ভিড়—ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি—তাহার পর অন্তহীন নরপ্রবাহের সর্পিল গতি।………নীরব— "গান্ধীজিকা জয়" নাই—'বিলুবাবুকা জয়' নাই—শোকের 'মর্সিয়া' গীত নাই—বিশৃঙ্খল জনসমুদ্রের উদ্দণ্ডতা নাই। আছে মুহ্যমান শোকের নিষ্ক্রিয়তা—আছে একটি "রাষ্ট্রীয় পরিবারের" একজন ছাড়া অপর সকলের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি—আছে সুপ্ত দেশাত্মবোধের ধিক্কার—আছে ভস্মের দৃশ্যমান শীতলতার মধ্যে ব্যর্থ আক্রোশের জাগরূক বহ্নি। এক ইশারায় এই অসহায় শান্ত জনতা হিংস্র ও উন্মাদ হইয়া আমাকে ছিঁড়িয়া

টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে।……সম্পূর্ণ হরতাল।…জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সম্মুখে প্রোশেসন এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়াছে। জ্যাঠাইমা কি একবার ঐ মৃতদেহের মুখের উপরের ফুলগুলি সরাইয়া, উহার দিকে তাকাইতে পারিবেন? কেবল মুখটি খোলা হইবে। গলা আমি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিব—ফুলচন্দনে মুখের বীভৎসতা ঢাকা পড়িয়াছে। মুখের কোণ হইতে কখন আসিয়া পড়িয়াছে কয়েক বিন্দু লোহিতাভ লালা—এখন শুকাইয়া রক্তচন্দনের ছাপের মতো দেখাইতেছে।…না, জ্যাঠাইমার বাড়ির সম্মুখ দিয়া কিছুতেই মিছিল যাইতে দেওয়া হইবে না…শ্মশানঘাটে বিস্তীর্ণ জনসমুদ্র—লাল পাগড়িতে চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে—বন্দুকধারী দেহরক্ষীর সহিত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব মোটরকার হইতে নামিলেন।…দাহকার্যে বিশেষজ্ঞ মনতীদা চিতা সাজাইতেছে। সে সকল প্রকার উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতার বাহিরে। জিজ্ঞাসা করিল, "ম্যুনিসিপালিটির কাঠ বুঝি? মড়া পোড়ানোর জন্যে যবে থেকে কাঠ স্টক করা আরম্ভ করেছে, তবে থেকে এই কাঠগুলোই দেখছি। একেবারে ঘুন ধরে গিয়েছে। হবে না? থার্ডক্লাস ম্যুনিসিপালিটি—কাঠের খরচ কোথায় এদের?"—মড়া পোড়াইবার দিন মনতীদাকে এক বোতল করিয়া দেশী মদ দিতে হয়। সকলেই একথা জানে। আজও কি মনতীদা, আমার নিকট মদ চাহিবে নাকি? ছাই লইয়া কি কাড়াকাড়ি! মহিলারা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইতেছেন—কেহ কেহ ছেলেদের কপালে লাগাইয়া দিতেছেন!…এই সময় কি কোন মা ছেলেকে প্রাণে ধরিয়া মনে মনে বলিতে পারিয়াছে, "বিলুবাবুর মতো হও"।…কখনই পারে নাই!……সেবার পানবসন্ত লইয়া আমি আর দাদা একসঙ্গে গরুর গাড়িতে আশ্রমে ঢুকিলাম। মা'র হাতে পাখা—দুই বিছানায় দুইজন শুইয়া আছি। মনের উৎকণ্ঠা ও গভীর বেদনা চাপিবার চেষ্টা করিয়া মা শুধু বলিলেন, "তোরা আমায় পাগল করবি?" মা ঠিকই বলিয়াছিলেন।…মুহূর্তের মধ্যে জনতার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—'জয়!' 'গান্ধীজীকা জয়!'—'জয় বিলুবাবুকা জয়!' 'নৌকরসাহি নাশ হো!' জয়ধ্বনির নির্ঘোষে আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত। মিলের সেই কুলীটি ঠিক যথাসময়ে 'নারা লাগাইবার' নেতৃত্ব লইয়াছে। শীর্ণকায় লোকের এত দরাজ গলা কী করিয়া সম্ভব হয়?

সে বলিতেছে 'বন্দে', জনতা -বলিতেছে 'মাতরম্' ; সে বলিতেছে 'বিলুবাবুকা', জনতা বলিতেছে 'জয়'। প্রতিবার বলিবার সময় সে ডানহাতখানি ঊর্ধ্বে উঠাইতেছে—মনে হইতেছে তর্জনী দিয়া আকাশের কোনো অজ্ঞাত লোকের দিশা দেখাইতেছে।···পুলিশ ভিড় সরাইয়া দিল। মৃদু লাঠি 'চার্জের প্রয়োজন হইল না। কুলীদের নেতাটির গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হাত উঁচু করিয়া মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনি দিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহাতে হাওয়াভরা রবার টায়ার হঠাৎ ছিদ্র হইয়া গেলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ একটি আওয়াজ বাহির হইতেছে।

যেদিকে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘর, জেলগেটের সেই কোণে, দেওয়াল ভরিয়া নানা প্রকার শাস্তি দিবার যন্ত্রাদি টাঙ্গানো—নানারকমের হাতকড়ি, বেড়ি, "ডাণ্ডাবেড়ি", "শিকলী বেড়ি"। কেহ জেলের ভিতর ওয়ার্ডারের সহিত রুখিয়া কথা বলিয়াছে; কেহ হয়তো জেলের সাহেবকে দেখাইয়া দিয়াছে যে "ফৈল" এ (পরিবেশন করিবার হাতা) সাড়ে পাঁচ ছটাক চাউলের স্থানে মাত্র সাড়ে তিন ছটাক চাউল আঁটে; কেহ হয়তো ঝগড়া করিয়াছে যে তিন মাস হইতে কুমড়ার তরকারি ব্যতীত আর অন্য কোনো তরকারি কেন তাহাদের দেওয়া হয় না; কেহ হয়তো একটি বেল পাড়িয়াছে—এইরূপ অসংখ্য মারাত্মক 'জেল অফেন্স'-এর সাজা দিবার জন্য এই সকল সাজ সরঞ্জাম। কয়েকটি বড় বড় পিপের মধ্যে দাঁড় করানো রহিয়াছে, শতাধিক পাকা বাঁশের লাঠি। তাহার পাশে একটি স্ট্যাণ্ডএর ছিদ্রের মধ্যে বসানো অনেকগুলি মোটা বেতের লাঠি। হাতে ঝুলাইয়া লইবার জন্য লাঠিগুলির উপরের দিকটিতে একটি করিয়া নেয়ারের বেড় আছে। উপরের দিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে অনেকগুলি পুলিশের বেটন; আর ডান দিকের কোণে দেওয়ালের হুকের সহিত টাঙ্গানো কয়েকটি লাল বালতি—তাহার উপর লেখা আছে FIRE। একদিকে গাদা করা আছে, বাঁশের ডগায় ন্যাকড়া জড়ানো কয়েক ডজন মশাল। রাত্রে "গিন্‌তী মিলান্" কিছুতেই যখন আর হয় না, তখন এই মশালগুলি কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া ওয়ার্ডাররা কয়েদী খুঁজিবার প্রয়াস পায়। লণ্ঠন কিংবা টর্চ তাহাদের হাতে দিয়া দিলেই তো হয়, তা নয় যত সব···

সেই একবার কয়েদী পালানোর রিহার্সাল হইতেছে। 'পাগলা' ঘণ্টা বাজিতেছে। সাহেব সেন্ট্রাল টাওয়ারের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। ওয়ার্ডাররা সাহেবকে নিজের নিজের কর্মকুশলতা দেখাইবার জন্য মশাল লইয়া এদিকে ওদিকে দৌড়াইতেছে—গাছতলা ও পায়খানাগুলির উপরই তাহাদের দৃষ্টি বেশী। যোগীলাল ওয়ার্ডের মধ্য হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহাব, হৈ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহাব, কয়েদী সচ্ ভাগা হ্যায় ন পেরকটিস পাগলী হ্যায়?" খোঁজা শেষ হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের ওয়ার্ডএ আসিলেন। আমরা সকলে তখন লক্ষ্মী ছেলের মতো নিজের নিজের বিছানায়। ব্যাপার আর বেশী দূর গড়াইল না।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।

আর মাত্র তিন ঘণ্টা। আজকাল নূতন টাইমে সাড়ে পাঁচটার পূর্বে সূর্যোদয় বোধহয় হয় না। তাহার পর? সূর্যোদয়ের পূর্বেই ইহাদের সব কাজ শেষ হইয়া যাওয়া চাই। কেননা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জেলের প্রাত্যহিক জীবন আরম্ভ হইয়া যাইবে। সাতটার পূর্বেই প্রাতঃকালীন লপ্‌সী পর্বশেষ করিয়া দিতে হইবে, কারণ সাতটা হইতে ফ্যাক্টরি খুলিবে। সাড়ে পাঁচটার সময় উনানে আগুন না দিলে, সাতটার পূর্বে প্রাতরাশ শেষ হইবে কিরূপে? যে সকল কয়েদী 'ভাঠ্‌ঠহা' (রান্নাঘর) কম্যাণ্ডে কাজ করে, তাহাদের প্রাতঃকৃত্যাদির জন্যও তো সময় দিতে হইবে। না, পাঁচটার মধ্যেই বোধহয় কাজ শেষ হইবে···

···দাদা এখন কী করিতেছে? হয়তো গরাদ ধরিয়া অন্ধকার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিয়া চলিয়াছে। আমার কথাও কি একবার ভাবিবে? দাদা কখনই আমাকে ভুল বুঝিতে পারে না। এ সম্বন্ধে দাদার সহিত পরিষ্কার কথাবার্তা যদি বলিতে পারিতাম। বুঝি যে, দাদার কাছে আমার আচরণ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার দরকার হইবে না; কিন্তু বোধ হয় ইহাতে মনের ভার কিছু লাঘব হইত। তাহার পার্টির প্রোগ্রাম কার্যকরী করার অর্থই পরোক্ষে ফ্যাসিস্ত্ শক্তিকে দৃঢ় করা—ইহা কি দাদা বুঝে নাই? কিন্তু সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর

কোথায় যেন খচ্‌খচ্‌ করিয়া কি একটা বিঁধিতেছে। বোধহয় যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতার অহেতুক অনুতাপ। আমার নিজের পার্টির স্থানীয় শাখার মেম্বরদেরও মত যে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া আমার ঠিক হয় নাই; দাদার বিরুদ্ধে বলিয়া নয়;—তাহাদের মত যে আমাদের কর্তব্য দেশের লোককে তাহাদের ভ্রম চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া, তাহাদের বুঝানো। তাহাদের পুলিশে ধরাইয়া দেওয়া নাকি আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নয়। পৃথিবীর আর সকলে যে যাহা ইচ্ছা মনে করুক; কিন্তু আমার পার্টির লোকের আমার কার্য সম্বন্ধে এই মত—ইহাই unkindest cut of all। মার্ক্সবাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়তো আমি ঠিক বুঝি না। যতদিন দাদাদের দলে ছিলাম দাদারই হুকুম তামিল করিয়া আসিয়াছি। উহার কথাই বেদবাক্য বলিয়া মনে করিয়াছি। ১৯৪২এর ফেব্রুয়ারিতে দাদা হাজারীবাগ জেল হইতে ছাড়া পায়। সিকিউরিটি বন্দীদের কেসএর scrutiny হইতেছিল। একজন হাইকোর্ট জজের উপর ছিল এই কার্যের ভার; কী যেন নাম—মারহাট্টী—জাস্টিস্ ভাটে। দাদা ছাড়া পাইবার পর, এপ্রিলে আমাদের দেউলী হইতে হাজারীবাগ জেলে লইয়া আসে। শুনিলাম সকলকে নিজের প্রদেশে লইয়া যাওয়া হইবে। তাহার পর আমাকে ছাড়িয়া দেয় ১৮ই জুন। ফ্যাসিস্ত্ বিরোধী দলদের আর জেলে রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই তখন ছিল সরকারের মনোভাব।···জেল হইতে বাহির হইবার সময় অত আনন্দ আর কোনোবার হয় নাই। সর্বহারার জাতশত্রু ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারিব, প্রয়োজন হইলে, ইহার জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিব—এই সুযোগ দানের জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। স্পেনের কর্মীদের কাহিনী, লালচীনের মরণজয়ী বীরদের কাহিনী, মাওসেটুংএর শৌর্য ও একনিষ্ঠতা, চন্দ্রদেওএর ক্লাসের প্রতিদিনের ভাষণ, শরীরের সকল স্নায়ুতে উৎসাহের আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। আমার জেলার কত কাজ আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে;—সেখানে লোকে মহাত্মাজী আর মাস্টার সাহেব ছাড়া আর কাহাকেও জানে না। অন্ধ বিশ্বাসের এই অকর্ষিত ভূমিতে আমাকে যে যুক্তির ফসল ফলাইতে হইবে। আশ্রমে

ফিরিয়া একবার মা'র সহিত সাক্ষাৎ না করিলেও নয়—আমার অপারেশনের জন্য নিশ্চয়ই খুব চিন্তিতা ছিলেন। একবার সেখানে সকলের সহিত দেখা-শুনা করিয়া লইয়া তাহার পর কাজ আরম্ভ করা যাইবে। মোটরবাস্, কোডার্মা স্টেশন, গয়া ওয়েটিংরুমএ কী মশা!—কিউল—সাহেবগঞ্জ, মণিহারীঘাট, কাটিহার—পথের আর শেষ নাই।...

সেই ব্যাকুলতা আজ আমাকে বর্তমান স্থিতিতে আনিয়াছে।...দাদা... জনমত আর সর্বাপেক্ষা দুঃসহ, আমার পার্টির স্থানীয় কমরেডদের মত। ভুল! পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ভুল হইতে পারে, আমার ভুল হয় নাই। সেই ১৯৪২-এর আগস্টের ঘটনাসমূহের পরিবেশে আমার কার্যের বিচার করিতে হইবে।...এক বৈদ্যুতিকশক্তি সহসা দেশসুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে। যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মাইলের পর মাইল রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়াছে—লোহার রেল লাইন, ভারী ভারী রেলওয়ে স্লিপার, আরও কত জিনিস, দূরের নদীতে গিয়া ফেলিয়া আসিতেছে। টেলিগ্রাফের তার কাটা, পোস্ট অফিস ও মদের দোকান জ্বালানোর ভার গ্রামের বালকদের উপর। বয়স্ক লোকে ঐ সব তুচ্ছ কাজ করিয়া নিজেদের হাত গন্ধ করিতে চায় না। তার কাটা এত সহজ, টেলিগ্রাফের তার এত ভঙ্গপ্রবণ তাহা জানা ছিল না। প্লায়ার্স, যন্ত্রপাতি, কাঁচি, কাটারি, কোনো জিনিসের দরকার নাই। দড়ি ঝুলাইয়া ছেলেরা ঝুলিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে। বড়রা চায় নূতন কার্যক্রম। আর কী করিতে হইবে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। রেলস্টেশন, খাসমহল কাছারি, সবরেজিস্ট্রী অফিস ও থানার পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। হাতে কিছুই কাজ নাই। যেখানেই তাহারা দল বাঁধিয়া যাইতেছে সেখানেই তাহাদের সম্মুখে শক্তির স্তম্ভগুলি ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে ও অত্যাচারের প্রতীকগুলি মাথা নত করিয়া লইতেছে। সরকারী কর্মচারীরা জনতার খোশামোদ করে, মাড়োয়ারী অকাতরে চাঁদা দেয়, জমিদার কাছারির নায়েব তাহাদের এক বছর খাজনা মাফ করিয়া দিবার আশ্বাস দেয়, খাসমহল কাছারির ম্যানেজার তাহাদের

ভোজের আয়োজন করিয়া দেন, দারোগা সাহেব গান্ধীটুপী মাথায় দিয়া, ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে লইয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন, চৌকিদার তাহার উর্দি জ্বালাইয়া কাজে ইস্তফা দেয়। গরীব কিষাণের আনন্দ, আর তাহাকে জমিদারের খাজনা দিতে হইবে না, চৌকিদারি ট্যাক্স্ দিতে হইবে না। নূতন কিছু করিবার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে না।...ফরবিশগঞ্জ লাইনের যে অংশের লাইন ঠিক ছিল, সেই অংশের উপর এন্‌জিন ড্রাইভার ও গার্ড জনতার হুকুম মতো গাড়ি চালাইতেছে। প্রতি স্টেশনে টিকিট ঘরের সম্মুখে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, টিকিট করিয়া ভ্রমণ নিষিদ্ধ। গড়বনেলী স্কুলের কয়েকটি ছাত্র অনবরত চীৎকার করিতেছে "গাড়ি কিসকী?—হমারী।" "স্টেশন কিসকী?—হমারী।" "এঞ্জিন কিসকী?—হমারী।" আর একদল লোক ট্রেনে টিকিট চেকারের কাজ করিতেছে—যাহার কাছে টিকিট থাকিবে তাহাকে গাড়ি হইতে নামাইয়া দেওয়া হইবে। একজন যাত্রীর নিকট হইতে উইক এণ্ড রিটার্নের অর্ধেক টিকিট বাহির হইল। "উতর যাও, আভি উৎরো। তুম স্বরাজ নহী চাহতে হো।" সে কাকুতি-মিনতি করে। বলে এটি পুরানো টিকিট। কে তাহার কথা শোনে। চেন্ টানিয়া গাড়ি থামাইয়া তাহাকে নামানো হইল। খানিক দূর গিয়া মাঝ রাস্তায় আবার ট্রেন থামে। তেওয়ারীজী ঐ দিকে মিটিং করিতে কোথায় যেন গিয়াছিলেন। ঘণ্টা দুই ঐ স্থানে অপেক্ষা করিবার পর, দূরে কংগ্রেস পতাকা সম্বলিত তেওয়ারীজীর গরুর গাড়ি দেখা গেল। তেওয়ারীজী আসিয়া গাড়িতে চড়িলেন। "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল। গাড়ি ছাড়িল।—স্টেশনে স্টেশনে চেয়ার, টেবিল, ঘড়ি, Station master's office লেখা সাইনবোর্ড, বড় বড় খাতা বই, একত্র জড় করিয়া জ্বালানো হইতেছি। রেলকর্মচারীগণেরও ইহাদের সহিত সহানুভূতি লক্ষ্য করিতেছি। কোথাও বাধা দিবার চেষ্টা নাই, অনেক স্থানে স্বেচ্ছায় সাহায্য করিতেছে। একজন ছাত্র প্লাটফর্মের একটি আলো লইয়া 'রায়বেশে' নৃত্যের ভঙ্গীতে সকলের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে। কসবা স্টেশনে স্কুল কলেজের ছাত্ররা টিকিট চেকার বাচ্চীসিংকে চাঁদা করিয়া প্রহার দিয়া বহুদিন সঞ্চিত আক্রোশ মিটাইয়াছে।...

…চুকরী থানায় "মহাত্মাজীকা ইজলাস" বসিয়াছে। আর কেহ সরকারী এজলাসে যাইবে না। দারোগাবাবুকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাঁহাকে "কৌমী (জাতীয়) জেল"এ লইয়া যাওয়া হইবে। দারোগা-বাবুকে 'দ্বিতীয় ডিভিসন' কয়েদী করা হইল। "পুরী খিলানা রোজ; আওর দেখনা উনকী স্ত্রী যাঁহা যানে চাহেঁ ওঁহা পঁহুচা দেনা, বহুৎ হিফাজৎসে।" জেল খুলিয়া কয়েদী পালাইতেছে। জেলখানার উপর কংগ্রেস পতাকা। সরকারী ট্রেজারীর নোটগুলি জ্বালানো হইতেছে। পশ্চিমে গোরখপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে পূর্ণিয়া পর্যন্ত সর্বত্রই দেশের এই অবস্থা। সম্পূর্ণ অরাজকতা—ফ্যাসিস্টদের রাজত্ব—জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয়—অসংহত, বিশৃঙ্খল, অদূরদর্শী—অথচ দুর্লভ নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমায় মহীয়ান। লাল পাগড়ি কাল মুখ, হেলমেট পরা লাল মুখ, বন্দুক, টমিগান, কিছুই জনতাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না।…দূরে বীরগাঁও স্টেশনের হাটে টমিগানের শব্দ হইতেছে—এদিকে ভুট্টার ক্ষেতে তাহার নকল করিয়া ছেলেরা স্টেশনের 'ফগ সিগনাল'গুলি ফুটাইতেছে। কেন করিতেছে তাহারা জানে না। হোলির দিন গ্রামসুদ্ধ লোক নেশা করিয়া যেইরূপ হইয়া যায় ইহারাও ঠিক সেইরূপ। এই অধীর উত্তেজনাকেই দাদার দল বলে বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সাল,—ইহাই নাকি 'ক্রান্তির প্রচেষ্টা'। বীরগাঁওয়ের ক্রান্তিপ্রচেষ্টার নেতা কে? বিনায়ক মিসির। সে সর্বঘটে আছে। আশ-পাশের গ্রামে "সত্যদেবকে কথা" শোনায়, 'ছট পরবের' পৌরোহিত্য করে, হিন্দু মিশনের লেকচার দেয়, খ্রীষ্টান সাঁওতালদের 'শুদ্ধি' করে, কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় মন্ত্রীর টুরএ মোটরে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বসে। সে হাত গুণিয়া, বিবাহের দিন দেখিয়া, ঠিকুজি তৈয়ার করিয়া, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী ও টোটকা ঔষধ দিয়া বেশ পয়সা রোজগার করে। একখানি মোটা হিন্দী বই তাহার পুঁজি। ইহাতে ধাঁধার উত্তর হইতে টোটকা ঔষধ পর্যন্ত সব আছে। ধাঙ্গড় বস্তিতে কালীপূজার মন্ত্র পড়িবার সময়, এই পুস্তক হইতে হিন্দীতে রামায়ণের গল্প পড়িয়া দেয়। এইরূপ ধরনের নেতৃত্বে, এই-রূপ সংগঠনে, এইরূপ সময়ে, হইবে 'ক্রান্তি'? কে একথা দাদাদের বুঝাইত? আমি কিছুতেই অন্যায় করি নাই। আমার কর্তব্য করিয়াছি মাত্র। আর

আমি সাক্ষ্য না দিলেও, অন্য লোক দিত। গভর্ণমেণ্টের লোকের অভাব নাই। তফাতের মধ্যে আমি দিয়াছি নিজের রাজনীতিক সিদ্ধান্তের জন্য ও কর্তব্যের খাতিরে; আর অন্য লোক দিত, লোভে পড়িয়া। দাদার সহিত যদি এবিষয়ে প্রাণখোলা আলোচনা করিতে পারিতাম! না, উহা নিরর্থক হইত। আমি কত কিছু বলিয়া যাইতাম; আর দাদা নীরবে ধৈর্যের সহিত তাহা শুনিয়া মধ্যে মধ্যে অল্প হাসিত। হয়তো বা এক আধটি এমন কথা বলিত, যাহাতে আমার যুক্তিস্রোত ঘোলাটে হইয়া যাইত। ঐ মৃদু হাসিতে বাঁ গালে টোল পড়িলেই, আমি বুঝিতে পারি যে আমার আপাততীক্ষ্ণ যুক্তি, উহার দৃঢ় বিচার শক্তির উপর সামান্য দাগও কাটিতে পারে নাই। হাসিটি আমাকে পরাস্ত করিবার জন্য নয়; উহা কেবল আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য। দুই একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আমার যুক্তির সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

গত সপ্তাহে যখন দাদার সহিত দেখা করিতে আসি তখন এ প্রশ্ন দাদাকে জিজ্ঞাসা করি নাই;—যুক্তিতে পরাজিত হইবার ভয়ে নয়, সঙ্কোচে। উহা কি অপরাধীর মনের সঙ্কোচ? না, আমি কোনো অপরাধই করি নাই। তবে অপরাধজনিত সঙ্কোচ আমার মনে আসিবে কেমন করিয়া? ঐ সকল কথা উত্থাপন করা সুশোভন হইত না—সঙ্কোচ তাহারই জন্য। অন্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় যাহাকে আঙিনায় তুলসীতলায় লইয়া আসা হইয়াছে তাহার কাছে কি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে উইলখানি কোথায় রাখিয়া গিয়াছেন। না, দাদাকে বুঝাইবার দরকার নাই। সে আমার স্থিতি ঠিকই বুঝিয়াছে।

একজন খাকীর হাফপ্যাণ্ট পরিহিত অল্পবয়সী অফিসার গেটের ভিতর ঢুকিলেন। বোধহয় অ্যাসিস্টেণ্ট জেলর রাত্রের রাউণ্ডে যাইতেছেন।

...গত সপ্তাহে দাদার সহিত দেখা করিতে হইয়াছিল তাহার সেলে—সঙ্গে সি. আই. ডি. ভদ্রলোক। একজন ওয়ার্ডার পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। উহাদের সম্মুখে আর কি বেশী কথা হইবে? আমার হাতে রুমালে বাঁধা কিছু ফল ছিল। ভিতরে যাইবার সময় সি. আই. ডি. ঠাট্টা করিয়া বলে, "দেখবেন মশাই, ওর মধ্যে কোনো গোলমেলে জিনিস নেই

তো? শেষে মশাই চাকরিটা খাবেন না যেন। এদেশে বাঙ্গালীর চাকরি আজকাল কী ব্যাপার জানেনই তো? সাধে কি এ ডিপার্টমেণ্টে এসেছি!" তাহাকে রুমালটি খুলিয়া দেখাইতে গেলে বলে, "থাক থাক, ও আমি এমনিই বললাম। আপনিও যেমন। আমরা লোক চিনি মশাই।" সি. আই. ডি.ও আমাকে বিশ্বাস করে। এত বড় সার্টিফিকেট একজন রাজনীতিক কর্মীর আর কী হইতে পারে! এতটার জন্য তৈয়ারী ছিলাম না। দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার পর হইতেই ইহাদের আমার উপর সন্দেহ চলিয়া গিয়াছে।... দাদা সেলে গরাদের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। রুক্ষ কেশ; বেশ রোগা হইয়া গিয়াছে; নাকটি খাঁড়ার মতো উঁচু হইয়া আছে; গায়ের রং যেন পূর্বাপেক্ষা ফর্সা লাগিতেছে; হাতে পায়ে খোস পাঁচড়ার দাগ। তাহার হাসি হাসি মুখ, ঔৎসুক্যভরা কোমল দৃষ্টি, আমাকে কুণ্ঠা করিবার অবকাশ দেয় না। প্রথমে নিজেই বলে, "রুমালে কিরে?" প্রথম আরম্ভ করার সঙ্কোচ কাটিয়া যায়।... "জ্যাঠাইমা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" "তাই নাকি? জ্যাঠাইমারা কেমন আছেন? কিছু বলে দিয়েছেন নাকি?" প্রথমে ভাবিলাম সত্য কথা বলি যে জ্যাঠাইমা তো নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। না, আবার এখন কেন দাদার স্নেহাতুর মনকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলি। বলিলাম, "আছেন একরকম, তোমার কথা প্রায়ই বলেন।" মুখ দেখিয়া মনে হয়, দাদা আমার সত্য চাপা দিবার চেষ্টা ধরিয়া ফেলিয়াছে। সি. আই. ডি. বলে, "দরজা খুলে দিক। ভিতরে গিয়ে বসুন না কেন?" বলি "থাক্ থাক্" কিন্তু ওয়ার্ডার দরজা খুলিয়া দেয়। ভিতরে গিয়া দাদার কম্বলের উপর বসিলাম। ...সেদিন কোন প্রশ্ন নিজে করিতে পারি নাই। কেমন যেন কথা হারাইয়া যাইতেছিল। দাদা বোধহয় আমার মনের অবস্থা বুঝিয়াছিল। সে নিজেই কত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল। আমি উত্তর দিয়া গেলাম। আসিবার সময় দাদা বলিয়াছিল, "মা'র সঙ্গে দেখা করিস।" আমার সহিত দাদার ইহাই শেষ কথা। তাহার এই শেষ কথা, তাহার এই শেষ অনুরোধও আমি রাখিতে পারি নাই। মা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে কী বলিবেন, একথা ভাবিয়াই শিহরিয়া উঠিয়াছি। দাদা আমার মনের কথা এত বোঝে আর এটা বুঝিতে পারিল না যে এখন মা'র সহিত

দেখা করা কী করিয়া আমার পক্ষে সম্ভব! সে জানে আমার কী ভালো লাগে না লাগে। দাদাকে আমি একবার একটি মনের মতো কবিতা লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। আমি বড় বড় কবির উচ্ছ্বাসের কাঁদুনী সুর বুঝিতে পারি না। তাই দাদা আমার বুঝার মতো করিয়া কবিতা লিখিয়া দিয়াছিল।

চাই আমি সকলের পূর্ণ অধিকার,
তাহার অল্পেতে তুষ্ট কখন হব না,
পরপুষ্ট ধনিকের উপেক্ষা স'ব না;
শ্রমিকের পেষণের কবে প্রতিকার
হবে, আছি সেই দিন পানে চাহি।
আছে মোর নিশ্চয় বিশ্বাস,
যন্ত্রপিষ্ট শ্রমিকের হতাশ নিশ্বাস
আনিবে প্রলয়। আর অন্য পথ নাহি।
উদিবে নূতন সূর্য; ক্ষুধা ক্লিষ্ট মুখে দেখা দিবে
হাসিরেখা। না থাকুক বিত্ত করিও অতুল অগাধ,
সাম্যরাজ্যে কর্ম চিন্তা স্বাধীন অবাধ।

আর মনে পড়িতেছে না। সমগ্র কবিতাটিই আমার মুখস্থ ছিল। দুই বৎসরের মধ্যে আমার কত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমি দাদার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য আমার অচেতন মনও বোধহয়, আমার স্মৃতিপট হইতে এই কবিতাটি মুছিয়া ফেলিতে সাহায্য করিয়াছে। কবিতাটি আশ্রমে মা'র ঘরের বারান্দায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম। এখনও আছে কিনা কে জানে। এতদিন সেকথা একবারও মনে পড়ে নাই। একবার গিয়া নিশ্চয়ই খুঁজিয়া দেখিব।

"জগে হুয়ে হঁ্যায় কেয়া, বাবুজী?"

দেখি সুবেদার সাহেব কোয়ার্টার হইতে ফিরিতেছে। মুখ চোখ দেখিয়া মনে হয় কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া লইয়াছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসি।

"বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে, আরাম কিজিয়ে, বাবুজী।" কাহারও সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সুবেদার সাহেব গেটের ভিতর ঢুকিল। অফিসঘরের দিকে যাইতেছে। বোধহয় সন্ধ্যার সময়ের পাতা বিছানাটি

উঠাইতেছে।······দাদা এখন কী করিতেছে? বোধহয় চিঠি লিখিতেছে। দাদা নিশ্চয়ই খানকয়েক চিঠি লিখিয়া যাইবে। নেহাল সিংকে খাতা পেন্সিলের জন্য যে পয়সা দিয়াছিলাম, তাহা দিয়া সে দাদাকে ঐ সকল জিনিস কিনিয়া দিয়াছিল কিনা কে জানে। দিলেও ওগুলি সেলের মধ্যে রাখা শক্ত—নিশ্চয়ই প্রত্যহ সার্চ হয়। লিখিবার সুবিধা থাকিলেও, দাদা আর সকলের ন্যায় হয়তো চিঠি লিখিয়া যাইবে না। আশ্চর্য উহার মন! ও যে কোন্ কাজকে অশোভন ও দৃষ্টিকটু মনে করে, আমি তাহার ধারণাও করিতে পারি না।···মেরী আণ্টয়নেটের শুনিয়াছি, মৃত্যুদণ্ডের পূর্বরাত্রে সব চুল পাকিয়া গিয়াছিল। দাদার পাকা চুল কল্পনাও করিতে পারি না। সে হয়তো দিব্যি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে! সার ওয়াল্টার র‍্যালে যূপকাষ্ঠে মাথা নত করিবার পূর্বে জল্লাদকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখো ভাই আমার বড় সখের দাড়িটিকে কেটে ফেলো না যেন।" পূর্বে ইহাকে অতিরঞ্জন মনে হইত। দাদার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, ইহাকে আর অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। কত রাজবন্দীর ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিবার পূর্বে কত রকম আচরণের কথা শুনিয়াছি। কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কেহ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গালি দিয়াছে, কেহ ভগবানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে, কেহ ভগবানের নাম লইয়াছে, কেহ ভাষণ দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছে; কেহবা "শির ফরোশী কা তমন্না" (মস্তকদানের আবেদন) গান গাহিতে গাহিতে নির্বিকারভাবে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া কাষ্ঠ পাটাতনটির উপর দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দাদা নিশ্চয়ই বলিবে যে এসবগুলিই অল্পবিস্তর নাটকীয়। দাদা এসব কিছু করিবে না। উহার ওষ্ঠকোণে লাগিয়া থাকিবে অবজ্ঞাভরা হাসি। সে তাচ্ছিল্যের সম্মুখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের চক্ষু নত হইয়া যাইবে, ম্যাজিস্ট্রেট অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবেন, জেলর সাহেব অকারণে টর্চ জ্বালিয়া মণিবন্ধের ঘড়িটি দেখিবেন; যে নির্বিকার কয়েদী কিছু 'রেমিসন' ও পাঁচটি টাকার জন্য ঘাতকের ঘৃণ্য কাজ করিতেছে, তাহারও হৃদ্‌স্পন্দন কিছু দ্রুত হইয়া যাইবে। দাদার অন্যরূপ আচরণই আমার নিকট অপ্রত্যাশিত।······

খট্ খট্ খট্! গেটের দোতলা হইতে কে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছে।

—বলদৃপ্ত গর্বান্ধ ব্যক্তির পৌরুষব্যঞ্জক পদধ্বনি—ধরণী তুমি বুঝিয়া লও, এই স্থানটুকুর মধ্যে আর কাহারও ক্ষমতা বা আদেশ চলিবে না—এখানে আমিই সর্বেসর্বা—এই ভাব।···বহুক্ষণ হইতে এই ধ্বনিটিরই অপেক্ষা করিতেছিলাম। খাকীর জেলপোশাক পরিহিত একজন বলিষ্ঠ ভদ্রলোক নামিয়া আসিলেন গেটের সান্ত্রী মেঝেতে জুতা ঠুকিয়া, স্যালুট করিল, তাহার পর সোজা হইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইল। ভিতরের ওয়ার্ডার সেলাম করিয়া গেটের দরজা খুলিল। সুবেদার সাহেব গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। কালোতে-সাদাতে মেশানো সম্মুখের দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হাসিতে, জ্ঞাতসারে খোশামোদের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস বেশ বুঝা যাইতেছে। সুবেদার সেলাম করিলে, জেলর সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "সব ঠিক তো?"

সুবেদার সাহেব বলে, "হ্যাঁ,—হুজুর"—যেন সারারাত্রি এই সকল ব্যবস্থা করিতে করিতে সে হিমশিম খাইয়া গিয়াছে।

জেলর সাহেবের দৃষ্টি পড়ে ট্রলি লাইনের পাশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গোবরের উপর। পা ঘুরাইয়া নিজের জুতার তলা দেখেন—মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। সুবেদারও ভয়মিশ্রিত চক্ষে ঐ জুতার দিকেই দেখিতেছে। যাক্, জুতার তলায় গোবর লাগে নাই,—সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

জেলর সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "এ গোবর পরিষ্কার করান নি কেন?"

"হুজুর কোনো কয়েদী পাওয়া গেল না।"

"কেন, গরু তো লকআপএর পর, গেট দিয়ে পাস করে নি।"

আর বেশী কিছু বলিতে হয় না। ভিতরের ওয়ার্ডার নিজেই এই কাজে লাগিয়া যায়। সুবেদার সাহেবের দিন আজ ভালো যাইবে না,—ভোর না হইতেই এই কাণ্ড। জেলর সাহেব ভিতরের দরজা খুলাইয়া জেলের ভিতর প্রবেশ করেন।

বলিয়া গেলেন—"দেখি, আবার ভিতরের ব্যবস্থা কেমন। আপনাদের উপর কোনো দায়িত্ব দিয়ে তো নিশ্চিন্দি হওয়ার উপায় নেই। সাহেবের ঘর, আর আমার অফিসঘর ঠিক থাকে যেন।"

"হ্যাঁ হুজুর, সে আর বলতে হবে না। সব ঠিক করে রেখেছি।"

সুবেদার সাহেব ওয়ার্ডারকে বলে, "পেঁচার মতো মুখ করে কী দেখছো? যাও, দেখ সাহেবের কামরা পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা। এই সব নতুন নতুন 'বাহালী'[১] দের নিয়ে কাজ চালানো শক্ত। কংগ্রেস আন্দোলনের জন্যে যত সব গাড়োয়ান আর 'হরবাহা'[২] 'চরবাহা'[৩] সব ভর্তি হয়েছে। না বোঝে একটা কথা, না বোঝে নিজের কাজ। একেবারে দিকদারী ধরে গেল।"

ছোট হইতে বড় পর্যন্ত সকলেই অধস্তন কর্মচারীর সহিত একই রূপ ব্যবহার করে।...

চারিটার ঘণ্টা পড়ে। আবার ওয়ার্ডারদের নূতন দল আসে। এক দলে থাকে বাইশ জন। একই দৃশ্যের পুনরাভিনয়—সব যেন এক রাত্রের মধ্যে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। যেন রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম—কতলোক গাড়ি হইতে নামিল—কিছু লোক উঠিল—কোলাহল, বিশৃঙ্খলা—আবার যেমন কে তেমন।...দাদা কি সেলের গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া চরমক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে? এখন যে চারিটার ঘণ্টা পড়িল তাহা কি দাদা শুনিতে পাইয়াছে? গেটের উপরের শব্দতরঙ্গ বায়ুমণ্ডলের ভিতর কম্পন সৃষ্টি করিয়া কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেল্‌স্‌এ পৌঁছিতেছে, আমার চিন্তাতরঙ্গ কি পৌঁছিতে পারে না? দাদা শেষ মুহূর্তে কাহার কথা ভাবিবে—মা'র, জ্যাঠাইমার, না আমার? আমার কথা ভাবিবে কেন? নিশ্চয় ভাবিবে। চিন্তা ভরা থাকিবে গ্লানিতে, বিষাদে, আমার উপর অভিমানে। উহা যুক্তিতর্কের বহু উপরের জিনিস।... ইহার পর আমার আর পূর্ণিয়ায় থাকা অসম্ভব। জ্যাঠাইমাকে মুখ দেখাইব কী করিয়া? পাড়ার লোকদের সম্মুখে যাইব কী করিয়া? সাক্ষ্য দিবার পর হইতে এতদিন এ অবস্থা কতকটা সহিয়া গিয়াছে; কিন্তু মা'র সম্মুখে যাওয়া—সে তো অসম্ভব। দাদার অন্তিম দিনের এই ছবি অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক নয়। গত কয়মাস হইতেই এই দিনের জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়াছি। সময়ে অসময়ে এই চিত্র মনকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে!..."পাকুড় মার্ডার কেস্‌" এর খবর প্রত্যহ কাগজে পড়িয়া আমি আর দাদা মাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। মা বলেন, "মাগো, ভায়ে ভায়ে এমন হয় নাকি?"—আর আজ! এতদিন জন-মতকে উপেক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এখন মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কেন? জন-

১। নিযুক্ত লোক। ২। চাষা (হলবাহক)। ৩। রাখাল।

মতকে তাচ্ছিল্য করা চলে, কিন্তু মা'র অব্যক্তবেদনাভরা দৃষ্টিকে, জ্যাঠাইমার নীরব ভর্ৎসনাকে উপেক্ষা করা চলে না। কেন চলিবে না? Sentimental nonsense…! আমার সম্মুখে বেদনাজর্জর সমাজের অগণিত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সমাজের যুগযুগসঞ্চিত অশ্রু মুছানোর ভার যাহার উপর ন্যস্ত, তাহার কি সংকীর্ণ গৃহকোণের দু-চার বিন্দু তপ্ত অশ্রুর কথা মনে করিলে চলে! খদ্দরের শাড়ির অঞ্চল দিয়াই ও কয়েক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া যাইবে। জীর্ণ কন্থা ও মলিন উপাধান ঐ সামান্য কয়েকবিন্দু অশ্রুকে তপ্তবালুর ন্যায় শুষিয়া লইবে। আমার কি ইহার জন্য পড়িয়া থাকিলে চলে? এখনও আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎ লইয়াই চিন্তিত। আমার কী হইবে, তাহারই গুরুত্ব আমার কাছে বেশী, দাদার কী হইতেছে তাহার নয়।

…কানাইলালের মৃতদেহের ফটোর মুখটি মনে পড়িতেছে। দাদাকেও কি ঐরূপ লোহার স্ট্রেচারে শোয়াইয়া দিবে? চোখ দুইটি অর্ধনিমীলিত—অন্তিম শ্বাসগ্রহণের প্রাণপণ চেষ্টায় মুখটি বীভৎস হইয়া উঠে নাই—অক্ষিগোলক দুইটি কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে নাই—শান্ত নিদ্রার ভাব—কেবল গলাটি ফোলা—রক্ত জমিয়া নীল দাগ হইয়া গিয়াছে।…

জেলডাক্তার অঘোরবাবু জেলগেটে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক দ্রুত আসিবার চেষ্টায় পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। কোনো দিকে তাকাইবার অবকাশ তাঁহার নাই। জেলে বোধহয় পাঁচ ছয়জন ডাক্তার আছেন—কিন্তু জেলের বড় ডাক্তার সিভিল সার্জেন থাকেন শহরে। তাঁহার এখানে কোয়ার্টার নাই, যদিও যুদ্ধের পূর্বে সিভিল সার্জেনই জেলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতেন। অঘোরবাবু আবার কেন আসিলেন? সুবেদার জিজ্ঞাসা করে, "ডাক্তার সাহেব আপনি আবার কেন?"

"এই এমনিই এলাম।"

সুবেদার সাহেব নিজেও ব্যাপারটা বোঝে। আজ সকলেরই ইচ্ছা সাহেবের কাছে নিজের কর্তব্যপরায়ণতা দেখানো। অঘোরবাবুর সহিত আমার পরিচয় আছে। ভাগ্যে আমার দিকে তাঁহার নজর পড়ে নাই—আবার কী না কী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতেন।…তিনি অফিস ঘরে ঢুকিলেন। জেলর সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘরের আলো জ্বলিল—ফ্যান

ঘুরিতেছে। হাফপ্যাণ্ট ও সাদা হাফশার্ট পরিহিত স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া পৌছিলেন,—সঙ্গে সাদা ও খয়েরী রং মিশ্রিত একটি বুলটেরিয়র। ওয়ার্ডারের মুখে সন্ত্রস্তভাব—স্তালুট—এটেনশন—কুকুরটি ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্বে একবার কী মনে করিয়া আমার কাছে ঘুরিয়া গেল। ভিতরের ওয়ার্ডার কুকুরের জন্য দরজাটি অর্ধোন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সাহেবের অপেক্ষা তাঁহার কুকুরের উপর জেলকর্মচারীদের আনুগত্য কম নয়—ইহা দেখাইতে সকলেই সচেষ্ট। জেলর সাহেব ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। অঘোরবাবুও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্থবেদার জেলর সাহেবের সম্মান রক্ষার জন্য একেবারে উহার গা ঘেঁসিয়া না দাঁড়াইয়া, একটু দূরে দাঁড়াইয়াছে। সাহেব হাসিয়া কী যেন গল্প করিতেছেন, আর অন্যমনস্ক ভাবে হাতের টর্চটি একবার জ্বালাইতেছেন, একবার নিভাইতেছেন। কুকুরটি একবার অফিসঘরে, একবার প্যাসেজে আসা যাওয়া করিতেছে—মশালগুলি শুঁকিতেছে—সাহেবের কাছে আসিয়া যেন একটা কী খবর জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেল।…নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া মোটর লরির শব্দ হইল—নিকটে আসিতেছে—ভোঁ ভোঁ—এত জোরেও মোটর হর্নের শব্দ হয়—দাদা, মা, বাবা, সকলেরই কানে হয়তো এই শব্দ পৌছিল। একখানি মোটর ভ্যান গেটের কিছু দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। এই বুঝি উহার দরজা খুলিয়া লাফাইয়া পড়ে, একের পর এক আর্মড্ পুলিস —এবাউট টার্ন—রাইটহুইল। না, কেহ তো নামিল না! সকলে বোধহয় গাড়ির মধ্যেই থাকিয়া গেল। ড্রাইভার গাড়ির আলো নিভাইল—রাস্তা ও কোয়ার্টারগুলি আবার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সাহেবের কুকুরটি ডাকিতেছে—কুকুরটি গেটের গরাদের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিল—দেখিতেছে তাহার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ ঘটাইল কিসে। আলোর ঝলক হঠাৎ ফুটিলই বা কেন, আবার নিভিয়াই বা গেল কেন, তাহারই অনুসন্ধানে সে বাহির হইয়াছে।…

রাষ্ট্রের সঞ্চালনচক্র চলিয়াছে, মন্থর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে—রাত্রিদিন। কবে, কতদিন পূর্বে কোন হতভাগ্য মূর্খ ইহার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার ব্যর্থ দুঃসাহস করিয়াছিল। যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি না হয়,

সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে দেশব্যাপী ছোট বড় অসংখ্য চক্র। এই ঘটনাকে ও উহার নায়ককে নিশ্চিহ্ন করিয়াই রাষ্ট্রের শান্তি বা স্বস্তি নাই। যে স্বপ্নবিলাস কতকগুলি অর্বাচীন হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছিল ভবিষ্যতে যেন তাহা ভয়ে আড়ষ্ট ও পঙ্গু হইয়া যায়—ইহাই তাহার কাম্য।···কোরহা থানা, বেঙ্কটেশ্বর দারোগা, ফৌজদার, সেসন্স কোর্ট, সরকারী উকীল, জজসাহেব, সরকারী সাক্ষী নীলু, জেলকর্মচারীগণ,—মালায় একের পর এক নানা রঙের পুঁথি গাঁথা হইয়া চলিয়াছে এক স্থির উদ্দেশ্য লইয়া। যে উদ্দেশ্যে ইহারা নিয়োজিত সেই চরম মুহূর্তের আর কতটুকুই বা দেরী?···কেবল ঘাতককে দায়ী করিলেই চলিবে কেন? এই বর্বরতার নৈতিক দায়িত্ব জজ হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়ার্ডার পর্যন্ত সকলেরই সমান।···এই বিশেষজ্ঞের যুগে, কেহই নিজের সীমিত ক্ষেত্রের বাহিরে তাকায় না। সে নিজে যন্ত্রের যে অংশের জন্য দায়ী, তাহা ভালোয় ভালোয় চলিয়া গেলেই হইল। বিরাট সঞ্চালন শক্তির উৎস কোথায় তাহাতে তাহার প্রয়োজন কী? এন্‌জিন্ হইতে বেলটিং দিয়া এই শক্তি অংশতঃ তাহার কাছে পৌছিলেই হইল। তাহার পর সে তাহার অর্ধপ্রস্তুত কাঁচামাল, তাহার পরের স্থানে পৌছাইয়া দিবে। এতদূর পর্যন্ত যত হাত ঘুরিয়া ব্যাপারটি আসিয়াছে, উহার সর্বত্রই রাষ্ট্রদানবের নগ্নতা ও বর্বরতা ঢাকিবার একটি প্রয়াস ছিল। কিন্তু এখন এমন স্থানে পৌছিয়াছে, যেখানে আর চক্ষুলজ্জার অবকাশ নাই। Crush or be crushed ;—জগন্নাথের রথ, নিজ গতির গর্বে চলিতেই থাকিবে। চাকার নীচে নিশির ডাকে আবিষ্ট কোনো হতভাগা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল কিনা তাহা জানিবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। শ্রেণীস্বার্থের স্টীমরোলার পথের উপর দিয়া অনবরত চালাইতে হইবে। বিরাম দিলেই আগাছা মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে।···আশ্রমে ঢুকিবার রাস্তাটি দাদার নিজের হাতে তৈয়ারী করা। দুই পাশে রজনীগন্ধার কেয়ারি। সময় পাইলেই নিড়ানি লইয়া দাদা রাস্তার উপরের ঘাস ও আগাছা তুলিতে বসিয়া যায়। একটি সাদা খদ্দরের গেঞ্জি।···

আর একখানা মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল। উর্দি পরা চাপরাসী দরজা খুলিয়া দেয়। হ্যাটকোট পরিহিত ভদ্রলোক মুখে চুরুট—

সিভিল সার্জন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দল তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে।

সিভিল সার্জন বলেন, "আমার দেরী হয়ে গেল নাকি? আমার জন্য অপেক্ষা করছেন না তো?"

"না না, এখনও ম্যাজিস্ট্রেট এসে পৌছান নি।" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রিস্টওয়াচ দেখেন। মুখে বিরক্তির ভাব। "আসুন, ঘরে বসা যাক।" চেয়ার টানিয়া লইবার শব্দ হইল। ঘরের ভিতর হইতে গল্পের মৃদু গুঞ্জন ভাসিয়া আসিতেছে। আবার মোটরহর্নের শব্দ হইল। একখানি গাড়ি আসিয়া দাঁড়ায়। হাফপ্যাণ্ট পরিহিত একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক, গাড়ি হইতে লাফাইয়া নামিলেন। তিনি দৌড়াইয়া জেলগেটে প্রবেশ করিতেছেন। জেলর সাহেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

"না না, আপনার দেরী হয় নি। আমরাই তাড়াতাড়ি এসেছি। ডাক্তার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও-ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। চলুন, ঘরে বসবেন।"

ঘরে আর যাইতে হইল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিভিল সার্জন সকলেই জেলের ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘরের বাহিরে আসেন। একে একে সকলে ভিতরে প্রবেশ করেন। দরজাটি অনুচ্চ—সকলেরই মাথা নত করিতে হইতেছে।...দিল্লী দরবারে এইরূপ একটি গেটের কথা শুনিয়াছিলাম। কোথাকার রাজা যেন ইহাকে অপমান মনে করিয়া আসেন নাই। যক্ষপুরীর অন্ধকার একে একে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দলের সকলকে গ্রাস করে।...এখন এখান হইতে পলাইয়া গেলে কেমন হয়! শবদেহের দিকে আমি তাকাইতে পারিব না। এখান হইতে পলাইয়া গেলে কেহ লক্ষ্যও করিবে না।...ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমটি জেলের লোকদের দেখাইতে হইবে। তাহা না হইলে তাহারা আমাকে শবদেহ দিবে কেন?... কোথায় গেল কাগজখানি। কোনো পকেটে তো নাই দেখিতেছি। কী হইল? বাড়িতে ফেলিয়া আসিলাম নাকি? তা হইলে তো এখনই যাইতে হয়। যাক ভালোই হইল। না পাইলেই ভালো হয়।...পরের ট্রেনে পাটনায় কিংবা বোম্বাইয়ে চলিয়া গেলে কেমন হয়? আমার দলের intellectual

কমরেডের সহিত সাক্ষাৎ করা বড়ই প্রয়োজন—না, এই তো কাগজখান পকেটে আছে···কাল নিজ হাতে এই পকেটে রাখিয়াছি, যাইবে কোথায় ? অথচ এখনই সব পকেট খুঁজিয়া দেখিয়াছিলাম···কোথাও পাই নাই।

সুবেদার সাহেবের মুখের দিকে দৃষ্টি যায়। সেও আমার দিকে তাকাইয়াছিল। সে চোখ ফিরাইয়া লয়। আর সে আমার দিকে তাকাইতে পারিতেছে না।

দূরে মনে হইতেছে দুই একজন করিয়া লোক জড়ো হইতেছে। আর্মড পুলিশের ভয়ে বোধহয় বেশী লোক আসে নাই। না হইলে এই স্থান এতক্ষণে লোকে-লোকারণ্য হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। একটি কোয়ার্টারের দরজা খুলিল। সকলেই বোধহয় শবদেহ দেখিতে উৎসুক।···দাদার গলায় একটি কালো তিল আছে ?···শীতকালে গেরুয়াধারী, পাঞ্জাবী জ্যোতিষীর দল প্রতি-বৎসর পূর্ণিয়াতে আসে, তাহাদেরই একজন সেবার আমাদের আশ্রমে আসিয়াছিল।···আসিয়া বিকৃত উচ্চারণে ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল—আমি 'ফারচুন টাইলর'। সে দাদার আপত্তি সত্ত্বেও তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিল যে আশি বছর দাদার পরমায়ু। সব ভণ্ড মিথ্যাবাদীর দল !···দাদা তাহার কথা শুনিয়া হাসিতেছে, আর বলিতেছে, "এটা কংগ্রেস অফিস। আমরা কিন্তু তোমার এই কষ্টস্বীকার করার জন্য পয়সা দিতে পারবো না।"

আচ্ছা, দাদা যদি ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলেও কি ইহারা সেই অবস্থাতেই ফাঁসিকাঠে ঝুলাইবে নাকি। তা কি হয় ?···

ফাঁসির রজ্জুটি লইয়া "মেট্" ও পাহারারা কাড়াকাড়ি করিতেছে। সেবারের জেলের কথা মনে পড়িতেছে···দাড়টাকে উহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার চেষ্টা করিতেছে। মসৃণ চর্বিমাখানো দড়ির উপর ভোঁতা লোহার পাতটি পিছলাইয়া যাইতেছে।···ভাগ্যবানেরা এক এক টুকরা পাইল।··· উহা দিয়া নাকি আশুফলপ্রদ বশীকরণ কবচ হয়

এইবার ভিতরের ফটক খুলিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন, জেলর, অঘোরবাবু, অ্যাসিস্টেণ্ট জেলর ;—ওয়ার্ডার, ওয়ার্ডার, ওয়ার্ডার, কুকুর, ওয়ার্ডার, ওয়ার্ডার—

সকলেই যেন জোর করিয়া মুখে হাসির ভাব আনিতে সচেষ্ট। দেখাইতে চায় যে এই সামান্য ঘটনায় সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাতে তাহাদের চা খাইবার অল্প দেরি হইয়া গেল মাত্র। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিভিল সার্জন আর ম্যাজিস্ট্রেটকে, নিজের বাংলোয় চা খাইতে অনুরোধ করেন। গেট খোলা হয়। কুকুরটি আগে আগে পথ দেখাইয়া চলে। মোটরকার দুইখানি তাঁহাদের পিছনে পিছনে বাংলোর ধারে গিয়া দাঁড়ায়। লরির ড্রাইভার তৈয়ারী হইয়া স্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসে। ওয়ার্ডার ভিতরের দরজা এখনও একটু ফাঁক করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।...এই বুঝি আসিয়া পড়ে—এই মুহূর্তে...

"আরে, নীলুবাবু যে, নমস্কার! এত ভোরে এদিকে কোথায়? ইনটারভিউএর তদ্বিরে বুঝি? সি. আই. ডি. তো আটটার আগে আসে না। আসুন আমার বাড়িতে। ততক্ষণ চা-টা একটু খেয়ে নেওয়া যাক, কী বলেন?"

অঘোরবাবু আমাকে উত্তর দিবার সুযোগ দেন না। অতি কষ্টে কোনো রকমে বলি, "না ইনটারভিউএ আসি নি।—এসেছিলাম—আজ দাদার—ইয়ে..." আর কথা বাহির হয় না। ঠোঁট কাঁপিতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না; কে যেন দৃঢ় হস্তে গলাটি চাপিয়া ধরিয়াছে। আমার চোখেও জল আসিয়া গেল। অন্য দিকে তাকাইয়া কোন রকমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চিঠিখানি তাঁহাকে দিই। অঘোরবাবু চিঠি পড়িতেছেন। চোখের জল মুছিয়া ফেলি।

"আরে, তাই বলুন! কেন, আপনারা শোনেন নি?" তিনি আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছেন।

"গভর্নমেণ্টের চিঠি এসেছে যে; ফাঁসির অর্ডার তো এখন মুলতবী থাকবে।" অ্যাঁ কি বলে! অঘোরবাবু পাগল হইয়া গিয়াছেন নাকি! তাঁহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরি। তিনি বলিয়া চলিয়াছেন—

"মিলিটারি এলাকা ছাড়া ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আগস্ট আন্দোলনের সময় 'স্যাবটেজ'এর জন্য যাদের উপর ফাঁসির হুকুম হয়েছে, তাদের ফাঁসি অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ফাঁসি এই

অর্ডারের আগেই অন্য জায়গায় হয়ে গিয়েছে। যাদের উপর মার্ডার চার্জ ছিল তারা অবিশ্যি অর্ডারের মধ্যে পড়ে না।…আজ ফাঁসি ছিল একজন সাধারণ কয়েদীর। সে থাকত তিন নম্বর সেলে। পরশু অর্ডার এসেছে। আপনার দাদাকে আর এক নম্বর সেল থেকে সরানো হয় নি। সাহেব বললে, কী দরকার মিছে হাঙ্গামা বাড়িয়ে। সেই জন্যই misunderstanding হয়েছে। আর ফাঁসির তারিখ তো আগে থেকে জেলের কয়েদীদের বলার নিয়ম না। আন্দাজেই জেলের লোকে যেটুকু ঠিক করে নিতে পারে। সেইজন্যই আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।"…

আমার কথা বলিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। সব শান্ত। ধমনীতে রক্তপ্রবাহও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।—গাছের পাতার স্পন্দনটি পর্যন্ত নাই। গ্রহগুলি গতি ভুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বীরভোগ্যা বসুন্ধরার অপর্ণা মূর্তি।—নিশ্বাস লইতেও ভয় হয়, উমার তপস্যা বুঝিবা ভাঙ্গিয়া যায়…

……ধমনীর স্পন্দন আবার হয়। গাছে গাছে পাখির কাকলি—পাতায় পাতায় প্রভাত সমীরের দোলা—লাস্যময়ী পৃথিবী আবার নানা ছন্দে লীলায়িতা হইয়া উঠিয়াছে।…পাথরের জেলগেটের উপরতলায় হঠাৎ উষার আরক্তিম আলোর মধুর ঝলক লাগে।

সমাপ্ত